কিশোর আনন্দ ১২

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

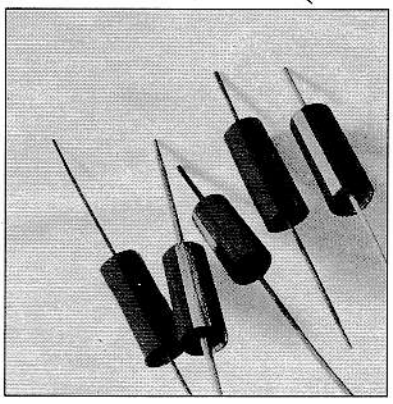

কিশোর আনন্দ | ১২

আলোকিত মানুষ চাই

কিশোর আনন্দ ১২

সম্পাদনা ॥ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

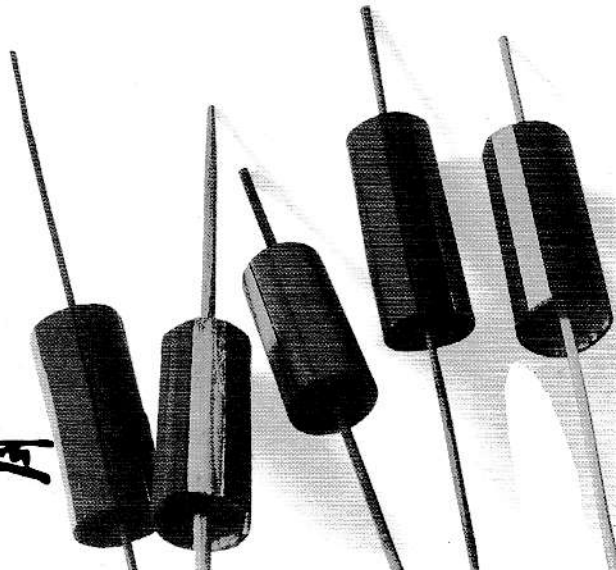

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩০৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আলি

শিল্প সম্পাদক
ধ্রুব এষ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

চতুর্থ সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২২ ডিসেম্বর ২০১৫

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ মোবা. ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

অলঙ্করণ
শেখ আফজান

মুদ্রণ
ওমাসিস
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0302-X

KISHORE ANONDO [Vol. 12]
Children's magazine. Edited by Abdullah Abu Sayeed
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price Tk. 200.00 only

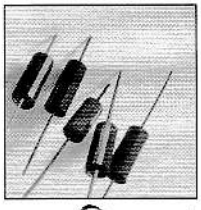

ভূমিকা

তোমরা, আমাদের দেশের কিশোর-তরুণরা, যাতে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পার সেজন্য তোমাদের মন ও বয়সের উপযোগী সবচেয়ে সুন্দর আর স্বপ্নেভরা বইগুলো তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে সারা দেশে ঐ চেষ্টা করে আসছি। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তোমাদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি নানারকম আনন্দময় উপন্যাস, মজাদার ভ্রমণকাহিনী, মহৎ মানুষদের জীবনী, রম্যরচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও আরও নানা ধরনের বই—এমন সব বই যা পড়লে তোমাদের মন অনুভূতিময় ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠবে এবং জ্ঞানের উচ্চতর জগতে প্রবেশের জন্য তোমরা উন্মুখ ও যোগ্য হবে।

কিন্তু এসব বই পড়ার পাশাপাশি মানব-সভ্যতার সেই সব বিষয় ও তথ্যও তো তোমাদের জানতে হবে যেগুলো জানলে তোমরা সুঅবহিত আধুনিক বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশ করা হল সে জন্যেই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে 'আসন্ন' নামে আমরা তোমাদের জন্য যে উৎকর্ষধর্মী মাসিক পত্রিকাটি বের করি তার লেখাগুলো নিয়েই এই 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশিত হচ্ছে।

একজন ছেলে বা মেয়ের যা কিছু জেনে বড় হওয়া উচিত তার অধিকাংশ তথ্যই তোমরা পাবে এই কিশোর আনন্দে। বিশ থেকে পঁচিশ খণ্ডে কিশোর আনন্দ প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রইল। এর মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে মানবজগতের অসংখ্য তথ্য তো তোমরা পাবেই সেইসঙ্গে পাবে অনেক অনবদ্য গল্প, কবিতা, কুইজ, চুটকি, স্মরণীয় বাণী, এমনি আরও অনেক রমণীয় ও উপভোগ্য লেখা।

আমরা আশা করি যারা এই বইয়ের সবগুলো সংখ্যা মন দিয়ে পড়বে পৃথিবীর জ্ঞানজগতের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো সম্বন্ধে তারা একটা মোটামুটি ধারণা পাবে।

এ বইয়ের সব লেখাই অত্যন্ত সুলিখিত ও উপভোগ্য। তোমাদের জন্য ভালো ভালো লেখকদের যেসব অনন্য লেখা তাঁদের বই ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে ঐ সব বই ও পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এই সংকলনে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখাগুলো পড়ে তোমরা আনন্দ পেলে আমাদের কষ্ট সার্থক হবে।

কেবল কিশোর-তরুণরা নয়, আমাদের ধারণা সব বয়সের সবরকম মানুষই 'কিশোর আনন্দ' একইভাবে উপভোগ করতে পারবেন এবং পড়ে উপকৃত হবেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কিশোর আনন্দ ১২

সূ চি প ত্র

ছড়া / কবিতা

বাবুরের মহত্ত্ব ॥ কালিদাস রায় ৯
সাম্যবাদী ॥ কাজী নজরুল ইসলাম ৪৫
রাজায় রাজায় ॥ আবদার রশীদ ৫৮
অধ্যবসায় ॥ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৮৭
ভালো খাবার ॥ সুকান্ত ভট্টাচার্য ১২৭
চিন্তা নিয়ে ভাবনা ॥ সুকুমার বড়ুয়া ১৫০

গল্প

দালিয়া ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২
বীরবলের গল্প ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮
দান প্রতিদান ॥ এস. ওয়াজেদ আলী ৩৪
জুটি ॥ সত্যজিৎ রায় ৪৬
পটকান যখন পটকাল ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫৯
টাকার মেশিন ॥ সরদার জয়েন উদ্‌দীন ৭৫
ডমরুধরের কুমির শিকার ॥ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৮
এক টুকরো মাংস ॥ জ্যাক লন্ডন ১১১
প্রেমপুষ্প নার্সিসাস ॥ সানোয়ার জাহান ১৩৬
লোকটি ॥ হুমায়ূন আহমেদ ১৪৪

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ

গাছের কথা ॥ জগদীশচন্দ্র বসু ২০
আমাদের দাঁত, তার গঠন ও যত্ন ॥ অমরনাথ রায় ৮৫

প্রবন্ধ

বাংলাভাষা ॥ মনজুলা মোরশেদ ২৫
আলোকিত ভুবনে ॥ আলী ইমাম ৩৯
শার্লক হোমস-এর ফিরে আসা ৫৩
আঁকার আগে দেখা ॥ আবুল মনসুর ৬৫
রেনেসাঁস ॥ খায়রুল আলম সবুজ ৭৩
মজার এক উদ্ভিদ ৯২
লৌকিক বৈজ্ঞানিক ধাঁধা ১০০
তৈল ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১০৫
প্রবালের কথা ১০৮
ডেথ সি ও ডেথ ভ্যালি ১২৮
অদ্ভুত পাখি ১৩৪

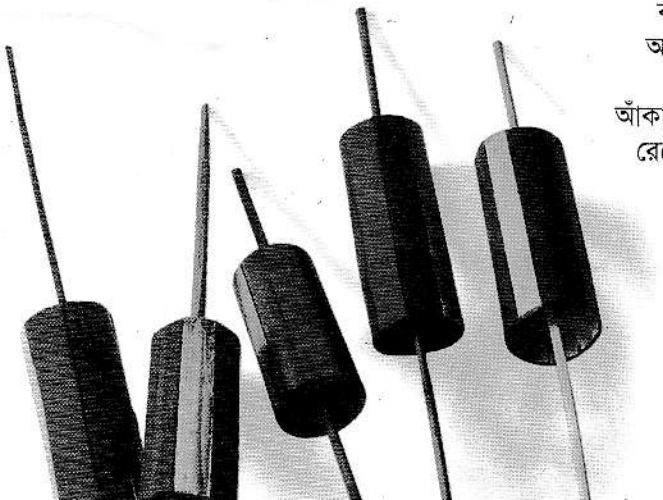

জীবনী

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৩২
নাবিক না-হয়েও জাহাজের বহু সমস্যার সমাধান করেছিলেন লর্ড কেলভিন ১৩০

বিলিভ ইট অর নট

এক হতভাগ্য কিশোরের গল্প ২৩
চাঞ্চল্যকর মামলা ৮০

অভিযান / ভ্রমণ

হিউয়েন-সাঙ-এর ভারতভ্রমণ ৬৯

খেলাধুলা

ভলিবল খেলা হয় কীভাবে? ৮৩

বিবিধ

বালির উপর দিয়ে হাঁটতে মানুষের অসুবিধে হয় উটের হয় না কেন? ২৪
সোনার দাড়ি ৩১
বায়ান্ন বছরের ছদ্মবেশ ৩৭
মৌমাছি কেমন করে মধু তৈরি করে? ৩৮
হাত নয় পা ৪৪
কীভাবে হল বিদ্যুতের আবিষ্কার ৫৬
রাক্ষুসে প্রজাপতি ৬২
ঘড়ি ৬৩
বই আবিষ্কার ৯১
পেন্সিল আবিষ্কার ৯৪
তালগাছ এত লম্বা হয় কেন? ৯৫
এক ক্ষুদে অংকের ম্যাজিক ॥ সাজেদুল করিম ৯৬
কাঠঠোকরা গাছের গুঁড়ি ঠোকরায় কেন? ৯৯
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২৬
মানমন্দির ১২৯
খিদে পেলে টিনের কৌটো, রবারের টায়ারও গিলে ফেলে হাঙর ১৪০
ইতিহাস-বিখ্যাত চুরি ১৪১
স্মরণীয় উক্তি ১৪৩
অল্প কথার গল্প ১৫১
কোন কোন প্রাণী মানুষের মতো দেখতে? ১৫২

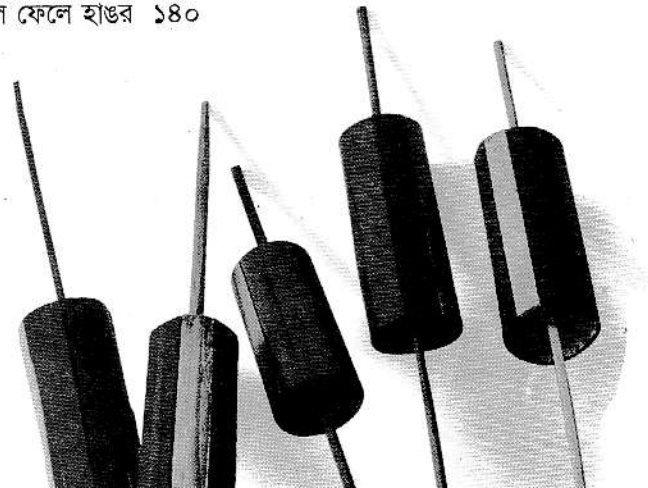

কালিদাস রায়

বাবুরের মহত্ত্ব

পাঠান-বাদশা লোদী
পানিপথে হত। দখল করিয়া দিল্লির শাহী গদি,
দেখিল বাবুর এ-জয় তাঁহার ফাঁকি,
ভারত যাদের তাদেরি জিনিতে এখনো রয়েছে বাকি।
গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং, 'জিনেছ মুসলমান,
জয়ী বলিব না এ-দেহে রহিতে প্রাণ।
লয়ে লুণ্ঠিত ধন
দেশে ফিরে যাও, নতুবা মুঘল, রাজপুতে দাও রণ।'
খানুয়ার প্রান্তরে
সেই সিংহেরো পতন হইল বীর বাবুরের করে।
এ বিজয় তার স্বপ্ন-অতীত, যেন-বা দৈব বলে
সারা উত্তরভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।
কবরে শায়িত কৃতঘ্ন দৌলত,
বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ।
দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে লুণ্ঠিত সম্পদে,
জাঁকিয়া বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির মসনদে।
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দুর-হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ
ঘুরি পথে পথে খুঁজিছে প্রজার কোথায় দুঃখক্লেশ।

চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান
করিতেছে আজি বাবুরের সন্ধান,
কুর্তার তলে কৃপাণ লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে,
দেখা যদি তার পায় আজি কোনোমতে
লইবে তাহার প্রাণ,
শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।
দাঁড়ায়ে যুবক দিল্লির পথ-পাশে
লক্ষ করিছে জনতার মাঝে কেবা যায় কেবা আসে।
হেনকালে এক মত্ত হস্তী ছুটিল পথের পরে
পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল ডরে।
সকলেই গেল সরি
কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ি।
হাতির পায়ের চাপে
'গেল গেল' বলি হায় হায় করি পথিকেরা ভয়ে কাঁপে।
'কুড়াইয়া আনো ওরে'
সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।
সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
'করো কী করো কী' বলিয়া জনতা চিৎকার করি উঠে।
করি-শুণ্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি
পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
ফিরিয়া আসিল বীর।
চারিপাশে তার জমিল লোকের ভিড়।
বলিয়া উঠিল একজন 'আরে এ যে মেথরের ছেলে,
ইহার জন্য বে-আকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?
খুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের জান,
ফেলে দিয়ে ওরে এখন করোগে স্নান।'
শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বুকে,
বক্ষে চাপিয়া চুমা দেয় তার মুখে।
বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে,
এ যে বাদশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে।
ভাবিতে লাগিল, 'হরিতে ইহারই প্রাণ
পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান?'
বাবুরের পায়ে পড়ি সে তখন লুটে
কহিল সঁপিয়া গুপ্ত কৃপাণ বাবুরের করপুটে,—
'জাঁহাপনা, এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ
করিতে আসিয়া একি দেখিলাম! ভারতের রাজপদ
সাজে আপনারে, অন্য কারেও নয়।

বীরভোগ্যা এ বসুধা এ-কথা সবাই কয়,
ভারত-ভূমির যোগ্য পালক যেবা,
তাহারে ছাড়িয়া, এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা?
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,
সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।'
রাজপথ হতে উঠায়ে যুবকটিরে
কহিল বাবুর, ধীরে,
'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে;
জানো না কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে
আজি হতে মোর শরীর-রক্ষী হও;
প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দালিয়া

ভূমিকা

পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্‌ধৃত হয় এবং তাহারই গৃহে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে, এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "তিন্নি"! ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল। "তিন্নি, আজ সকালে তোর হইল কী। কাজকর্মে যে একেবারে হাত লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো—"

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, "বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি।"

"তোর আবার দিদি কে রে, তিন্নি!"

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "আমি"।

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। তারপর জুলিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাজ-কাম কিছু জানিস?"

আমিনা কহিল, "বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই থাকিবি কোথায়।"

জুলিখা বলিল, "আমিনার কাছে।"

বৃদ্ধ ভাবিল, এও তো বিষম বিপদ। জিজ্ঞাসা করিল, "খাইবি কী।"

জুলিখা বলিল, "তাহার উপায় আছে।" বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপি চুপি কহিল, "বুঢ়া, আর কোনো কথা কহিস না, তুই কাজে যা। বেলা হইয়াছে।"

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছদ্মনামে আরাকান-রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল, এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাতবায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল, "ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে, আর তো কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না।"

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী, সর্বাপেক্ষা ছায়াময়, বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে, ভাই। আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই।"

জুলিখা বলিল, "ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে! কোথায় দিল্লির সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির!"

আমিনা হাসিয়া কহিল, "দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে, তাহাতে দিল্লির সিংহাসন একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।"

জুলিখা কতকটা আনমনে আমিনাকে কহিল, "তা, তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোটো ছিলি। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, পিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি

প্রিয় জ্ঞান করিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।"

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল, কিন্তু বেশ বুঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নবযৌবন এবং কী একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুড়া খাইতে পাইবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারি বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া কহিল, "কেও!"

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল : জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল, "তুমি তো তিন্নি নও।" যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে 'তিন্নি' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সংবরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি।"

যুবক কহিল, "তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়।"

তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, "দিদি, ওর কথায় তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ও কি মানুষ। ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদবি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব।—দালিয়া, তুমি কী করিয়াছিলে।"

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল, "চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও তো তিন্নি নয়।"

তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, "ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়।"

যুবক কহিল, "চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না; বিশেষত পূর্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।"

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, 'না, তুমি অতি বর্বর। শাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।"

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গিতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহু কষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল, "এমনি করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।" যুবক পিছু হঠিয়া আসিল।

"আবার সেলাম করো।" আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা যুবককে কুটিরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল, "ঘরে প্রবেশ করো।" যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, "একটু ঘরের কাজ করো। আগুনটা জ্বালাইয়া রাখো।" বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, "দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মানুষগুলো এইরকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।"

কিন্তু আমিনার মুখে কিংবা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "বাস্তবিক আমিনা, তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এতবড়ো তাহার সাহস!"

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না— হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্বর যুবকটার জন্য।"

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, "দেখ্ দেখি বোন। যদি কোনো বাদশাহ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।"

আমিনা কহিল, "তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, 'দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি'—দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এইরকম; দু ঘা মারিলে ভারি খুশি হইয়া উঠে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এই দেখ্-না, ঘরে পুরিয়াছি—বড়ো আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষু

লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বল্ তো বোন। আমি তো আর পারিয়া উঠি না।"

জুলিখা কহিল, "আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।"

এমন করিয়া বলিল, যেন ঐ যুবকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই—পাছে অন্য কোনো মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয়, এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, "আজি দালিয়া আসে নাই, তিন্নি?"

"আসিয়াছে।"

"কোথায় গেল।"

"সে বড়ো উপদ্রব করিতেছিল, তাই তাহাকে ঐ ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি।"

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, "যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।"

আমিনা কহিল, "ভাবনা নাই বুড়া; আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।"

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা-যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর যেমন একদিকে স্রোত এবং আর-এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু, সভ্য-সমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তরু মুঞ্জরিত হইতেছে এবং সম্মুখে নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই; এবং দক্ষিণবায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে, এখানে কিছুদিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবনির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বর কুটিরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ে একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা

যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত; এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্যসমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং অরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জুলিখার হৃদয়টা হায়-হায় করিয়া উঠিত, ভাবিত— সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল, "দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

"পারি। কেন বলো দেখি?"

"আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি।"

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই। যদি পরিহাস বল তো এই বটে, রাজপুত্রীর উপযুক্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে, এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যবহারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিনই রহমত শেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, 'আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।'

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, "ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে, এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।"

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, সে সকৌতুকে হাসিতেছে। আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া কহিল, "জান দালিয়া, আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।"

দালিয়া বলিল, "সে তো বেশিক্ষণের জন্য নয়।"

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মতো

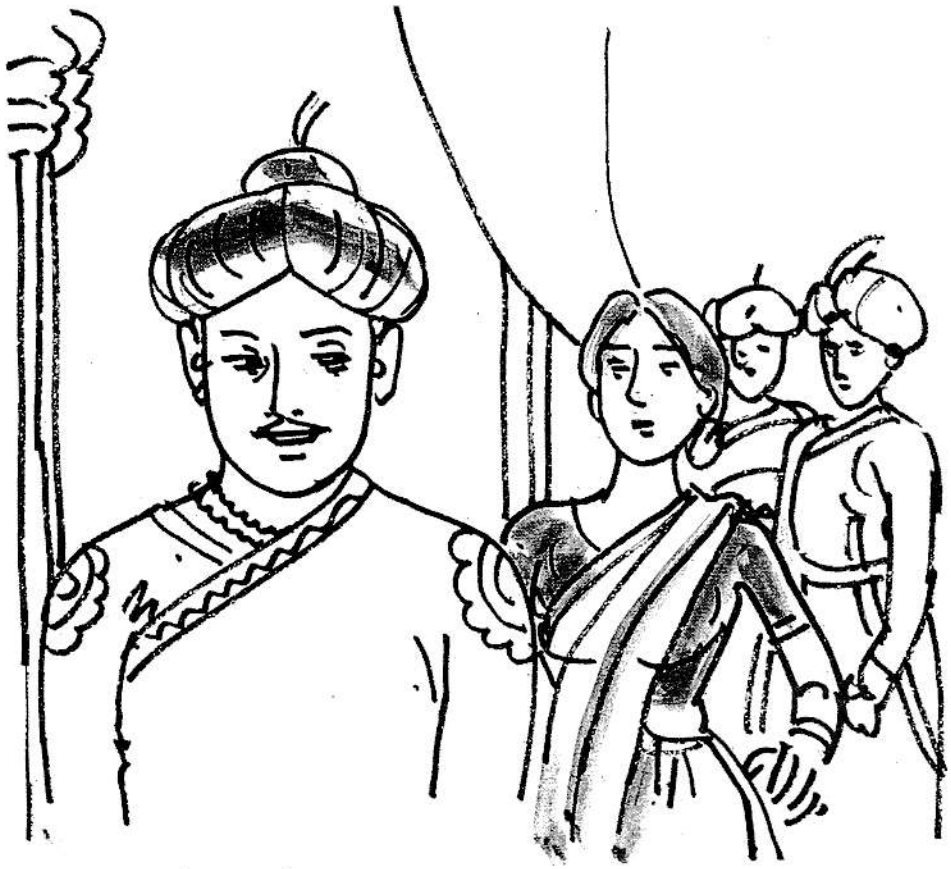

ব্যবহার করা আমারই পাগলামি।'

আমিনা দালিয়াকে আর-একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, "রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব।"

দালিয়া কথাটা সঙ্গত জ্ঞান করিয়া কহিল, "ফেরা কঠিন বটে।"

আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।"

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভান করিয়া কহিল, "রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।"

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী, পদাতিক, নিশান, হস্তী, বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্মিত কারুকার্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্‌ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বৃন্তের কাছে ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে পুরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাত্রার পূর্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়; কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই যে হাসিতেছিল, তাহার ভিতরে কি অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর হইতে একবার দেখিল—তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, "বুঢ়া, তবে চলিলাম। তিন্নি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবে।"

বুঢ়া একেবারে বালকের মতো কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল, "বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে, তাহাকে এই আঙটি দিয়ো। বলিয়ো, তিন্নি যাইবার সময় দিয়া গেছে।"

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটির, নদীতীর, কৈলুতরুতল অন্ধকার নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ। কর্তব্য যখন দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল—এখন সে কম্পিত-হৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। মনে মনে কহিল, 'নব প্রেমের বৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি।'

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শতসহস্র প্রদীপের অনিমেষ তীব্র দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভগিনী স্বপ্নাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল, "দিদি!"

জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছেন। আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জুলিখা বলিয়া উঠিল, "দালিয়া!" আমিনা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল, ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

জগদীশচন্দ্র বসু

গাছের কথা

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনোদিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার ফুটিয়া যে দুই-চারটি কথা বলে, তাহাও এমন আধো-আধো ও ভাঙা-ভাঙা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি—কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার-ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে, আমরা তাহাও বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ি হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়িতে বসিল; বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়; খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। 'পায়রা কী রকমভাবে ডাকে?' বলিলেই ডাকিয়া দেখায়; তদ্ভিন্ন সুখে-দুঃখে, চলিতে-বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নতুন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই।

একদিন বাড়ি আসিয়া দেখি, খোকার বড় জ্বর হইয়াছে; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ি অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল, এবং অতিকষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, 'খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড় ভালোবাসে।' আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোনো কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কী করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই, খোকাকে ভালোবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন ছেলে কী চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালোবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখি, কীটপতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে-অবধি তাহাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই-যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি-ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদগুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চগুণ যে-স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-দান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। ক্রমে এসব কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নিচে একপার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। একসময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলতো এই গাছ আর এই মরা ডালে কী প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একের জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর-একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে-চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাকনা; তাহার মধ্যে বৃক্ষশিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোট, কোনোটি বড়। বীজ দেখিয়া গাছ কতবড় হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এতবড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূরদেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূরদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুলগাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুলফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন-রাত্রি দেশ-দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কিনা, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে তাহার অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক-না কেন, বৃক্ষশিশু অনেকদিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না-পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাকনা গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন-কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড় ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোট ছোট ডাল ছিঁড়িয়া চারদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিন-রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ঢেলার নিচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধূলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষশিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষশিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

এক হতভাগ্য কিশোরের গল্প

ফ্রান্সিস সেলডন

সম্রাট চতুর্দশ লুই

কতই-না বিচিত্র ঘটনা ছড়িয়ে আছে এ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। আমরা তার কতটুকুই জানি? আর যখন জানতে পারি তখন কোনো কোনো ঘটনা আমাদের দেয় আনন্দ। কোনো কোনো ঘটনা কান্না-ভারাক্রান্ত করে তোলে আমাদের মনকে। তেমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল হতভাগ্য এক আইরিশ কিশোরকে নিয়ে। একটি সামান্য অপরাধের জন্যে সীমাহীন কঠিন সাজার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাকে। ফ্রান্সের সিংহাসনে তখন রাজত্ব করছিলেন সম্রাট চতুর্দশ লুই। দারুণ খামখেয়ালি আর প্রতাপশালী শাসক ছিলেন তিনি। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে প্যারিসে ক্লার্কমন্ড নামে একটি কলেজ ছিল। এ কলেজে ফ্রান্সিস সেলডন নামে ছিল ন-বছরের কিশোর। আয়ারল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে পড়তে এসেছিল সে। দারুণ মেধাবী আর চঞ্চল বলে কলেজে সবার কাছে পরিচিতি ছিল সেলডনের।

একদিন সম্রাট চতুর্দশ লুই গেলেন ক্লার্কমন্ড কলেজ পরিদর্শনে। সম্রাটের সম্মানে কলেজের শিক্ষক আর ছাত্র-ছাত্রীরা আয়োজন করলেন নানা অনুষ্ঠান। কর্তৃপক্ষ কলেজের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন 'দি কলেজ অব কিং লুই দি গ্রেট'। সম্রাট চলে যাবার পর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা খুব গর্ব করে বলে যেতে লাগল সম্রাটের মহানুভবতার কথা। সম্রাট তাদের কলেজে পায়ের ধুলো দিয়ে সবার জীবন ধন্য করেছেন—আরো কত কী!

নয় বছরের বালক সেলডন হঠাৎ করে এক বন্ধুকে বলল, তোমাদের সম্রাট দেখতে ভালো নন। টেকো মাথা তাঁর।

ব্যস, এখানেই শুরু হল সেলডনের জীবনের সর্বনাশ। তার বন্ধুটি এ-কথা জানাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে। আর কলেজ কর্তৃপক্ষ জানাল একেবারে স্বয়ং সম্রাটকে।

সম্রাট লুই ছিলেন ভীষণ জেদি মানুষ। তিনি খুবই খেপে গেলেন তাঁকে টেকো বলায়। আর তাই আদেশ করলেন ছেলেটিকে কারাগারে বন্দি করে রাখার জন্যে।

এরপর কিন্তু সবাই ভুলে গেল হতভাগ্য সেলডনের কথা। তার আত্মীয়স্বজন আয়ারল্যান্ড থেকে কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন সেলডনকে কারামুক্ত করতে পারলেন না, তখন তারাও ছেড়েই দিলেন ওর আশা।

ওদিকে খেয়ালি সম্রাটও ভুলে গেলেন সেলডনের কথা। ফলে ছোট্ট একটি অপরাধের জন্যে কারাগারে আটক থাকতে হল তাকে!

দেখতে দেখতে কেটে গেল সেলডনের জীবনের ঊনসত্তরটি বছর। সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বেরও হল অবসান। তারপর এক সকালে আটাত্তর বছর বয়সে কারাগার থেকে মুক্তি পেল সেলডন। এখানেই কিন্তু শেষ হল না হতভাগ্য সেলডনের করুণ কাহিনী। ভাগ্য যেন তার জন্যে সাজিয়ে রেখেছিল আরো অনেক দুঃখ—অনেক পরাজয়। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বৃদ্ধ সেলডন ফিরে গেল আয়ারল্যান্ডে তার জন্মভূমিতে। কিন্তু সেখানে কেউ চিনতে পারল না তাকে। এমনকি সে নিজেও ভালো করে বলতে পারল না তার প্রকৃত পরিচয়। তাই সামান্য একটি অপরাধের জন্যে কঠোর সাজা ভোগ করে বৃদ্ধবয়সে একদিন মৃত্যুবরণ করল সে তারই জন্মভূমির খোলা প্রান্তরে।

বালির উপর দিয়ে হাঁটতে মানুষের অসুবিধে হয় উটের হয় না কেন?

মানুষই হোক আর উটই হোক—উভয়েরই দেহভার বহন করে তার পায়ের পাতাগুলো। মানুষের ক্ষেত্রে প্রথমত পায়ের পাতার গঠন প্রায় অনমনীয়, চাপের মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যখন একটা পা উঠিয়ে এগোতে থাকে, তখন সমস্ত দেহভার একটি মাত্র পায়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকায় তাৎক্ষণিক চাপের মাত্রা ১০০ ভাগ বেড়ে যায়। আমাদের পায়ের ছোট পৃষ্ঠতল বা চেটোয় অতটা চাপ পড়ায় তা সহজেই মাটি বা কাদার মতো নরম জিনিসে ডেবে যায়। বালির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। বালি ঝুরঝুরে বলে অল্প জায়গায় বেশি চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বালি সরে গিয়ে পা-কে নিচের দিকে যাবার পথ করে দেয়। অন্যদিকে উটের পা চারটি। হাঁটার সময় এর মধ্যে অন্তত দুটো পা সবসময় মাটির সংস্পর্শে থাকে। ফলে উটের দেহের ওজন একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মাটিতে পড়ে। তাছাড়া উটের পায়ের নিচে চওড়া মাংসল প্যাড থাকায় দেহের চাপ খানিকটা ছড়িয়ে যায়। এইসব কারণেই বালির উপর দিয়ে হাঁটার সময় উটের পা বালিতে দেবে গিয়ে অসুবিধে সৃষ্টি করে না।

মনজুলা মোরশেদ

বাংলাভাষা

ভারতচন্দ্র

রামমোহন

ঈশ্বরচন্দ্র

প্রতিদিন মানুষ ভাষা ব্যবহার করে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনে। একজনের সঙ্গে অন্যজনের যোগাযোগ তিন ভাবে হয়ে থাকে। মানুষ অনেক সময় দেহভঙ্গির সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। হাত দিয়ে অন্যকে ডাকা, হাতের ভঙ্গিতে মার দেখানো, চোখ বড় করে রাগ দেখানো—এমনি অনেকভাবে দেহভঙ্গির মধ্যে দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ সম্ভব। আবার রাস্তায় যেতে যেতে ট্রাফিক সিগনালে লালবাতি জ্বলতে দেখে পথচারী বা গাড়ির চালক রাস্তার পাশে থেমে থাকে, হলুদ বাতি জ্বলতে দেখলে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয় এবং সবুজ বাতি জ্বললেই চলতে শুরু করে। এ-দুটো মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন ভাব প্রকাশিত হলেও এগুলো মানুষের মুখের ভাষা নয়। মুখের ভাষা ব্যবহারের সময় মানুষ ধ্বনি তৈরি করে এক-একটা ধ্বনি সাজিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। 'আ' একটা ধ্বনি, 'ম' আর-একটা ধ্বনি। কিন্তু এ-দুটো ধ্বনির কোনো অর্থ নেই। 'আ' আর 'ম' পাশাপাশি সাজালে 'আম' শব্দ হয়, আর তখুনিই এর মধ্যে দিয়ে একটা অর্থ প্রকাশ পায়। এইভাবে অনেকগুলো শব্দ সাজিয়ে তৈরি করা যায় বাক্য। 'আমি আম খেতে ভালোবাসি'—এভাবেই ধ্বনি সাজিয়ে বাক্য তৈরি করা হয়।

মানুষ জীবনধারণের জন্যে মুখ ও নাক নিয়ে অনবরত বাতাস নেয়। এই বাতাস মুখের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে গিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ করে। কিন্তু অনবরত বাতাস ফুসফুসে গেলে যদি বেরিয়ে আসতে না-পারে তাহলে তো ফুসফুস ফেটে যাবে। তাই, বাতাস বের হয়ে আসা দরকার। ফুসফুস

থেকে বাতাস বেরুনোর সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে আবার বেরিয়ে আসে একই পথে। বাতাস বেরিয়ে আসার সময় মুখের ভেতরে জিভ, ঠোঁট, দাঁত, তালু স্পর্শ করে বেরিয়ে আসে। তখনই ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই ধ্বনি সাজিয়েই আমরা কথা বলে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করি।

মানুষ কখন থেকে ভাষার ব্যবহার করতে শুরু করেছে তা সবার অজানা। পৃথিবীতে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতো বহুকাল আগে কথা বলতে পারত না। নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করত অঙ্গভঙ্গি বা ছবি এঁকে। এতে মানুষের অনেক অসুবিধে হত। কোনো মানুষ বনে নতুন কোনো জন্তু দেখে এলে তা অন্যদের কাছে বোঝানোর জন্যে প্রথমে নানা অঙ্গভঙ্গি করত। অন্যে তাতেও বুঝতে না-পারলে মাটিতে ছবি এঁকে তা বোঝানোর চেষ্টা করত। এভাবেই মানুষ গুহা, পাহাড়ের গায়ে বা দেয়ালে ছবি এঁকেছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করার জন্যে।

এভাবে কতদিন কেটে গেছে তার কোনো ইতিহাস নেই। মানুষ বুঝতে পেরেছে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বা ছবি এঁকে সব কথা অন্যকে বোঝানো সম্ভব নয়। তারা তখন একটা মাধ্যম বের করার জন্যে চিন্তা করেছে। তারও ইতিহাস কম বিচিত্র নয়। কেউ মনে করত ভাষা এসেছে স্বর্গ থেকে, কেউ-বা অন্য ধরনের ধারণা করত। ধারণা যাই হোক-না, মনের কৌতূহল মেটানোর জন্যেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে—এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দিনের-পর-দিন মানুষ ভাষা ব্যবহার করে এসেছে নিজেদের প্রয়োজনে। মুখের ভাষার জন্যে বর্ণমালা তৈরি করেছে। এই বর্ণমালার সাহায্যে মানুষের মনোভাব প্রকাশ করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে চিঠি লিখেছে, খবর পাঠিয়েছে অন্যের কাছে। পৃথিবীটা অনেক ছোট করে এনেছে ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে।

প্রত্যেক জাতিরই একটা ভাষা আছে। এই ভাষা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক সম্প্রদায়ের ভাষা অন্য সম্প্রদায়ের কাছে পাখির কিচিরমিচির ছাড়া কিছু নয়। একজন চীনার কাছে বাংলাভাষা অর্থহীন কতকগুলো ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার বাঙালিদের কাছে চীনাভাষাও ঠিক একই রকমের। তাই ভাষা নিজস্ব সম্প্রদায়ের কাছেই শুধু পরিচিত ও প্রিয় মাধ্যম।

আমাদের ভাষা বাংলার জন্ম হয় সপ্তম শতকে। প্রাচীনকালের বাংলা রূপ পরিবর্তিত হয়ে এখনকার বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে। আবার একশো বছর পরে তখনকার বাংলার সঙ্গে এখনকার বাংলারও অনেক পার্থক্য দেখা দেবে।

বাংলাভাষার পরিবর্তন এখানেই থেমে থাকেনি। আস্তে আস্তে সামনে পা বাড়িয়েছে। আর তার ফলে ভাষার রূপের পরিবর্তন হয়েছে। সপ্তম শতকে যে-ভাষা ছিল, চতুর্দশ শতকে তা আবার একটু অন্যরকম রূপ নিয়েছে।

ভাষা নদীর মতো বইতে থাকে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। সেজন্যে ভাষার দেহে অনবরত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ষোড়শ শতকের ভাষা লক্ষ করলেই এ-কথা বোঝা যাবে। এই সময়ে লেখা হয়েছে মঙ্গলকাব্য আর বৈষ্ণব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যের ভাষার মধ্যে ঝংকার নেই, কিন্তু পদাবলীর মধ্যে ধরা পড়েছে শব্দ-ব্যবহারের কারুকাজ।

আঠারো শতকে ভারতচন্দ্রের মতো খ্যাতিমান কবিদের হাতে বাংলাভাষা আরো বদলে গেছে। আমরা এখন যে-ভাষায় কবিতা লিখি, তার যেন অনেকটা কাছে চলে এসেছে।

এভাবে ভাষা এগোতে এগোতে এসে গেল উনিশ শতক। তখন পদ্যের পাশাপাশি মানুষ গদ্য ব্যবহার করতে শুরু করল। প্রথম যুগের বাংলাগদ্য তত স্পষ্ট ছিল না। বুঝতে বেশ কষ্ট হত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়ের হাতে বাংলা গদ্যের রূপ অনেক সুন্দর আর সহজ হয়েছে। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এই গদ্য সুবেশী মানুষের মতো হয়ে উঠেছে। তাঁদের পরে অনেকের হাতে বাংলাগদ্য ব্যবহৃত হওয়ার পর বর্তমান রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের ভাষার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে। সব মানুষ একই ভাষা ব্যবহার করে না। ছোট ছোট অঞ্চলে মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্যে সেই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করে। এই ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বলা হয়। দেশের সব মানুষ বাংলাভাষার যে-রূপ ব্যবহার করে তা পরিচিত চলিত ভাষা হিসেবে। আবার চলিত ভাষার তুলনায় একটু স্বতন্ত্র বাংলাভাষার রূপের নাম সাধুভাষা। একটা উদাহরণ দিয়ে আঞ্চলিক ভাষা, চলিত ভাষা আর সাধু ভাষার পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছি :

আঞ্চলিক ভাষা : আঁর পাঁস বছইরগা মাইয়া মিনি আইয়া কয়, বাভা, আসমানে নাহি একডা আতি আছে?

চলিত ভাষা : আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মিনি এসে বলে, বাবা, আকাশে নাকি একটা হাতি আছে?

সাধু ভাষা : আমার পঞ্চম বৎসরের কন্যা মিনি আসিয়া কহে, বাবা, গগনে নাকি একটি হস্তী আছে?

আমাদের ভাষার সবচেয়ে ছোট অংশ হল ধ্বনি। এই ধ্বনি যখন আমরা লিখি, তখন তাকে বর্ণ বলা হয়। বর্ণের কোনো অর্থ নেই। অ, আ, ক, ঙ হল বর্ণ। বর্ণগুলো পাশাপাশি সাজালে হয় শব্দ। শব্দের অর্থ আছে। চেয়ার, নীল, বই—এগুলো শব্দ। আবার অনেকগুলো শব্দ পরপর বসিয়ে বাক্য তৈরি হয়। সকালে আমি স্কুলে যাই—একটা বাক্য। মানুষ যত বেশি শেখে, তত বেশি করে, সুন্দর করে বাক্যের মধ্যদিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে তুলতে পারে। একজন মানুষ ভাষা যেভাবে ব্যবহার করেন, তার মধ্যদিয়ে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্য, ভাষা আমাদের জীবনে কতটুকু প্রয়োজনীয় তা আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। ভাষা না-থাকলে মানুষ নিজেকে এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারত না।

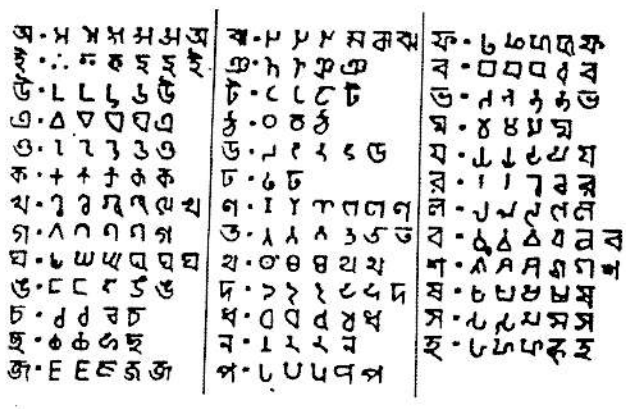

প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি থেকে বাংলা বর্ণমালার ক্রমবিকাশ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বীরবলের গল্প

কথিত আছে, আকবর বাদশাহের সভাসদ রাজা বীরবল অত্যন্ত চতুর, সুরসিক ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। প্রয়োজন হইলে, স্বয়ং বাদশাহকেও তিনি দু-কথা শুনাইয়া দিতে ভয় করিতেন না। বীরবলের প্রতি বাদশাহের স্নেহ ও শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল।

একদিন বাদশাহ দরবার বরখাস্ত (সভা বিসর্জন) করিবার সময়, সেকালের প্রথা অনুসারে উপস্থিত পাত্রমিত্রগণকে পান ও আতর বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় অসাবধানতাবশত একফোঁটা আতর নিম্নস্থ গালিচার উপর পড়িয়া গেল। বাদশাহ হঠাৎ ঝুঁকিয়া, সেই আতরের ফোঁটাটি আঙুলে মুছিয়া তুলিয়া লইলেন। তুলিয়াই রাজা বীরবলের দিকে তাঁর নজর পড়িল। বীরবল মস্তক নত করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিলেন।

সভাভঙ্গের পর বাদশাহ বিশ্রামস্থানে গেলেন কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরে এই কথাটাই ক্রমাগত খচখচ করিতে লাগিল, 'কেনই-বা আমি নেহাত কঞ্জুষের মতো সে-আতরের ফোঁটাটুকু তুলিতে গেলাম! একজন গরিব লোক, যে আতর কখনও চোখে দেখে নাই, সে ওইরূপ করিলে সাজিত। কিন্তু আমি দুনিয়ার মালিক আকবর বাদশা হইয়া ছি-ছি বড়ই ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। বীরবল দেখিয়াছে—একদিন নিশ্চয়ই সে ইহা লইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিবে।' এই ত্রুটিটুকু সারিয়া লইবার মানসে, পরদিন বাদশাহ হুকুম দিলেন: 'রাজবাড়ির সামনে ঐ-যে জলের হাউজটা আছে, উহা খালি করিয়া, উৎকৃষ্ট আতরে ভর্তি করিয়া দাও এবং শহরে ঢোল দাও যে, বাদশাহ প্রজাদের জন্য

আতর-সত্র খুলিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা সে আসিয়া ঘটি, বাটি, কলসি ভর্তি করিয়া আতর লইয়া যাইতে পারে।' ঘড়া-ঘড়া আতর ঢালিয়া সেই প্রকাণ্ড হাউজ ভর্তি করা হইল। দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে, হাজার হাজার লোক আসিয়া, ঘটি, বাটি, কলসি ইত্যাদি ভরিয়া সেই মূল্যবান আতর সমস্তটা লুটিয়া লইয়া গেল। আকবর বাদশাহ বীরবলকে সঙ্গে লইয়া এই আতরলুট দেখিতেছিলেন, শেষ হইলে বলিলেন: 'রাজা, কেমন আনন্দ হইল বল দেখি?'

বীরবল উত্তর করিলেন: 'জাঁহাপনা, হাউজ দিয়া কি বিন্দু ঢাকা যায়?' শুনিয়া বাদশাহের মনে বড়ই ক্রোধের উদয় হইল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন: 'বীরবল এতবড় স্পর্ধা তোমার! তোমার মুখ আমি আর দেখিতে চাহি না। তুমি দূর হও। তোমার ধনসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিবে—ইহাই তোমার দণ্ড।' 'যো হুকুম জাঁহাপনা'—বলিয়া কুর্নিশ করিয়া বীরবল প্রস্থান করিলেন।

দুই

বীরবল নির্বাসিত। তাঁহার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, সমস্তই বাদশাহের আদেশে বাজেয়াপ্ত। দিনের-পর-দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে বাদশাহের রাগ পড়িয়া আসিল। তখন তাঁহার মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল : 'আহা, কেন তাহাকে তাড়াইলাম? বড় ভালোলোক ছিল—যেমন রসিক, তেমনি বুদ্ধিমান। বড় আনন্দেই তাহার সহিত কাল কাটাইতাম। কেন তাহাকে তাড়াইলাম?'

বাদশাহ প্রতিদিন বীরবলের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য দেশে-দেশে গুপ্তচর পাঠাইলেন। সন্ধান পাইলে নিজে গিয়া তাঁহার মান ভাঙাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবেন।

দুই মাস গেল, চারি মাস গেল, ছয় মাস গেল, কিন্তু বীরবলের কোনো সন্ধানই নাই। অবশেষে বাদশাহ স্থির করিলেন, একটা কৌশল করিয়া দেখিবেন। হুকুম দিলেন : 'আমার অধীনে যত বড় বড় সামন্তরাজ আছে, তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত কর।' তালিকা প্রস্তুত হইল, ৫০জন সামন্তরাজের নাম লিখিত হইয়াছে। অতঃপর বাদশাহ হুকুম দিলেন: '৫০টা মেড়া খরিদ করিয়া আনো।' মেড়া খরিদ হইল। তখন নিম্নলিখিত পরোয়ানার সহিত, ঐ ৫০ জন সামন্তরাজের প্রত্যেকের নিকট এক-একটা মেড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরোয়ানা : 'আকবর বাদশাহ এতদ্বারা তোমার প্রতি হুকুম করিতেছেন, রাজকর্মচারীর সহিত প্রেরিত মেড়াটি একমাসকাল তুমি প্রতিপালন করিবে। ইহাকে প্রত্যহ চারি সের পরিমাণ উৎকৃষ্ট দানা খাইতে দিবে। যে-রাজকর্মচারী ইহা লইয়া যাইতেছে, সে নিজ তত্ত্বাবধানে মেড়াকে দানা খাওয়াইবে। একমাস পরে মেড়াটি রাজধানীতে ফেরত পাঠাইবে। কিন্তু সাবধান, বর্তমানে ইহার দেহের ওজন যাহা আছে, ঠিক সেইরূপ থাকা চাই। যদি একতোলা পরিমাণও ইহার দেহের ওজন বৃদ্ধি পায়, তবে তোমার লক্ষ টাকা জরিমানা হইবে। প্রকাশ্য দরবারে এই মেড়ার ওজন করা হইল... মণ... সের... পোয়া... ছটাক... কাচ্চা!'

—অর্থাৎ, যে-মেড়া যে-রাজাকে পাঠানো হইতেছে, সেটার কত ওজন, তাহা সেই রাজার নামীয় পরোয়ানায় লিখিত হইল। এই মেড়া ও পরোয়ানা পাইয়া, রাজ্যে রাজ্যে মহাআতঙ্ক উপস্থিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল, প্রত্যহ চারি সের উৎকৃষ্ট দানা খাইয়াও মেড়ার ওজন বাড়িবে না, ইহা তো অসম্ভব কথা! কেহ কেহ বলিল: 'ইহা কেবল টাকা আদায়ের ফন্দি, আর কিছু নয়। তারচেয়ে খোলাখুলি পরোয়ানা দিলেই হইত, একলক্ষ টাকা আমায় পাঠাইয়া দাও।'

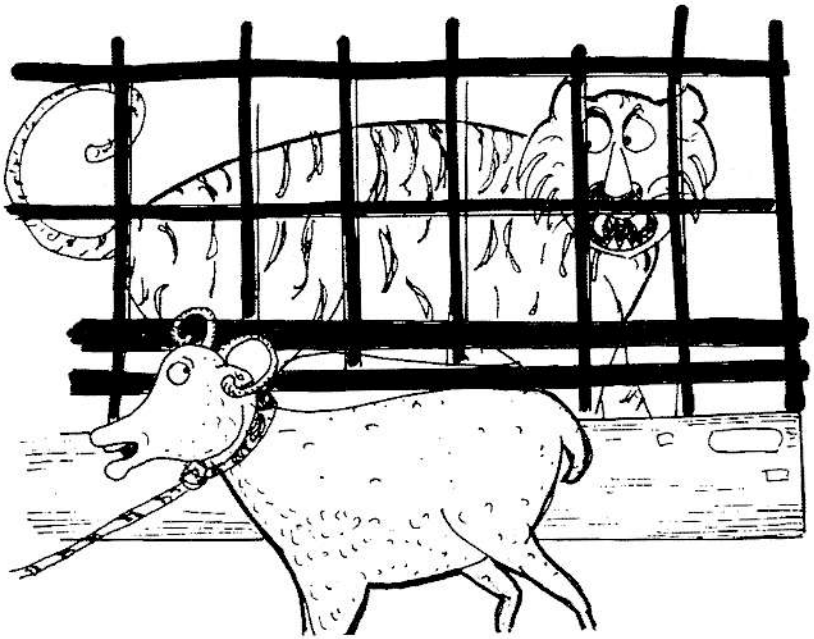

তিন

বীরবল রাজধানী হইতে নির্বাসিত হইয়া, যে-সামন্তরাজার সীমানার মধ্যে ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বাস করিতেছিলেন, সেই রাজার নিকটও রাজকর্মচারীসহ একটি মেড়া ও পরোয়ানা গিয়া পৌঁছিল। সে-রাজা কিছু অমিতব্যয়ী ছিলেন, ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই পরোয়ানা পাইয়া তিনি তো মাথায় হাত দিয়ে বসিয়া পড়িলেন : 'তাই তো, একে এই টানাটানি,—এক মাস পরে একলক্ষ টাকা পাই কোথা? কী ফেসাদেই পড়া গেল, ছি ছি!'

লোকমুখে বীরবলও এই ব্যাপার অবগত হইলেন। তখন তিনি চাপকান পাগড়ি ইত্যাদি পরিধান করিয়া, রাজবাড়ি গিয়া রাজার সহিত দর্শন প্রার্থনা করিলেন। রাজার নিকট গিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন : 'মহারাজ, শুনিলাম আপনি নাকি মহা মেড়া-সমস্যায় পড়িয়াছেন?'

: 'হ্যাঁ, সমস্যা নয়ত আর কী?'

: 'আমি আপনার একজন দীন প্রজা। যদি আদেশ করেন, আমি সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারি।'

: 'তাহা হইলে তো বাঁচি। কী সমাধান? বল বল!'

: 'মহারাজের চিড়িয়াখানা আছে, তাহাতে কতকগুলি বড় বড় খাঁচায় বড় বড় বাঘ আবদ্ধ আছে দেখিয়াছি। সেই একটা বাঘের খাঁচার কাছে মেড়াটাকে বাঁধিবার হুকুম দিন। এক মাস ও-মেড়া সেইখানেই বাঁধা থাকিবে। চারি সের কেন, যত খাইতে পারে দানা উহাকে দিবার আদেশ করিয়া রাখুন।'

এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য হইল। মাসান্তে রাজকর্মচারীগণ স্ব-স্ব জিম্মার মেড়া লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিল।। মেড়াগুলি একে একে আবার ওজন করা হইল। সেগুলির ওজন

কাহারও দশ সের, কাহারও বিশ সের, কাহারও এক মণ বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল একটি মেড়া, অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার ওজন প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

বাদশাহ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কী হে, এ-মেড়াটি এমন কাহিল হইয়া গেল কেন? ইহাকে চারি সের দানা কি রোজ দেওয়া হইত না?'

কর্মচারী হাতজোড় করিয়া বলিল: 'চারি সের কেন জাঁহাপনা, ৫-৬ সের দানা ইহাকে প্রত্যহ দেওয়া হইত। কিন্তু তাহার সিকিভাগও এ খাইত না। খাইবে কী, ইহাকে একটা মস্ত বাঘের খাঁচার সামনে এই একমাস বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঘটা যখন-তখন ইহাকে দেখিয়া তর্জন করিত, লোলুপ-নেত্রে ইহার পানে চাহিয়া জিভ বাহির করিত, সে-জিভ দিয়া টসটস করিয়া লালা ঝরিত। মেড়া দানা খাইবে কী, ভয়েই কাঠ হইয়া থাকিত। আতঙ্কে আতঙ্কে দিনদিনই রোগা হইতে লাগিল।' বাদশাহ বলিলেন : 'কে এরকম করিতে সে-রাজাকে পরামর্শ দিয়াছিল জানো?'

: 'শুনিয়াছি তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ প্রজা তাঁহাকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিল।' ইহা শুনিয়া বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, সে-ব্রাহ্মণ আর কেহ নয়, সেই বীরবল! নহিলে এত বুদ্ধি কার?

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজ্যে একজন দক্ষ গুপ্তচরকে পাঠাইয়া দিলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া বলিল : 'বীরবলই নাম ভাঁড়াইয়া সেখানে বাস করিতেছেন। তিনিই রাজাকে পরামর্শ দিয়া মেড়াকে বাঘের খাঁচার সম্মুখে বাঁধাইয়াছিলেন।' বাদশাহ বলিলেন : 'সে আমি আগেই বুঝিয়াছি।'

তারপর বাদশাহ হাতিঘোড়া-সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজোচিত সমারোহে সেই রাজ্যে যাত্রা করিলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সমাদরে বীরবলকে ফিরাইয়া আনিলেন। বলাবাহুল্য, বীরবল তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন।

সোনার দাড়ি

সোনার মুকুট পরে রাজারা সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সোনার দাড়ি পরে সিংহাসনে বসার নজির রয়েছে শুধুমাত্র একটিই। আর তা হল রোমসম্রাট ক্যালিগুলার। তিনি ছিলেন এক খামখেয়ালি রাজা।

একবার ক্যালিগুলা সিদ্ধান্ত নিলেন সাধারণ মানুষের মতো আর দাড়ি রাখবেন না। রাখবেন সোনার দাড়ি। যেন সবাই তাঁকে আরো বেশি শ্রদ্ধা করে। সমীহ করে দেবতাদের মতো। সুতরাং দেশের বিখ্যাত স্বর্ণকারদের আদেশ করলেন দেবতা জুপিটারের আদলে তাঁর জন্যে একগুচ্ছ সোনার দাড়ি বুনে দিতে। স্বর্ণকাররা অনেক যত্ন করে সম্রাট ক্যালিগুলার জন্যে সোনার তার দিয়ে বানিয়ে নিলেন চমৎকার একগুচ্ছ দাড়ি। সে দাড়ি দেখে ভীষণ খুশি হলেন সম্রাট। তারপর ঝটপট তিনি তাঁর আসল দাড়ি কেটে সেখানে লাগিয়ে নিলেন সেই দাড়ি। আমৃত্যু তিনি ব্যবহার করেছিলেন সেই সোনার দাড়ি।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

যশোর জেলার বাড়ুলি গ্রামে জন্ম নেয়া বরেণ্য বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় জীবনভর একেবারেই নিরাভরণ ও শাদামাটা জীবনযাপন করেছেন। সামান্য বাহুল্যও তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। গিলক্রাইস্ট বৃত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ দুর্লভ ডিগ্রি নিয়ে ১৮৭৭ সালে বিলেত থেকে দেশে ফেরেন তিনি। নিজ বাসভূমে পা রাখার আগেই লন্ডনে ব্যবহৃত স্যুট-টাই হস্তান্তর করেন জাহাজের খালাসির কাছে মাত্র আট টাকার বিনিময়ে। সেই টাকায় কেনা নতুন ধুতি চাদর গায়ে জড়িয়ে প্রফুল্লচন্দ্র নিজ গ্রামে পৌঁছান। পরবর্তীকালে ইংরেজ কর্তৃক পরিচালিত কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নশাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের সময় (১৮৮৯) অবধারিতভাবে কোট বানাবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি তখন মোটা খদ্দরের দুটি কোট একসঙ্গে বানিয়ে নেন। একটি নিজের এবং অন্যটি নিজ বেয়ারার ব্যবহারের জন্য। বিদ্যাসাগরের পর এমন ব্যসনভূষণে তিনিই প্রথম ও সম্ভবত সর্বশেষ বাঙালি।

স্কুলের পাঠ শেষ করে প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট কলেজে ভর্তি হন ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে। এই কলেজে যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ত তাদের বিজ্ঞানের ক্লাস করতে যেতে হত প্রেসিডেন্সি কলেজে। একদিকে মেট্রোপলিটনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি সাহিত্যের অসাধারণ পাঠদানের আকর্ষণ, অন্যদিকে আলেক্সান্ডার পেডলারের রসায়নশাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকর্ষণ—এ দুয়ের মাঝে একসময় প্রফুল্লকে গ্রাস করল রসায়নশাস্ত্র। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি 'আমি সাহিত্যের মায়া ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানেরই আনুগত্য স্বীকার করিলাম এবং বিজ্ঞান নিঃসংশয় ও একনিষ্ঠ সেবককেই চাহিল'। এফ.এ. পাশ করে বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যে বি.এ. ক্লাসের বি কোর্সে ভর্তি হলেন ১৮৮২ সালে। কিন্তু বি.এ. আর পাশ করা হয়নি। কারণ

সর্বভারতীয় পর্যায়ে দুজনের একজন নির্বাচিত হয়ে গিলক্রাইস্ট স্কলার হিসেবে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য বিলেতে চলে যান। শিক্ষা শেষে শিক্ষকতার চাকরির অবসরে তিনি বাংলা ভূখণ্ডে বিজ্ঞানচর্চা প্রচারে ব্রতী হন। মাইনে থেকে কষ্ট করে কিছু টাকা জমাতে থাকেন। অন্যদিকে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে স্থাপন করেন রাসায়নিক কর্মশালা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান দিয়ে শুরু করতে হয়। এই অনুভব থেকে কর্মশালার সতীর্থদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড', ভারতের প্রথম এই ওষুধ ও রসায়ন-কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০১ সালে মাত্র ৮০০ টাকা মূলধন নিয়ে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের সঙ্গে বাণিজ্যের মেলবন্ধন ঘটান এবং প্রথম শিল্প-উদ্যোক্তা হিসেবে চিহ্নিত হন। প্রফুল্লচন্দ্রই প্রথম সক্রিয় বিজ্ঞানী, যিনি বিশ্ববিজ্ঞানের ধারায় প্রাচীন ভারত একদা যে গৌরবময় অবদান রেখেছিল তা খুঁজে বের করে তুলে ধরেন। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি অসামান্য গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)। তিনি সম্প্রদায় অর্থে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তৎকালীন রীতি অনুসারে ভারতীয় অর্থেই হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র আপাদমস্তক ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তিনি মনে করতেন, ভারতে একদা যে বিজ্ঞানচেতনা লৌকিক-পর্যায়ে চর্চা ছিল তা ধসে পড়েছে জাতিভেদ-প্রথার প্রসারের ফলে। এ প্রসঙ্গে 'হিন্দু রসায়নীবিদ্যার ইতিহাস' শীর্ষক এক পুস্তকে তিনি উল্লেখ করেছেন, যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মনু প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতারা নতুন নতুন নিয়মের নাগপাশে সমগ্র সমাজকে বেঁধে ফেললেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নেবার পর প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯১৬ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি। বিজ্ঞানচর্চা বিস্তারে তিনি শতাধিক গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ, ইংরেজি ও বাংলায় ৩৪টি পুস্তক এবং ৬৮টি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে দুটি মহামূল্যবান পুস্তক হল Life and Experience of a Bengali chemist এবং History of Hindu chemistry। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনে তিনি সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এজন্য কিছু কাজও করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আরও একটি বড় কীর্তি বঙ্গভূমিতে তিনি কয়েকজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী উপহার দিয়েছেন। বলাবাহুল্য মেঘনাদ সাহা, ড. সত্যেন বসু, ড. নীলরতন ধর, ড. রামেন্দ্রপ্রসাদ ও পঞ্চানন নিয়োগী প্রমুখ খ্যাতিমান বিজ্ঞানী হলেন তাঁর গুণী ছাত্র। বিজ্ঞানচর্চার এই পথিকৃৎ স্বদেশবাসী কর্তৃক আচার্য উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে।

হাস্যকৌতুক

কারাধ্যক্ষ আসামিকে বললেন: 'আপনার কারাবাসের মেয়াদ একসপ্তাহ আগেই শেষ হয়ে গেছে। আমাদের হিসাবের ভুলে অকারণ সাতটা দিন আপনাকে জেলে কাটাতে হল। সত্যিই এজন্য আমরা দুঃখিত।'

আসামি বিগলিত হয়ে বলল : 'স্যার, অকারণ দুঃখ পাবেন না। ওই সাতদিন আমার নামে জমা করে রাখুন। এরপর যখন আসব তখন বাদ দিয়ে দেবেন।'

এস. ওয়াজেদ আলী

দান প্রতিদান

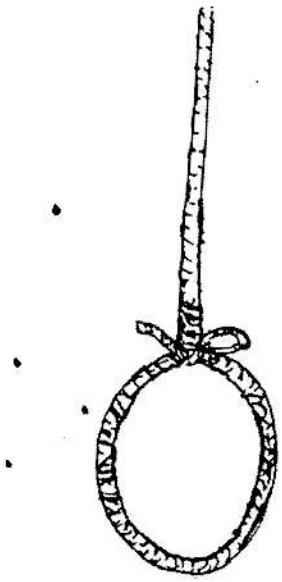

শামশের খাঁর মতো দস্যু খোরাসান রাজ্যে দ্বিতীয়টি ছিল না; তবে তার এক বিশেষত্ব ছিল যে, ধনীর ধন লুণ্ঠন করে সে গরিবদের পালন করত, আর ডাকাতি করতে গিয়েও যথাসম্ভব মানুষের জীবন বাঁচিয়ে চলত।

সুলতানের সৈনিকেরা চারদিকে তার সন্ধানে ফিরত। তাকে ধরবার জন্যে বড়রকমের পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। একদিন সে ধরা পড়ল। এক গরিব বিধবা আর তার অনাথ শিশুদের মাঝে-মাঝে সে কিছু দিয়ে যেত তাদের ভরণপোষণের জন্যে। সুলতানের কর্মচারীরা গোয়েন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুযোগ বুঝে একদিন এসে তাকে বন্দি করল।

যথাসময়ে শামশের খাঁর বিচার হল আর বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়া হল। দেশের গরিব-দুঃখীরা কাঁদতে লাগল। তাদের দরদি বন্ধু শামশের খাঁ বিপদে-আপদে আর তাদের সাহায্য করতে আসবে না।

বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য। চারদিকে প্রহরীদের সতর্ক পাহারা। আজ শামশের খাঁর ফাঁসির দিন। নির্দিষ্ট সময়ে সৈনিকেরা শামশের খাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে এল। ফাঁসিকাষ্ঠ প্রভৃতি সব প্রস্তুত; বিচারকের আদেশ হলেই শামশের খাঁকে ফাঁসিতে চড়ানো হবে। অবর্ণনীয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে মানুষ এই দস্যুপ্রবরের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ জনতার মধ্যে ভীষণ কলরব উঠল। চারদিকে সেই একই চিৎকার: 'সুলতানের মৃত্যু হয়েছে। সুলতানের মৃত্যু হয়েছে।' সুলতানের মৃত্যু সে-তো যা-তা ব্যাপার নয়। নতুন সুলতান সিংহাসনে বসবেন, দেশের শাসনতন্ত্র বদলে যাবে; কার ভাগ্যে কী আছে কেউ বলতে পারে না। বিচারক, রাজকর্মচারী, সৈনিক, প্রহরী প্রভৃতি সবাই দৌড়ল সুলতানের প্রাসাদের দিকে। অপরাধীর কথা সবাই ভুলে গেল। তার তত্ত্বাবধানের জন্য কেউ সেখানে রইল না।

সজাগ-বুদ্ধি শামশের খাঁ দেখল আত্মরক্ষার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। কালবিলম্ব না-করে সে বধ্যভূমি থেকে অদৃশ্য হল। এদিকে রাজকর্মচারীরা প্রাসাদে গিয়ে দেখল, সুলতান প্রথামতো জাঁকজমকের সঙ্গে সিংহাসনে বসে দরবার করছেন। কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই। লজ্জায় তাদের মস্তক হেঁট হয়ে গেল। স্পষ্টই তারা বুঝল, ভিত্তিহীন বাজে গুজব শুনে তারা প্রতারিত হয়েছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার কিংবা বলবার প্রবৃত্তি মোটেই তাদের হল না। বিনা বাক্যব্যয়ে দৌড়ে তারা বধ্যভূমিতে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে যা দেখল তাতে তাদের মাথা একেবারে ঘুরে গেল। শামশের খাঁ বধ্যভূমিতে নেই। সুযোগ বুঝে সজাগ-বুদ্ধি দস্যু অদৃশ্য হয়েছে। চারদিকে খোঁজ-খোঁজ রব উঠল; কিন্তু শামশের খাঁর কোনো চিহ্ন কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

ঘটনার বিষয় অবহিত হয়ে সুলতান গুজব-সৃষ্টিকারীর সন্ধান করতে আদেশ করলেন। চারদিকে খোঁজ-তল্লাশ করে রাজকর্মচারীরা এক গরিব বৃদ্ধকে রাজদরবারে উপস্থিত করলেন। সুলতান বৃদ্ধকে সম্বোধন করে বললেন, 'বৃদ্ধ, তুমিই আমার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ রটিয়েছিলে?'

বৃদ্ধ: হাঁ হুজুর! এ অপরাধ আমিই করেছি।

সুলতান : কেন করেছ? আমি কি বিচারক বাদশা নই? আমি কি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষণ কাজ করে যাচ্ছিনে?

বৃদ্ধ : হুজুর, গরিব পরওয়ার, আপনি আমাদের মঙ্গলের চিন্তায় সর্বদা রত আছেন। আর তার জন্যে আমরা আপনার কাছে একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। তবে কিনা জানেন, আপনার মৃত্যুর মিথ্যা গুজব রটিয়ে আমি আপনার কোনো অনিষ্ট করতে পারব না, আর সেই গুজবের ফলে যদি আমার একজন উপকারী বন্ধু মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পায়, তাহলে তার উপকারের প্রতিদান দেওয়া হবে। জানেন হুজুর, আমার মেয়ের বিয়ের সময় হাতে আমার একটিও পয়সা ছিল না। আমি চারদিকে অন্ধকার দেখছিলুম। আত্মীয়দের কাছে গেলুম, তারা আমাকে সাহায্য করতে অক্ষমতা জানালেন। আমার কয় ভাই বেশ সঙ্গতিপন্ন। তাদের কাছে সাহায্য চাইলুম। তারা বলল, দিন বড় খারাপ, এখন পয়সা হাতছাড়া করা যেতে পারে না। শেষে অগতির গতি আল্লাহর শরণাপন্ন হলাম। রাতে নামাজের পর মসজিদে বসে খোদার কাছে আমার প্রয়োজন জানালুম। মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছি, এমন সময় দীর্ঘকায় একজন বলিষ্ঠ লোক আমাকে অভিবাদন করে বললেন, 'বৃদ্ধ! খোদার কাছে তোমার আত্মনিবেদন আমি শুনেছি। কত টাকা হলে তোমার অভাব পূরণ হতে পারে?' লোকটির কথা শুনে আমার মনে হল, আল্লাহ আমার প্রার্থনা শুনেছেন, আর আমার প্রয়োজন মেটাবার জন্য লোকটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি বললুম, 'জনাব, আমার প্রয়োজন এক হাজার টাকার কমে পূরণ হবে না। এত টাকা কে আমাকে দেবে?' দীর্ঘকায় মানুষটি বললেন, 'আমার সঙ্গে এস।' আমি তার সঙ্গে গেলাম। অনেক পথ অতিক্রম করে রাজধানীর উপকণ্ঠে তিনি এক বাগানে প্রবেশ করলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। বাগানে সুন্দর এক দ্বিতল বাড়ি। তিনি আমাকে দাঁড়াতে বলে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি ফিরে এলেন, হাতে টাকার একটি থলি। সঙ্গে দুজন বলিষ্ঠকায় জোয়ান। আমায় সম্বোধন করে বললেন, 'এই নাও, এই থলিতে দুই হাজার রৌপ্যমুদ্রা

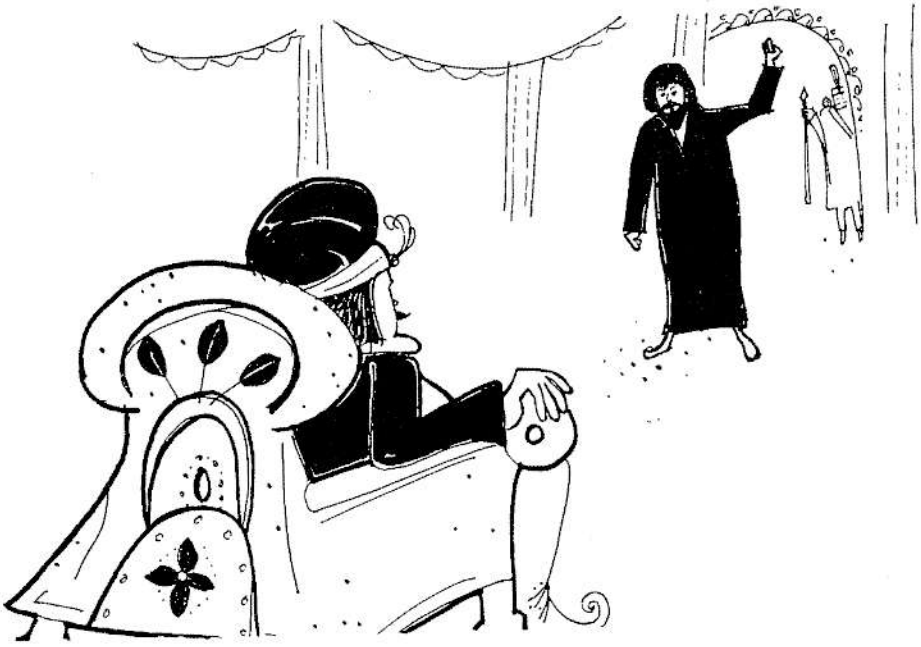

আছে। প্রয়োজন পূরণ হবার পরও তোমার হাতে উদ্বৃত্ত কিছু থাকবে। চোর-ডাকাতের ভয় আছে, তাই এই দুই জোয়ানকে তোমার সঙ্গে পাঠালাম। এরা তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে। ভবিষ্যতে যদি কখনও প্রয়োজন হয় দস্যু সরদার শামশের খাঁকে স্মরণ করবে। শামশের খাঁর নাম শুনে গা আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। তার বিষয়ে কত সব অদ্ভুত কাহিনী শুনেছি। এই দস্যুর মন যে এত উদার, এত উচ্চ, স্বপ্নেও তা ভাবিনি। আমার মুখের ভাব দেখে শামশের খাঁ হেসে বললেন, 'আমায় এখন চিনলে তো? আর অবাক হয়ে থাকবার দরকার নেই। এখন বাড়ি যাও। কবে তোমার মেয়ের বিয়ে? বেশ, আমি বিয়ের সভায় উপস্থিত থাকব। পোলাও-কোর্মা খেয়ে আসা যাবে। তবে সাবধান, সভায় আমার পরিচয় প্রকাশ কোরো না।' শামশের খাঁর কথা ও ব্যবহারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। বিয়ের আসরে শামশের খাঁ যথাসময়ে দুই সঙ্গী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর আমার মেয়ের জন্য সুন্দর একটি অলঙ্কার নিয়ে এসেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। তারপর হঠাৎ তাঁকে ফাঁসির ময়দানে দেখলাম। শামশের খাঁর বদান্যতার স্মৃতি আমার মানসপটে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল। খোদাকে সম্বোধন করে একান্ত মিনতির কণ্ঠে আমি বললাম, 'হে সর্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভু। শামশের খাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ সত্যই উপস্থিত হয়েছে। কী করে এই চরম বিপদের সময় আমার উপকারী বন্ধুর দানের প্রতিদান দিতে পারি, আমায় তা বলে দাও। তুমি সব করতে পার প্রভু, এইটুকু করবার ক্ষমতা আমায় দাও।' আমার প্রার্থনা শেষ হতে-না-হতেই কে যেন আমায় বলে দিলে, চিৎকার করে বল, 'সুলতান মারা গেছেন'—'সুলতান মারা গেছেন'। আমি তৎক্ষণাৎ 'সুলতান মারা গেছেন', সুলতান মারা গেছেন' বলে চিৎকার করে উঠলাম। তারপর যা ঘটেছে আপনার তা জানা আছে। আপনি জ্ঞানী, ক্ষমাশীল এবং বিচারক। উদারতা এবং মহানুভবতার জন্য দেশবিদেশে আপনার যথেষ্ট সুনাম আছে। আপনি আমার কাজের বিচার করুন।' বাদশা মন্ত্রী মুসাকে সম্বোধন

করে বললেন, 'শামশের খাঁ তো দেখছি যে-সে লোক নয়। গরিবদের প্রতি তার যথেষ্ট দয়া। সে সত্যিকারের একজন মহানুভব ব্যক্তি। এহেন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া কি বাঞ্ছনীয়?' বিজ্ঞ মন্ত্রী বললেন, 'বান্দা নওয়াজ, আমিও শামশের খাঁর মহানুভবতার অনেক কাহিনী শুনেছি। সে এই গরিব বৃদ্ধকে দুঃসময়ে সাহায্য করেছিল বলেই বৃদ্ধ তার বিপদের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে খোদার ফেরেশতার মতোই এসে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে রক্ষা করেছে। আমাদের রসুলে করিম সত্যই বলেছেন: দান এবং পরোপকার মানুষের বিপদের সময় কাজে আসে। এ সত্যের আজ এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। শামশের খাঁ যে প্রকৃত একজন বীর এবং উচ্চমনা লোক স্পষ্টই তা বোঝা যাচ্ছে। এরূপ লোককে শত্রু করার চেয়ে বন্ধু করাই বাঞ্ছনীয়। আপনি তার পূর্ব-অপরাধ ক্ষমা করে তাকে উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত করুন। রাজ্যের তাতে মঙ্গলই হবে।'

সুলতান উজিরের কথার সমীচীনতা স্বীকার করলেন। শামশের খাঁর নামে এক রাজকীয় পত্র পাঠানো হল। পত্রে পূর্ব-অপরাধ ক্ষমা করে তাকে উক্ত রাজপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল। শামশের খাঁ যথাসময়ে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করল। সুলতান তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন এবং সেনানীর পদে বহাল করলেন। উত্তরকালে এই শামশের খাঁ রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

বায়ান্ন বছরের ছদ্মবেশ

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে একজন মহিলা ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীতে ৫২ বছর চাকরি করেছেন। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, তিনি যে মহিলা ছিলেন এটা কেউ জানত না। তিনি সর্বক্ষণ পুরুষের ছদ্মবেশে থাকতেন।

তিনি পুরুষের বেশ ধরেই সেনাবাহিনীর চাকরিতে ঢুকেছিলেন এবং সুদীর্ঘ ৫২ বছর ধরে নিজের সত্যিকার পরিচয় গোপন রাখতেও সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হলেন ড. জেমস ব্যারি (১৭৯৫-১৮৬৫)। তাঁর আরো পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের তৎকালীন এক লর্ডের নাতনি। ছোটবেলায় তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি দুঃখজনক ঘটনা থেকেই তিনি সহসা এধরনের আত্মগোপন করে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিজ্ঞা করেন তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন পুরুষের ছদ্মবেশে থাকবেন। আর এভাবেই ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিজের নাম-পরিচয় পাল্টিয়ে চাকরি নেন। তিনি প্রথম কমিশন র‍্যাঙ্কের চাকরিতে ঢোকেন এবং সেখান থেকেই ধীরে ধীরে আপন দক্ষতা ও কৃতিত্ববলে আর্মি মেডিকেল কোরে জেনারেল পদে উন্নীত হন। তবে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অবিবাহিত। স্বভাবের দিক দিয়ে ছিলেন ভয়ানক বদমেজাজি। আবার ভালো মুষ্টিযোদ্ধা। সবার ওপরে তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। তিনি তাঁর নিজের পরিচয় এমন নিখুঁতভাবে গোপন রেখেছিলেন যে সেনাবাহিনীর অন্য লোকেরা তো দূরে থাক, তাঁর একজন গৃহভৃত্য যে কিনা তাঁর সুদীর্ঘ ৫০ বছরের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী সে-ও কখনো টের পায়নি তার মনিব কী ছিলেন। তাঁর সত্যিকার পরিচয় ধরা পড়ে মৃত্যুর পর। তাঁর শরীর উন্মোচন করতে গিয়ে সবাই সবিস্ময়ে দেখেন ড. জেমস ব্যারি ছিলেন আসলে একজন মহিলা।

মৌমাছি কেমন করে মধু তৈরি করে?

আমাদের মতো মৌমাছিদেরও কলোনি বা উপনিবেশ আছে। এদের সুসংগঠিত জীবনযাত্রার সাথে অন্যকোনো কীটপতঙ্গ বা বন্যপ্রাণীর জীবনযাত্রার তুলনা হয় না। একটি রানী-মৌমাছি ও হাজার হাজার শ্রমিক-মৌমাছি নিয়ে এক-একটি কলোনি। কলোনিগুলোর অবস্থান মৌচাকে। রানী-মৌমাছি ডিম পাড়ে—আর অন্য মৌমাছিরা সেই ডিমের তত্ত্বাবধানে থাকে। প্রতিদিন রানী-মৌমাছি ১৫০০-রও বেশি ডিম পাড়ে। একেকটি নির্দিষ্ট ঋতুতে মোট প্রায় ২৫০,০০০ ডিম পাড়ে। একটি রানী তার জীবদ্দশায় ১,০০,০০০-র বেশি ডিম পেড়ে থাকে। বেশিরভাগ মৌমাছি এক থেকে দুবছর পর্যন্ত বাঁচে। মৌমাছিদের এক-একটি কলোনিতে ৬০,০০০টি পর্যন্ত মৌমাছি থাকতে পারে। শ্রমিক-মৌমাছিদের অনেক কাজ। প্রথম দিকে এরা মৌচাককে পরিষ্কার করে ও ঘসে মসৃণ করে তোলে। কয়েকদিন পর এরা মৌমাছিদের শূককীটের (Larva) তত্ত্বাবধান করা শুরু করে। তার জন্য, ফুলের মধু আহরণে এদেরকে বেরোতে হয়।

আসলে, মধু হল এই সব মৌমাছিদের খাদ্য। মৌমাছিদের মধু তৈরি করা মানে হল তাদের নিজেদের জন্য মধু সঞ্চয় করে রাখা। এই মধু তারা ফুল থেকে ফুলে ঘুরে আহরণ করে। ফুলে একরকম মিষ্টি তরলপদার্থ থাকে। একেই সুধা বা মধু (Nectar) বলে। মৌমাছিরা এই মধু পান করে এবং তাদের শরীরস্থ মধুর থলিতে করে মৌচাকে নিয়ে যায়। মধুর থলিটির অবস্থান তাদের পেটের কাছে। একটি ভাল্ব মধুর থলিটিকে পেট থেকে আলাদা করে রেখেছে।

ফুলের মধুতে যে চিনি বা শর্করা থাকে তার রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। ফুলের মধুতে যে জলকণা থাকে তা বাষ্পীভূত হয়। এই বাষ্পীভবনের ফলে মৌচাকে সঞ্চিত মধু নষ্ট না-হয়ে অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে। ভবিষ্যতের জন্য মৌমাছিদের খাদ্য হিসেবে এই মধু সঞ্চিত থাকে।

মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের নানা উপায় আছে। মৌচাককে নিংড়িয়ে মধু বের করা যেতে পারে। মৌচাক থেকে মধু বের করার যন্ত্রও পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের নাম মধু-নিষ্কর্ষক (honey extractor)।

মধুর বর্ণ ও স্বাদ নানা রকম হয়। যেসব ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে তার ওপরই মধুর বর্ণ ও স্বাদের বিভিন্নতা নির্ভর করে। মধুতে অনেক পদার্থ বিদ্যমান। তার মধ্যে লেভুলোজ (levulose) ও ডেক্সট্রোজ (dextrose) নামে দুইপ্রকার শর্করা, মল্টোজ (maltose), ডেক্সট্রিন্স (dextrins), খনিজ (minerals), এনজাইম (enzyme)—জৈব রাসায়নিক পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, সামান্য পরিমাণ প্রোটিন ও এসিড বর্তমান। এইজন্য মধু আমাদের পক্ষে খুব উপকারী।

আলী ইমাম

আলোকিত ভুবনে

স্কুলের পাঠাগারে একদিন সন্ধান পেলাম সোনার খনির। তখন সেই বয়স, যখন রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী পড়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠি। অশান্ত নীল সমুদ্রের পালতোলা জাহাজ ছুটে যাচ্ছে, খোলা ডেকে অট্টহাসি দিয়ে চিতাবাঘের মতো লাফিয়ে পড়ছে ভয়ঙ্কর জলদস্যুরা। তাদের ধারালো অস্ত্র রক্তভেজা। এইসব লোমহর্ষক ঘটনার কথা ভেবে শিহরিত হতাম। খুঁজে ফেরতাম গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রাকারীদের অভিযানের গা-ছমছমে বই। আমার স্বপ্নের পৃথিবীতে তখন দুঃসাহসী নাবিক। নিষ্ঠুর জলদস্যু। বন্দরের সরাইখানায় তুমুল হট্টগোল। রহস্যময় শাদা তিমির খোঁজে ক্যাপ্টেন আহাবের বারবার যাত্রা। সেই সময় হাতে এল একটি অপরূপ বই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা'। সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত। দেখতে অন্য ধরনের। প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়ের আঁকা। পেছনের মলাটে ছোট টাইপে বইটির বিষয় সম্পর্কে লেখা। স্কুলের বাংলার শিক্ষক কাজী নূরুল হক বইটি পড়তে বিশেষ করে বললেন। রাত জেগে 'বুড়ো আংলা' পড়লাম। যেন অমল আলোর ধারার একটি দুয়ার খুলে গেল আমার ভেতরে। আমি স্বচ্ছ, প্রশান্ত হয়ে উঠলাম। প্রচণ্ড আলোড়িত করল বইটি। রিদয় নামের একটি ছোট ছেলে সুবচনীর হাঁসের পিঠে চেপে উড়ে শ্যামল বাংলাদেশের অপরূপ নিসর্গের মোহন স্বাদ অনুভব করছে। নদীগুলোকে মনে হচ্ছে রুপোলি ফিতে। সবুজ ধানজমি। হলুদ শর্ষেক্ষেত। চরের বুকে নলখাগড়ার ঝোপ। লতাপাতা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখির এক অপূর্ব জগৎ। মেঘের নিচে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে যাযাবর বুনোহাঁসের দল। মানস-সরোবরে যাওয়ার পথের কথা আছে। ঐ বই পড়ে দেশের কাজল মাটির জন্যে নতুন করে

মায়া জন্মায়। নমিত হয়ে বলতে ইচ্ছে করে: 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' অবন ঠাকুর কী দক্ষতার সাথে লিখে গেছেন। চমৎকারভাবে চিত্রের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন এই সুন্দর স্বপ্নের মতো শিহরণকে। 'বুড়ো আংলা' বইটি আমাকে ভীষণ রকমের পালটে দিল। যেন সন্ধান পেলাম এক সোনালি তোরণের। আলোর ধারা নেমে আসছে শব্দরাশির ভেতর দিয়ে। আলোকিত করে তুলছে আমাকে। সাহিত্যের নিবিড় স্বাদ পেলাম। আমার দিগন্ত অনেক বিস্তৃত হয়ে গেল। অবনঠাকুরের গদ্যশৈলী আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করল। কী প্রসন্ন গদ্য! পাঠ করলে মন প্রশান্ত হয়ে ওঠে। নমিত হয়। ক্রমশ পড়লাম *নালক, ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, ভূত পতরির দেশ, আলোর ফুলকি, রাজকাহিনী*। *আপন কথায়*, কী চমৎকারভাবে লিখেছেন: 'বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে ফুলবাগান, পুকুর, গাছপালা, মেহেদির বারান্দায় হলকা চুল্লির মতো বাথরুম, আর ঘরের মধ্যে গ্রীষ্মাতুর মহিলার বিলাপধ্বনি। দিনের পর দিন, দিনে ও রাত্রে, একইরকম।'

সাহিত্যের তীব্র স্বাদ সোনালি তোরণের মতো নতুন পথের সন্ধান দিল। ছোট মাপের এই পৃথিবীর বাইরে যেতে হবে। যেখানে থাকবে না মানুষের সংকীর্ণতা। লোভ-লালসার গোপন থাবা। বিষয়ী মানুষের মুখ। চারপাশের পৃথিবীতে স্থূল মানুষজনের দাপট। তারা শুধু মাপা, হিসাবি কথা বলে। জটিল অঙ্ক কষে। নক্ষত্রের নীল আলো নীরবে কীভাবে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে, তার খবর রাখে না। মাছেরা যে গান গায় তা বিশ্বাস করে না। আমি হাঁফিয়ে উঠি। মন ছটফট করে। দূর আকাশের দিকে তাকাই। ভিজে মেঘের দুপুরে একাকী উড়ে যায় শঙ্খচিল। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় খুঁজে পাই সেই আর্তনাদ। নিঃসঙ্গ চিলকে না-কাঁদার জন্যে অনুরোধ তাহলে সাহিত্যের শব্দই দিতে পারে। পারে আমাদের এই সীমাবদ্ধ পৃথিবী থেকে দূরের আভাস দিতে।

পুরনো ঢাকার একটি বিখ্যাত বাজারের মাঝে ছিল আমাদের স্কুল। প্রচণ্ড ভিড় হত সেখানে। স্কুলের সামনের রাস্তাটিতে ডাঁই করে রাখা থাকত তরিতরকারি। তাজা সবজির উজ্জ্বল রঙ দেখতে ভালো লাগত। ব্রিটিশ আমলে স্কুলটির নাম ছিল 'প্রিয়নাথ বিদ্যালয়'। পরে নাম হল 'নওয়াবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়'। সেখানেই কেটেছে আমার টুল-বেঞ্চের ঝলমলে দিনগুলো।

স্কুলে একটি পাঠাগার ছিল। সবসময় যার দরজায় একটা বড় মরচে-পড়া তালা ঝুলত। জানালা দিয়ে দেখতাম ভেতরে কয়েকটি বইয়ের আলমারি কেমন অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। খুব ইচ্ছে হত বইগুলো দেখার জন্যে। কিন্তু এই মরচে-পড়া তালাটিই মনে হত ভয়ঙ্কর শত্রু। ভাবতাম, আহা কেউ যদি এই তালাটি খুলে দিত!

একদিন সত্যিই সেটা খুলল। বাংলার শিক্ষক হয়ে এলেন নূরুল হক। তিনি রচনা বই লিখতেন। ঝোঁক ছিল সাহিত্যে। তিনি এসেই পাঠাগারের অর্গল মুক্ত করলেন। আমাদের উৎসাহিত করলেন বই নিতে।

এই সংবাদটি ছিল দারুণ আনন্দের। ক্লাস এইটে পড়ি তখন। আবছা অন্ধকারের ঐ ঘরটি যেন সোনালি এক দিগন্তের সন্ধান দিল। চারপাশে এত বই!

স্যার বললেন, এই স্কুলে আগে বাংলার শিক্ষক ছিলেন অজিত গুহ। তিনি অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন। অজিত বাবুকে চিনি। কচিকাঁচার মেলার উপদেষ্টা। থাকতেন হাটখোলার টয় হাউসে। আমাদের বলতেন, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে। সূর্য ওঠার আগে। তাতে মন প্রসন্ন থাকে। তাঁকে বললাম আমাদের স্কুলের পাঠাগারটি খোলার কথা। শুনে আনন্দে উদ্ভাসিত হলেন তিনি। খানিকটা ঝুঁকে বললেন: 'শোন্, ওখানে অবনঠাকুরের কিছু বই আছে। *নালক, ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, বুড়ো আংলা, আলোর ফুলকি, খাতাঞ্চির খাতা*। আমি কিনেছিলাম। এইগুলো নিয়ে পড়বি। 'বুড়ো আংলা'

কিন্তু অবশ্যই পড়বি।' পরদিন স্কুলে আবছা অন্ধকারের পাঠাগারে গিয়ে দুরন্ত এক নাবিকের মতো অভিযান চালালাম। কোণার শেলফের নিচের তাকে পেয়ে গেলাম ধুলোমাখা বই 'বুড়ো আংলা'। সিগনেট নামটি যেন মনে গেঁথে গেল।

শেষে বিকেলের ছাইরঙা আলোতে বইটি পড়া শুরু করলাম। কী অপূর্ব ভাষা! ঝরনার মতো তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে যেন ফুটে উঠছে ছবি। সোনালি-রুপোলি ছবি। বইয়ের খসখসে পাতাগুলো উড়িয়ে নিয়ে চলল স্বপ্নের এক পৃথিবীতে। দূর জগতের আভাস এল ঘনিয়ে। তখন সেই বয়স যখন ভাবি, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'।

বইটির ভাষা অন্যরকম। কাহিনী অন্যরকম। লেখার গাঁথুনি অন্যরকম। অন্য কোনো বইয়ের সাথে এটা মেলে না। বাক্যগুলো যেন খুব মমতা মিশিয়ে লেখা।

বইটির শুরু হয়েছে এক দুষ্টুছেলের কথা দিয়ে। যে ছেলের নামের বানানটিকে মনে হয় অন্য ধাঁচের। বোঝাই যায় এ আমাদের অন্য এক ভুবনের সন্ধান দেবে। বইটি শুরু হয়েছে এভাবে : 'রিদয় বলে ছেলেটি নামেই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গরুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি...এমনি নানা উৎপাতে সে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সবাইকে এমন জ্বালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না।' চমৎকার, মন-উতল-করা গল্পটির শুরু হয় এভাবে : দুষ্টু ছেলে রিদয় চালাকি করতে যায় গণেশ ঠাকুরের সাথে। অমনি গণেশ ঠাকুর তাকে শাপ দিল। সেই শাপে রিদয় দেড়-আঙুলের ছোট মাপের হয়ে গেল। রিদয় তখন এত্তোটুকুন ছোট। তার চোখ দিয়ে দেখা পৃথিবী। চেনা পরিবেশটি কী অদ্ভুতভাবেই-না পাল্টে গেল! সবকিছুকেই দেখাচ্ছে বড়। মুরগিটাই কেমন পালক ফুলিয়ে তেড়ে আসছে। এখন সে যক্ষ হয়ে গেছে। রিদয়কে আবার মানুষ হতে হলে যেতে হবে হিমালয়ের কৈলাসে। সেখানে সন্ধান করতে হবে গণেশ ঠাকুরের। তাঁর কাছে চাইতে হবে ক্ষমা।

রিদয় তখন সুবচনীর হাঁসের পিঠে চেপে কৈলাসের দিকে যাত্রা শুরু করে। সে এক উত্তেজনায় ভরা দুরন্ত অভিযানের কাহিনী। অবনীন্দ্রনাথ অপরূপ এক ভাষায় এই যাত্রাপথকে তুলে ধরেছেন। নিজে ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তাঁর তুলির টানে ছবি যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। তিনি বলতেন, 'তুলিটি জলে ডুবিয়ে রঙে ডুবিয়ে তবে ছবি আঁকতে হয়।'

অবনঠাকুর 'বুড়ো আংলা'র পাতায় পাতায় শব্দ সাজিয়ে ছবি এঁকেছেন—যা পাঠ করে অনায়াসে আমাদের মনের চোখ খুলে যায়। চেনা-জানা-শোনার পৃথিবীটা হয়ে যায় অনেক সম্প্রসারিত। নতুন দিগন্তের সন্ধান পাওয়া যায়। মনের মাঝে ছড়িয়ে যায় আশ্চর্য এক অনুভব। মনে হয় পৃথিবীটা সত্যি কত সুন্দর! কত যে এর রহস্য!

অবনঠাকুর স্বদেশের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের ধার করা বিদ্যায় নিজেকে প্রকাশিত করেননি। দেশের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল।

'বুড়ো আংলা' বইটিতেও ছড়িয়ে রয়েছে দেশের এই অপরূপ নিসর্গের বর্ণনা। নদী, পাহাড়, ফসলের মাঠ, চর, অরণ্য, ঝোপ সবকিছুই লেখকের চোখে অপূর্ব। তাঁর গদ্যশৈলী প্রসন্ন। যেন ইশারায় পাঠকদের জীবনের গভীর সত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। অবনঠাকুর সেই ইশারা জানতেন। তিনি স্বপ্ন-দেখা ছোটদের মনের কথা লিখেছিলেন: 'সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকানো দেরাজ আছে। চাবি ছেলেরা হারিয়ে ফেললে মুশকিল হবে। তাই এই লুকানো দেরাজের চাবি নেই। একটা করে খিল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখানে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি। সারাদিন যে যা খেলেছে, যা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখেছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায়, এমনকি রাতের স্বপ্নের ছবিও এই ছোট্ট খাতায় রোজ রোজ নতুন নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে।... অনেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তবু এই সবুজ খাতা, লুকানো দেরাজের সন্ধানই পেল না।'

মনের মাঝে লুকিয়ে-থাকা এই অপরূপ সবুজ খাতাটির সুলুকসন্ধান দিতে চেয়েছিলেন অবনঠাকুর। ছোটরা যেন অনুভব করতে পারে জীবনটা কত সুন্দর। বেঁচে-থাকার মধ্যে কতটা আনন্দ রয়েছে।

আকাশ যখন অপরাজিতা ফুলের মতো নীল, তখন বুনোহাঁসদের সঙ্গী হয়ে উড়ে চলেছে রিদয়। নিচে রুপোলি ফিতের মতো নদী। ফসলের মাঠ। বাতাসে আন্দোলিত যাযাবর পাখিদের ডানা। রিদয় সুবচনীর হাঁসের গলা জড়িয়ে থাকে।

অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাটি ছিল আশ্চর্য সুন্দর। তিনি সেই ছেলেবেলাটি নিরেট সোনার মতো গলিয়ে ফেলতে পারতেন। আর তাই দিয়ে তৈরি করতেন গল্প। তাঁর ভাষায়: 'এই পৃথিবীতে যখন মানুষের ছেলে পদার্পণ করে তখন সে একবারে খালি হাতে আসে না, সঙ্গের সাথী করে নিয়ে আসে শুধু একটুখানি পিপাসা।' এই পিপাসাটিই হল আসলে সব। এর মাঝেই রয়েছে দেখার ইচ্ছে, জানার ইচ্ছে, শোনার ইচ্ছে। বিস্তৃত হবার ইচ্ছে। 'বুড়ো আংলার' পাতায় পাতায় সেই দেখার ইচ্ছে। কীটপতঙ্গ আর গাছপালার এমন রহস্যময় পৃথিবীর সন্ধান অবনঠাকুরের মতো খুব কম লেখকই দিতে পেরেছেন। লীলা মজুমদার অবনঠাকুরের জীবনী লিখতে গিয়ে বলেছেন: 'সত্যিকার যে পিপাসা সে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়া ঠাণ্ডা মিষ্টি জল ছাড়া আর কিছুতে মেটে না। শিল্পসৃষ্টির রহস্যের অনেকখানি এখানে। এ বাড়ির আনাচেকানাচে প্রাণের পাখি বাসা বেঁধে থাকত। পোষা পাখি, কুকুর,

হরিণ, বাঁদর, লাল মাছ, গাছের মগডালে চিলের বাসা, ঘুলঘুলিতে পেঁচা, দেয়ালে টিকটিকি, আরশোলা, পোকামাকড় কোনোকিছুই এড়িয়ে যেত না অবনীন্দ্রনাথের চোখ।'

এই চোখ দিয়েই বুড়ো আংলার ছোট্ট নায়ক রিদয় তার চারপাশের পৃথিবীকে দেখেছে। বাংলাদেশের নিসর্গকে দেখেছে। সবুজ লতাপাতার গন্ধ পেয়েছে।

আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি একটি বই কী দারুণভাবে আমাদের আলোড়িত করে যায়। উদ্দীপিত করে যায়। রিদয় তার দুঃসাহসিক অভিযানে আমাদের অনায়াসে সঙ্গী করে নেয়।

'বুড়ো আংলা' আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। আমরা কৃতজ্ঞ হই ঐ আলোকিত বইটির প্রতি। 'বুড়ো আংলা' পাঠ করে আমি অনুভব করেছি লেখকরা আসলে আলোর পাখি।

ক্লাস নাইনে পড়ি। গরমের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছি নানার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সবুজ গাছপালায় ঘেরা চমৎকার ছিমছাম এক সুন্দর মফস্বল শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সেখানে আমার স্বপ্নমাখা ছেলেবেলার উজ্জ্বল সোনালি দিনগুলোর স্মৃতি মিশে আছে।

আমি জানতাম না এক নীরব দুপুরে আমার জন্যে কী এক বিস্ময়কর ঘটনাই-না অপেক্ষা করছে। আমার নানাবাড়ির মাচার উপরে বাসা বেঁধেছিল কয়েকটি কবুতর। 'বাকুম বাকুম' করে ডাকত কবুতরগুলো। একবার টের পেলাম ডিম ফুটে পাখিদের ছানা বেরিয়েছে। একটা রোঁয়া-ওঠা ছানা হঠাৎ ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। তাকে মাচার উপরে কবুতরদের বাসায় তুলে দিতেই সেই ঘটনাটি ঘটল। বাঁশের মই বেয়ে উঠে গেলাম মাচায়। আমি আগে কখনও ওখানে উঠিনি। অনেক জিনিসপত্র মাচায় ডাঁই করে রাখা। আবছা আলোর আঁকিবুঁকি চারপাশে। ছানাটিকে রেখে ফিরে আসতেই চোখে পড়ল মস্তবড় এক টিনের ট্রাঙ্ক। কৌতূহল নিয়ে ওটা খুললাম। ন্যাপথোলিনের গন্ধ ভেসে এল। লাল রঙের মলাটে নাম লেখা : 'বার্ষিক শিশু সাথী'। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে ঐ বইগুলো তুলে আনলাম। আমার মনে হল আমি যেন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। মই দিয়ে নেমে পুকুরপাড়ের গন্ধলেবুর গাছের ছায়ার নিচে বসে পড়তে লাগলাম। হাতছানি দিয়ে ডাক দিল রহস্য-রোমাঞ্চভরা কাহিনী। একটি গল্পে টাকাল মাকান মরুভূমি পার হয়ে যাওয়া দুঃসাহসী অভিযান কাহিনী। রাতের বেলায় ঘোড়ার মাংস ঝলসে খায় যাবাবর মানুষগুলো। একটি গল্পে হিমালয়ের রহস্যময় তুষারমানব ইয়েতির কথা রয়েছে। মানস সরোবরে কেমন করে রাজহাঁসেরা থাকে তার গল্প। আফ্রিকার কঙ্গোর গহিন জঙ্গলে কেমন করে পথ হারিয়ে শিকারি পাইথনের শিকার হচ্ছে তার গা-শিউরানো সব কাহিনী। রাতের বেলায় পোড়োবাড়িতে শোনা যায় চাপা হাসির শব্দ।

আমি একের পর এক পাতা উল্টে যাই। 'শিশু সাথী'র খসখসে কাগজগুলো হঠাৎ করে যেন বুনোহাঁসের ডানা হয়ে উড়তে থাকে। আমি ঐ কোমল-নরম পালকে মিশে উড়ে যাই গল্পগুলোর রোমাঞ্চকর ভুবনে। এভাবেই আমার ভেতরে নিঃশব্দে এক পরিবর্তন ঘটে যায়। গল্পগুলো পড়তে পড়তে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কখনও লোমকূপের গোড়া শিরশির করে। শেষ বিকেলের ম্লান আলোতে আমি আরও অভিভূত হয়ে যাই যখন পড়ি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রগ্রীব' নামের উপন্যাসটি, যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। 'চিত্রগ্রীব' একটি কবুতরের নাম। হিমালয়ের তরাই বনের ভেতরে ঐ কবুতরের সংগ্রামমুখর কাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। দমকা বাতাসে গন্ধলেবুর গাছের পাতা ঝরে পড়ে আমার শরীরের উপর। সাঁত করে পানিতে ঝিলিক তুলে চলে যায় ডোরাকাটা পান্নাস সাপের বাচ্চা। ঐরকম উপমা কেন মনে হল আমার? রোমাঞ্চকর গল্পগুলো তবে কি আমাকে পাল্টে দিচ্ছে? পাশের ঝোপের কাছে করমচা গাছটিকে আশ্চর্য সুন্দর মনে

হল আমার কাছে। করমচা ফল এত সুন্দর! একফোঁটা দুধের ভেতরে যেন লাল সিঁদুরের ছোপ। আমার চোখের দৃষ্টি তখন পাল্টে যাচ্ছে।

কয়েকদিন ধরে আচ্ছন্নের মতো পড়লাম বার্ষিকীগুলো। রাতের বেলা হারিকেনের আলোতে ঐ বইগুলোর অক্ষরগুলো আরও জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। স্বপ্নমাখা রহস্যের কুয়াশামাখা রোমাঞ্চে শিউরে-ওঠা লাল, নীল কমলের দিন। কড়ির পাহাড়ও পেরিয়ে যাচ্ছে রাজপুত্র। মাঝসমুদ্রে তিমি শিকার করছে নরওয়ের দুঃসাহসী নাবিকেরা। হ্যান্স এন্ডারসনের মায়াবী রূপকথার গল্প। আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলি ঐ হাঁসের ছানার কাহিনী পড়ে। আর এভাবেই বই-এর অপরূপ জগৎ আমাকে অবিরাম আলোড়িত করে। সন্ধান দেয় আশ্চর্য, রহস্যময় এক পৃথিবীর। আমার মনের বন্ধ-খিল যায় খুলে। আলোকিত ভুবনের স্পর্শে তা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার কৈশোরের দিনগুলো বই-এর আলোকিত ভুবনের কল্যাণে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। আমি তুমুলভাবে বেঁচে থাকার আনন্দকে আবিষ্কার করে শিহরিত হই। তাই বই-এর কাছে আমি প্রবলভাবে ঋণী।

হাত নয় পা

নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে না-দিয়ে যারা আপন চেষ্টায় ভাগ্যকে জয় করেছিলেন, হারমেন আনথান ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৪৮ সালে হারমেন জন্মগ্রহণ করেন প্রুশিয়ায়। জন্মগ্রহণ করার সময় থেকেই দুটি হাত ছিল না তাঁর। অর্থাৎ জন্মবিকলাঙ্গ ছিলেন তিনি।

হাতহীন পঙ্গু লোকের পক্ষে সাধারণ মানুষের মতো কোনো কাজই করা সম্ভব নয়। অপরের করুণা নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না তাদের। কিন্তু হারমেন আনথান ছিলেন অন্য ধাঁচের মানুষ। কারো কৃপা বা অবজ্ঞা নিয়ে বেঁচে থাকতে রাজি ছিলেন না তিনি। তাই জীবনপণ করে তিনি শুরু করেছিলেন ভাগ্যকে জয় করার সাধনা। অবশেষে জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

হাতহীন হারমেন তাঁর পাদুটো দিয়ে মুছে ফেলেছিলেন তাঁর ভাগ্যের লিখনকে। পা দিয়ে বেহালা বাজানো শিখে হারমেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমন নিপুণতার সাথে তিনি বেহালা বাজাতেন যে, সুরেরা যেন তাঁর পায়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ত!

শুধু বেহালা বাজানোই নয়, হাতের প্রায় প্রতিটি কাজই করে যেতেন তিনি পা দিয়ে। যেমন—বিশেষ ধরনের রেজর দিয়ে শেভ করতেন তিনি। লিখতে পারতেন পাতার পর পাতা। ছবি আঁকতে পারতেন নিখুঁতভাবে। পেন্সিল চাঁছার মতো কঠিন কাজটিও তিনি করতেন পায়ের সাহায্যে। জেনে অবাক হতে হয়, হারমেন তাঁর ঘড়িটিও নিয়মিত চাবি দিতেন তাঁর পায়ের সাহায্যে।

১৯২৮ সালে মারা যাবার আগপর্যন্ত জন্মপঙ্গু হারমেন ছিলেন বিশ্ববাসীর কাছে এক প্রশংসনীয় উদাহরণ, চরম বিস্ময়। এর সবই সম্ভব হয়েছিল হারমেন আনথানের দৃঢ়সংকল্প, ব্যক্তিত্ব ও অধ্যবসায়ের জন্যে।

কাজী নজরুল ইসলাম
সাম্যবাদী

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?—পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বল আরো!
বন্ধু, যা-খুশি হও,
পেটে পিঠে, কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও, যত সখ—
কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি'।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।

সত্যজিৎ রায়

জুটি

'আজ আমি একজন ফিল্মস্টারের কথা বলতে যাচ্ছি', চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন তারিণীখুড়ো। 'কে তিনি? তাঁর নাম কী?' আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'তাঁর নাম তোরা শুনিসনি', বললেন তারিণীখুড়ো। 'তিনি যখন রিটায়ার করেন তখন তোরা সবে জন্মেছিস।'

'তবু আপনি নামটা বলুন না', বলল নাছোড়বান্দা ন্যাপলা। 'আজকাল টেলিভিশনে অনেক পুরনো ফিল্মস্টারের ছবি আমরা দেখি।'

'তাঁর নাম হল রতনলাল রক্ষিত।

'জানি, জানি', বিজ্ঞের মতো বলল ন্যাপলা। 'মাস তিনেক আগে জয় পরাজয় বলে একটা ছবি টিভিতে দেখিয়েছিল, তাতে হিরোর বাবার পার্ট করেছিলেন রতন রক্ষিত।'

'তাহলে তো ভালোই হল', বললেন তারিণীখুড়ো। 'তাঁকে ছবিতে দেখে থাকলে গল্পটা আরো জমবে।'

'এটাও কি ভূতের গল্প?' ন্যাপলা জিজ্ঞেস করল।

'না, ভূত নয়। তবে ভূত বলতে তো শুধু প্রেতাত্মা বোঝায় না, ভূতের আরো মানে আছে। একটা মানে হল অতীত, অর্থাৎ যা ঘটে গেছে। ভবিষ্যতের উল্টো সেই অর্থে এটা ভূতের গল্প বলতে পারিস।'

'বেশ, তাহলে শুরু হোক।'

তাকিয়াটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তারিণীখুড়ো শুরু করলেন তাঁর গল্প—

রতন রক্ষিত রিটায়ার করেন ১৯৭০-এ সত্তর বছর বয়সে। শরীরটা হঠাৎ ভেঙে পড়েছিল, তাই ডাক্তার বললেন কমপ্লিট রেস্ট। তার আগে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে একটানা অভিনয় করে গেছেন রক্ষিতমশাই। তার মানে সেই সাইলেন্ট যুগ থেকে।

অগাধ টাকা করেছিলেন ছবি করে, আর সেই টাকার সদ্ব্যবহার কী করে করতে হয় সেটাও জানতেন। তিনখানা বাড়ি ছিল কলকাতায়। নিজে থাকতেন অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটে, আর অন্য দুখানা ভাড়া দিয়ে দিয়েছিলেন।

এই রতন রক্ষিত কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন যে তাঁর একজন সেক্রেটারি চাই। আমি তখন কলকাতাতেই ছিলাম, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সারাজীবন টো-টো করে ঘুরে নানান রোজগারের পন্থা ট্রাই করে সবে ভাবছি এবার ঘরের ছেলে যখন ঘরে ফিরেছি তখন সেটেল করা যায় কিনা, এমন সময় বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। দিলুম অ্যাপ্লাই করে। রতন রক্ষিতের নামের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল, ভদ্রলোকের ছবিও, সেটা তো তোরা জানিস।

দরখাস্তের রিপ্লাই এসে গেল সাতদিনের মধ্যে। আমার ডাক পড়েছে ইন্টারভিউ-এর জন্য। গিয়ে হাজির হলুম রক্ষিত মশাইয়ের বাড়িতে।

জানি ভদ্রলোকের শরীর খারাপ, কিন্তু চেহারা দেখে সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। বেশ টান-টান চামড়া, ঝকঝকে দাঁতগুলো ওরিজিন্যাল বলেই মনে হল। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ছবি দেখেছি কিনা। বললুম, পরের দিকের ছবি তো দেখেইছি, গোড়ার দিকেরও কিছু সাইলেন্ট ছবি দেখা আছে, যখন রক্ষিত মশাই কমিক ছবি করতেন।

উত্তর শুনে দেখলুম ভদ্রলোক খুশিই হলেন। বললেন, 'আমি গত কয়েকবছর ধরে আমার সব সাইলেন্ট ছবি সংগ্রহ করছি। আমার এই বাড়িতে একটি আলাদা ঘর আছে যেখানে এইসব ছবি দেখার জন্য একটা প্রোজেক্টর বসিয়েছি এবং সে প্রোজেক্টর চালাবার জন্য একটি লোকও রেখেছি। সাইলেন্ট ছবি আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না। জানেন তো, ফিল্মের গুদামে দুবার দুটি অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সব বাংলা সাইলেন্ট ছবি পুড়ে যায়, ফলে সেসব ছবি এখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। তার ফলে জানতে পারি যে আমার অনেকগুলো সাইলেন্ট ছবি মীরচান্দানি নামে আমার এক প্রোডিউসরের গুদামে সযত্নে রাখা আছে। তার কারণ আর কিছুই না, মীরচান্দানি যে শুধু আমার প্রোডিউসর ছিলেন তা নয়; তিনি ছিলেন আমার 'ফ্যান'। মীরচান্দানি মারা গেছেন বছর চারেক আগে; তার ছেলেকে বলে আমি ছবিগুলো কিনে নিই। এইভাবে বারবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমি আমার সংগ্রহ তৈরি করি। অসুস্থতার জন্য আমাকে রিটায়ার করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফিল্মের জগৎ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। এইসব পুরনো ছবি দেখে আমার সন্ধ্যাগুলো দিব্যি কেটে যায়। আপনার কাজ হবে আমার এই ফিল্ম লাইব্রেরির তদারক করা, ছবিগুলোর একটা ক্যাটালগ তৈরি করা, আর আমার সংগ্রহে নেই এমন ছবি খুঁজে বার করা। পারবেন তো?'

আমি বললাম, 'চেষ্টার ত্রুটি হবে না। যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে ক্যাটালগ করে ঠিক করে রাখা কঠিন কাজ নয়; যে ছবি নেই, তার সন্ধানের কাজটা অবিশ্যি সহজ নয়।' রক্ষিত বললেন, 'আমি

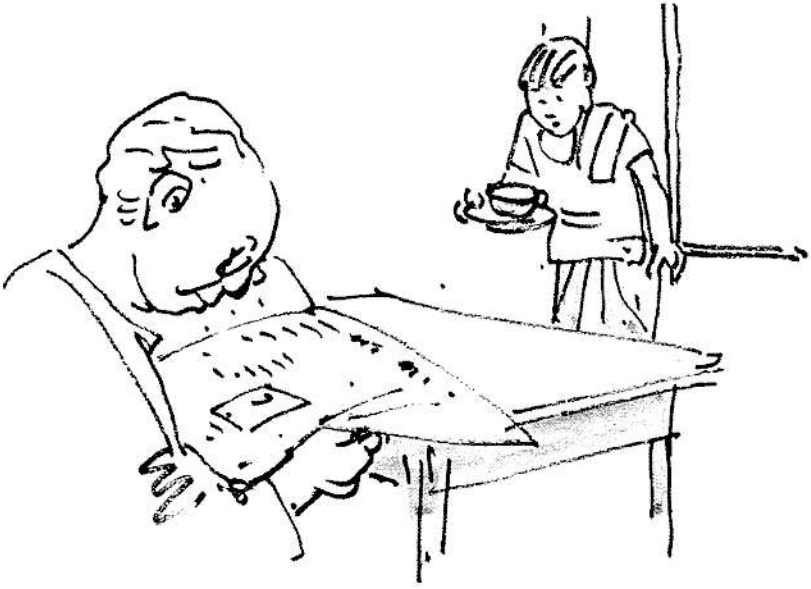

যে শুধু সাইলেন্ট ছবির কথা বলছি তা নয়, গোড়ার দিকের কিছু টকি ছবিও আমার সংগ্রহে নেই। আমার মনে হয় ধরমতলা পাড়ায় প্রযোজক-পরিবেশকদের অফিসে খোঁজ করলে সেসব ছবি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মোটকথা, আমার সংগ্রহে যেন কোনো ফাঁক না-থাকে। বুড়ো বয়সে আমার অবসর বিনোদনের পন্থাই হবে আমার নিজের পুরনো ছবি দেখা।'

চাকরি হয়ে গেল। অদ্ভুত মানুষ। ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন বছর পনের হল। দুই ছেলে আছে, দুজনেই থাকেন দক্ষিণ কলকাতায়। এক মেয়ে থাকে এলাহাবাদে, স্বামী সেখানকার ডাক্তার। নাতি-নাতনিরা মাঝে মাঝে আসে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে; ছেলেরাও যে আসে না তা নয়, তবে ফ্যামিলির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। বাড়িতে থাকে দুটি চাকর, একটি রান্নার লোক, আর একটি খাস বেয়ারা, নাম লক্ষ্মীকান্ত। লক্ষ্মীকান্ত বাঙালি, বয়স ষাটের ওপর এবং অত্যন্ত অনুগত। এমন একজন বেয়ারা পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা।

এই লক্ষ্মীকান্ত'র সাহায্যে কাজ করে আমি দিন দশেকের মধ্যে রক্ষিত মশাইয়ের সংগ্রহের একটা ক্যাটালগ করে দিলাম। তাছাড়া ধরমতলায় ঘুরে উনি টকির আদি যুগে যেসব ছবি করেছিলেন তার অনেকগুলোর হদিস জোগাড় করে দিলাম। ভদ্রলোক সেগুলোর একটা করে প্রিন্ট কিনে নিজের লাইব্রেরিতে রেখে দিলেন।

আমার কাজ দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত; কিন্তু মাঝে মাঝে সন্ধ্যাটাও রক্ষিত মশাইয়ের সঙ্গে কাটিয়ে যাই। সাড়ে ছটায় ভদ্রলোক ছবি দেখতে শুরু করেন, থামেন সাড়ে আটটায়। প্রোজেকশনিস্টের নাম আশুবাবু, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, কাজে কোনো ক্লান্তি নেই। দর্শক মাত্র তিনজন—রক্ষিত মশাই, বেয়ারা লক্ষ্মীকান্ত আর আমি। বেয়ারাকে থাকতে হয়, কারণ বাবু গড়গড়ায় তামাক খান; সেই তামাক মাঝে মাঝে ফিরিয়ে দিতে হয়। তবে লক্ষ্মীকান্ত-যে ছবিগুলো উপভোগ

করে সেটা অন্ধকারে তার মুখের দিকে চেয়ে আমি বুঝেছি।

সবচেয়ে মজা লাগে যখন সাইলেন্ট যুগের ছবিগুলো দেখানো হয়। আগেই বলেছি যে রতন রক্ষিত সেই সময় হাসির ছবি করতেন। এইসব ছবির মধ্যে অনেকগুলো ছিল যাকে বলে শর্ট ফিল্ম। দু-রিলের ছবি, কুড়ি মিনিট ছিল তাদের দৈর্ঘ্য। এই ছবিতে দেখানো হত লরেল-হার্ডির মতো এক জুটির কীর্তিকলাপ। ছবিতে তাদের নাম ছিল বিশু আর শিবু। বিশু সাজতেন রতন রক্ষিত আর শিবুর পার্ট করতেন শরৎ কুণ্ডু নামে এক অভিনেতা। দুই কমিক অভিনেতার হৈ-হুল্লোড়ে বিশ মিনিট দেখতে দেখতে বেরিয়ে যেত। কখনো তারা ব্যবসাদার, কখনো জুয়াড়ি, কখনো সার্কাসের ক্লাউন, কখনো জমিদার আর মোসাহেব—এই রকম আর কি। কুণ্ডু-রক্ষিতের এই জুটি তখন খুব পপুলার হয়েছিল এটা মনে আছে। বড় ছবির আগে এই কুড়ি মিনিটের শর্ট ফিল্ম দেখানো হত।

এই ছবি চলার সময় দেখবার জিনিস হত রক্ষিত মশাইয়ের হাবভাব। নিজের ভাঁড়ামো দেখে তিনি নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়তেন। কোনো কমিক অভিনেতা যে নিজের অভিনয় দেখে এত হাসতে পারে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর দেখাদেখি অবিশ্যি আমাকেও হাসতে হত। রক্ষিত মশাই বলতেন, 'জানো তারিণী, এইসব ছবি যখন করেছি, তখন এগুলো দেখে মোটেই হাসি পায়নি। বরং নির্লজ্জ ভাঁড়ামো দেখে বিরক্তই লাগত। কিন্তু এতদিন পরে দেখছি এর মধ্যে একটা নির্মল হাস্যরস আছে যেটা আজকের হাসির ছবির তুলনায় অনেক ভালো।'

একটা প্রশ্ন কিছুদিন থেকে আমার মাথায় ঘুরছিল, একদিন সেটা রক্ষিত মশাইকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম। বললাম, 'একটা ব্যাপারে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে; আপনি তো বিশু সাজতেন, কিন্তু শিবু যিনি সাজতেন সেই শরৎ কুণ্ডুর কী হল? তাঁর সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ নেই?'

রক্ষিত মশাই মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি যতদূর জানি, শরৎ কুণ্ডু সাইলেন্ট যুগের পর আর ছবিতে অভিনয় করেনি। আমরা যখন একসঙ্গে কাজ করেছি তখন আমাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। ভেবে ভেবে নানারকম ভাঁড়ামোর ফন্দি বার করতুম দুজনে। ডিরেক্টর যিনি ছিলেন তিনি নাম-কা-ওয়াস্তে। ছবির মাল-মশলা সব আমরাই জোগাতুম। তারপর একদিন কাগজে দেখলুম হলিউডের ছবিতে শব্দ যোগ হচ্ছে, পাত্রপাত্রীরা এবার থেকে কথা বলবে, আর সেই কথা দর্শক শুনতে পাবে। সেটা ছিল ১৯২৮ কি ২৯ সাল। যাই হোক, হলিউডে সত্যিই টকি এসে গেল। আমাদের এখানে আসতে লাগল আরো তিন-চার বছর। সে এক হৈহৈ ব্যাপার। সিনেমার খোল-নলচে পালটে গেল। তার সঙ্গে অভিনয়ের রীতিও। আমার কিন্তু একটা থেকে আরেকটায় যেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। গলার স্বরটা ভালো ছিল, তাই টকি আমাকে হটাতে পারেনি। তখন আমার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। বাংলা ছবিতে সুকণ্ঠ হিরোর দরকার। সেই হিরোর পার্টে আমি অনায়াসে খাপ খেয়ে গেলুম। বিশ মিনিটের ভাঁড়ামোর যুগ শেষ হয়ে গেল। আমি হয়ে গেলুম ছবির নায়ক। কিন্তু সেই সময় থেকেই শরৎ কুণ্ডু কেমন যেন হারিয়ে গেল। যদ্দুর মনে পড়ে, দু-একজনকে জিজ্ঞেসও করেছিলুম ওর কথা, কিন্তু কেউ সঠিক জবাব দিতে পারেনি। লোকটার অকালমৃত্যু হয়েছিল কিনা কে জানে।'

তাই যদি হয়, তাহলে অবিশ্যি অনুসন্ধান করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু আমার মনে তা-ও একটা খটকা থেকে গেল। ঠিক করলুম যে শরৎ কুণ্ডু সম্বন্ধে খোঁজখবর চালিয়ে যেতে হবে। সত্যি বলতে কী, বিশ মিনিটের ছবিগুলো দেখে একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে কমিক অভিনেতা হিসেবে রতন রক্ষিতের চেয়ে শরৎ কুণ্ডু কোনো অংশে কম ছিলেন না।

টালিগঞ্জ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে জানলুম যে নরেশ সান্যাল বলে এক ভদ্রলোক বাঙলা ফিল্মের আদিযুগ নিয়ে রিসার্চ করছেন। ইচ্ছে একটা প্রামাণ্য বই লেখার। ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও জোগাড়

হল। তারপর এক রবিবার সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। ভদ্রলোক বললেন যে হ্যাঁ, শরৎ কুণ্ডু সম্পর্কে কিছু তথ্য তাঁর জানা আছে। বছর পাঁচেক আগে একবার অনেক খোঁজ করে তাঁর বাড়িতে গিয়ে শরৎ কুণ্ডুর একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সান্যাল মশাই। 'সে-বাড়ি কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলুম। 'গোয়াবাগানের এক বস্তিতে', বললেন সান্যাল মশাই। 'ভদ্রলোকের তখন চরম দুরবস্থা।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি সাইলেন্ট যুগের অভিনেতাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন নাকি?'

'খুব বেশি তো বেঁচে নেই', বললেন সান্যাল মশাই। 'যে-কজন রয়েছেন তাঁদের নিতে চেষ্টা করছি।'

আমি রতন রক্ষিতের কথা বলে দিলাম, আর বললাম যে তাঁর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি। ভদ্রলোক তাতে বেশ উৎসাহ প্রকাশ করলেন।

এরপর আমি আসল প্রশ্নে চলে গেলুম।

'টকি আসার পর কি শরৎ কুণ্ডু আর ছবিতে অভিনয় করেননি?'

'আজ্ঞে না', বললেন নরেশ সান্যাল। 'ভয়েস টেস্টেই ভদ্রলোক বাতিল হয়ে যান। তারপর যে কী করেছেন সেটা ভদ্রলোক খোলাখুলি বললেন না। মনে হল খুবই স্ট্রাগল গেছে, তাই নিজের কথা বেশি বলতে চান না। তবে সাইলেন্ট যুগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমি ভদ্রলোকের কাছে পেয়েছি।'

এরপর টালিগঞ্জ পাড়ার আরো কয়েকজন পুরনো ফিল্ম-কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানলুম যে টকি আসার পরেও বেশ কয়েকবছর শরৎ কুণ্ডু সিনেমা পাড়ায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সে-সময় ওঁর

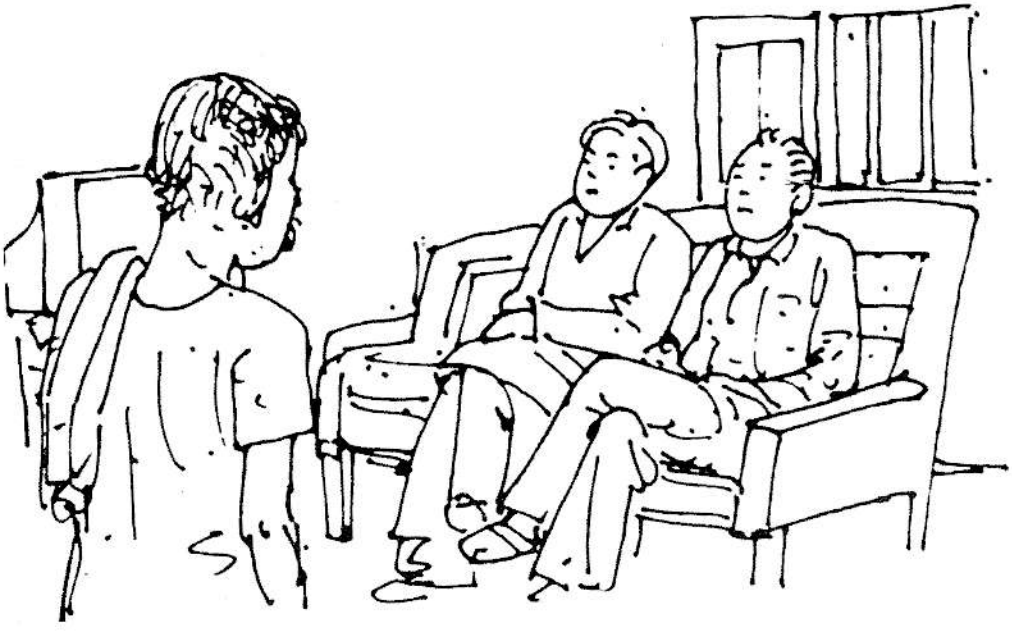

অবস্থা নাকি খুব খারাপ। টালিগঞ্জেরই মায়াপুরী স্টুডিওর ম্যানেজার ধীরেশ চন্দ'র সঙ্গে কথা বলে জানলুম যে শরৎ কুণ্ডু নাকি মাঝে মাঝে ছবিতে 'এক্সট্রা'র পার্ট করে পাঁচ-দশটাকা করে রোজগার করতেন। এইসব পার্টে অভিনেতা সাধারণত ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে; তার কথা বলার কোনো দরকার হয় না।

এই মায়াপুরী স্টুডিওতে দ্বারিক চক্রবর্তী বলে এক বৃদ্ধ প্রোডাকশন ম্যানেজার আমাকে বললেন, 'বেনটিংক স্ট্রিটে নটরাজ কেবিনে গিয়ে খোঁজ করুন। কয়েকবছর আগে পর্যন্ত সেখানে আমি শরৎ কুণ্ডুকে দেখেছি।'

শরৎ কুণ্ডুকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে টেনে বার করার জন্য নটরাজ কেবিনে গিয়ে হাজির হলুম। এর মধ্যে—এ-কথাটা বলা হয়নি—গোয়াবাগান বস্তিতে গিয়ে খোঁজ করে জেনেছি যে শরৎ কুণ্ডু আর সেখানে থাকেন না। এটাও বলা দরকার যে আমার উৎসাহের সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন রক্ষিত মশাই। ছোঁয়াচে ব্যারামের মতো তাঁরও এখন ধ্যানজ্ঞান চিন্তা হল শরৎ কুণ্ডু। তাঁদের দুজনের মধ্যে যে কত সৌহার্দ্য ছিল সেটা এখন মনে পড়েছে রক্ষিত মশাই-এর। যুবা বয়সের স্মৃতি, আর দুজনে তখন ডাকসাইটে জুটি। লোকে আসল ছবির কথা চিন্তাই করে না; ছবির আগে বিশু-শিবুর দু-রিলের কীর্তিকলাপই হল তাদের কাছে আসল। সেই জুটির একটি রয়েছে, একটি উধাও। এমন হলে কি চলে?

নটরাজ কেবিনের মালিক পুলিন দত্তকে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, 'শরৎদা বছর তিনেক আগ অবধি এখানে রেগুলারলি আসতেন। তারপর আর আসেননি।'

'তিনি কি কোনো কাজ-টাজ করতেন?'

'সে-কথা তাঁকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি; বললেন পুলিন দত্ত, "কিন্তু কোনো সোজা উত্তর কখনো পাইনি। কেবল বলতেন, 'পেটের দায়ে এমন কোনো কাজ নেই যা আমি করিনি।' তবে অভিনয় যে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেটা আমি জানি, আর সেই সঙ্গে ছবি দেখাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। টকিই যে তাঁর কাল হয়েছিল সেটা বোধহয় উনি কোনোদিন ভুলতে পারেননি।"

এর পরে আরো মাসখানেক নানান জায়গায় খোঁজ করেও শরৎ কুণ্ডুর কোনো পাত্তা পেলাম না। লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কথাটা রক্ষিত মশাইকে বলতে উনি সত্যিই মর্মাহত হলেন। বললেন, 'এমন একটা গুণী অভিনেতা, টকি এসে তার পসার মাটি করল, আর ক্রমে সে মানুষের মন থেকে মুছেই গেল। এখন আর তাকে কে চেনে? সে তো বেঁচে থেকেও প্রায় মরারই শামিল।'

শরৎ কুণ্ডুর ব্যাপারে আর কিছু করার নেই বলে আমি কাজের কথায় চলে গেলুম। ভদ্রলোককে একটা প্রশ্ন করার ছিল। বললুম, 'আপনার একটি সাক্ষাৎকার দিতে কোনো আপত্তি আছে কি?'

'কে চাইছে সাক্ষাৎকার?'

আমি নরেশ সান্যালের কথা বললুম। ভদ্রলোক সেদিনই সকালে ফোন করেছিলেন, আগামীকাল আসতে চান।

'বেশ তো, সকাল দশটায় আসুক। তবে বেশি সময় যেন না-নেয়।' নরেশ সান্যাল ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তাঁকে খবরটা জানিয়ে দিলুম।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রোজেকশন ঘরে রয়ে গেলুম বিশু-শিবুর কীর্তিকলাপ দেখার জন্য। বিশু-শিবুর ছবি হয়েছিল সবসুদ্ধ বেয়াল্লিশটা। তার মধ্যে সাঁইত্রিশটা আগেই জোগাড় হয়েছিল, বাকি পাঁচখানা আমার চেষ্টায় জোগাড় হয়েছে। আজ এই নতুন পাঁচখানা দেখতে দেখতে আবার মনে হল যে শরৎ কুণ্ডু সত্যিই বেশ জোরদার কমিক অভিনেতা ছিলেন। রক্ষিত মশাইকে দু-একবার চুক-চুক করতে

শুনলুম, তাতে বুঝলুম যে তিনি শরৎ কুণ্ডুর অন্তর্ধানের জন্য আক্ষেপ করছেন।

পরদিন সকালে আমি আসার দশ মিনিটের মধ্যেই নরেশ সান্যাল এসে পড়লেন। রক্ষিত মশাই তৈরিই ছিলেন; বললেন, 'আগে চা হোক, তারপর ইন্টারভিউ হবে।' সান্যাল মশাই কোনো আপত্তি করলেন না।

সকাল দশটায় রোজই রক্ষিত মশাই চা খান এবং সেই সঙ্গে আমিও খাই। এই সময়টাতেই আমাদের যা কিছু আলোচনা করবার তা হয়ে যায়, তারপর আমি বসে পড়ি কাজে, উনি চলে যান বিশ্রাম করতে। ক্যাটালগিং হয়ে যাবার পর আমি যে কাজটা করছি সেটা হল বিশু-শিবুর প্রত্যেকটি ছবির গল্পের সারাংশ তৈরি করা এবং তাতে কে কে অভিনয় করেছে, পরিচালক কে, ক্যামেরাম্যান কে—এইসবের একটা তালিকা তৈরি করা। একে বলে ফিল্মোগ্রাফি।

যাই হোক, আজ অতিথি এসেছেন বলে দেখি চায়ের সঙ্গে কচুরি এসেছে। ট্রে সমেত চা টেবিলে রাখা হতেই সান্যাল মশাই হঠাৎ একটা কথার মাঝখানে খেই হারিয়ে চুপ করে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি ভৃত্যের দিকে। ভৃত্য স্বয়ং খাস বেয়ারা লক্ষ্মীকান্ত।

আমার দৃষ্টিও চলে গেছে লক্ষ্মীকান্তের দিকে, এবং সেই সঙ্গে রক্ষিত মশাইয়েরও।

এই নাক, এই থুতনি, এই চওড়া কপাল, চোখের এই তীক্ষ্ণ চাহনি—এ কোথায় দেখেছি? এদ্দিন তো এর মুখের দিকে ভালো করে চাইনি। কেন চাইব? অকারণে বেয়ারার দিকে কে চেয়ে থাকে?

প্রায় তিনজনের মুখ দিয়েই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল একটা নাম—

'শরৎ কুণ্ডু!'

হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, শরৎ কুণ্ডু এখন হলেন তাঁর এককালের ফিল্মের জুটি রতন রক্ষিতের খাস বেয়ারা।

'কী ব্যাপার হে শরৎ?' এতক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলেন রতন রক্ষিত। 'তুমি আমার বাড়িতে—?'

শরৎ কুণ্ডুরও মুখে কথা ফুটতে সময় লাগল।

'কী আর করি', অবশেষে কপালের ঘাম মুছে বললেন ভদ্রলোক, 'নেহাৎ ইনি চিনলেন বলেই তো তোমরা চিনলে; এদ্দিন তো বুঝতে পারনি! আর চল্লিশ বছর বাদে দেখে বুঝবেই-বা কী করে!—একদিন মীরচান্দানির ওখানে চাকরির আশায় গিয়ে শুনি তুমি নাকি এসে আমাদের সেই আদ্যিকালের ছবির অনেকগুলো কপি কিনে নিয়ে গেছ নিজের সংগ্রহের জন্য। ভাবলাম তোমার এখানে এসে নিশ্চয়ই সেসব ছবি আবার দেখতে পাব। এমনিতে তো দেখার কোনো সুযোগ নেই। সেসব ছবি যে এখনো টিকে আছে তাই জানতাম না। তাই বেয়ারার চাকরির জন্য চলে এলাম তোমার কাছে। তুমি আমায় চিনলে না, চাকরিও হয়ে গেল। কুলিগিরিও করেছি, বেয়ারার কাজ তো তার কাছে স্বর্গ। আর ভালোও লাগছিল। সে-যুগের ছবিতে কথা না-বলে যে অভিনয় করেছি, সে তো নেহাৎ নিন্দের নয়। অবিশ্যি সেসব দেখার সুযোগ বোধহয় এখন বন্ধই হয়ে গেল!'

'কেন, বন্ধ হবে কেন?' রক্ষিত মশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। 'তুমি এখন থেকে হবে আমার ম্যানেজার! তারিণীর সঙ্গে এক ঘরে বসবে তুমি; আমার এখানেই থাকবে, সন্ধেবেলা একসঙ্গে বসে ছবি দেখব আমরা। এককালের জুটি ভেঙে গিয়েছিল দৈব-দুর্বিপাকে, আবার এখন থেকে জোড়া লেগে গেল। কী বল তারিণী?'

আমি দেখছি নরেশ স্যানালের দিকে। তাঁর মতো এমন হতভম্ব ভাব আমি অনেকদিন কারুর মুখে দেখিনি। তবে তাঁর পক্ষে নির্বাক-যুগের এই বিখ্যাত জুটির পুনর্মিলন যে একটা বড়রকম সাংবাদিক দাঁও হল সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

শার্লক হোমস-এর ফিরে আসা

বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক আর্থার কোনান ডয়েল। তাঁর কাহিনীগুলোর গোয়েন্দার নাম শার্লক হোমস। অসম্ভব তীক্ষ্ণবুদ্ধি শার্লক হোমসের। আশ্চর্য প্রতিভাবলে তিনি অপরাধীদের ধরে ফেলেন। পাঠকদের খুবই প্রিয় তিনি। কিন্তু একদিন হঠাৎ চমকে ওঠেন শার্লক হোমস-অনুরাগীরা। শার্লক হোমস নাকি আর নেই। না, না এ হতেই পারে না! সোচ্চার হলেন অসংখ্য হোমস-অনুরাগী। এ অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়! সত্যিই তাই। হোমস-অনুরাগীদের কাছে এ যে চরম আঘাত। হোমসের মৃত্যু তারা ভাবতেই পারে না।

কিন্তু মৃত্যু হল। কুখ্যাত প্রফেসর জেমস মরিয়াটির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু হল তাঁর। দুরন্ত জলপ্রপাত। বরফ-গলা সেই হিমশীতল পানিতে পড়ে তলিয়ে গেলেন দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা শার্লক হোমস। চূড়ান্ত সমস্যার সুরাহা করতে গিয়ে চরম পরিণতি ডেকে আনলেন দুর্দান্ত সাহসী আর প্রখর বুদ্ধির অধিকারী গোয়েন্দা হোমস। রাইকেনবাকের সেই ভয়ঙ্কর খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় শার্লক হোমস এবং শয়তান প্রফেসর জেমস মরিয়াটির মধ্যে। লড়াই করতে করতে পাহাড়ের খরস্রোতা জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে গেলেন হোমস। তলিয়ে গেলেন অতল পানির মাঝে। সেইসঙ্গে তলিয়ে গেল মরিয়াটিও। 'ফাইনাল প্রবলেম' গল্পে এইভাবে মৃত্যু হল গোয়েন্দাচূড়ামণি শার্লক হোমসের। না, তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি। ইচ্ছাকৃতভাবে ওইখানেই একটু ফাঁক রেখেছিলেন আর্থার কোনান ডয়েল। ফলে হোমসের অনুরাগীরা বিশ্বাসই করলেন না যে, হোমসের মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়াও তাঁদের কাছে হোমস অমর, অবিনশ্বর। তাঁকে মারতে পারেন না তার স্রষ্টাও। তাই তাঁর

অনুরাগীদের চাপে আর প্রকাশকদের অনুরোধে শার্লক হোমসকে আবার ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল। হোমসের স্রষ্টা ফেরালেন তাঁর সৃষ্টিকে। ফিরে এল সেই অমর চরিত্র 'দ্য রিটার্ন অব শার্লক হোমস'-এ। দেখা গেল আবার হোমসের উজ্জ্বল উপস্থিতি। বিশ্বসাহিত্যে এরকম দ্বিতীয় নজির আছে বলে মনে হয় না।

হোমস-পর্ব লিখতে লিখতে রিক্ত, বীতশ্রদ্ধ ক্লান্ত ডয়েল আর-একবার চেষ্টা করলেন শেষ করে দিতে হোমসের গোয়েন্দা-জীবন। তাই ১৯১৪ সালে তিনি লিখলেন 'হিজ লাস্ট বাউ'। এখানে তিনি দেখালেন, গোয়েন্দাগিরিতে বীতশ্রদ্ধ হোমস মৌমাছি চাষে মেতে উঠেছেন। গোয়েন্দাগিরি আর তাঁর ভালো লাগছে না। তাই 'লাস্ট বাউ'য়ে লেখক শার্লক হোমসের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিলেন, 'এই আমার শেষ তদন্ত অভিযান।' কিন্তু না, হল না। শেষ হবে কী করে হোমসের গোয়েন্দাগিরি? তাঁর লক্ষ-লক্ষ অনুরাগী গোয়েন্দাশ্রেষ্ঠ হোমসকে কি ছাড়তে পারেন কখনও! তা বোধহয় সম্ভবও নয়। আর হোমস পালিয়ে যাবেনই-বা কোথায়! যতই তিনি সরে পড়ার চেষ্টা করুন, তাঁকে ফিরে আসতেই হবে। নিস্তার নেই তাঁর স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলের। নিজের সৃষ্টির জালেই তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। হোমসের কাছ থেকে এত সহজে রেহাই নেই তাঁর। ইচ্ছে করলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়! খ্যাতির বিড়ম্বনা যাবে কোথায়! সুতরাং, আবার ফেরাতে হল শার্লক হোমসকে। ফিরে এলেন হোমস 'দ্য কেস বুক অব শার্লক হোমস'-এ। এ এক অদ্ভুত প্রত্যাবর্তন।

আসলে শার্লক হোমসের গোয়েন্দাকাহিনী লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন লেখক। পড়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, এধরনের লেখার জন্য প্রচুর চিন্তাভাবনার দরকার। একই ব্যাপারে কত নতুন চিন্তা মাথায় আসা সম্ভব! গোয়েন্দাকাহিনী লেখায় সময়ও লাগে অনেক বেশি। তাছাড়া লেখক নিজেও চেয়েছিলেন গোয়েন্দাকাহিনী ছেড়ে অন্যধরনের রচনা লিখতে। শুধু রহস্যসৃষ্টি আর রহস্যভেদ একসময় একঘেয়ে হয়ে ওঠে আর্থার কোনান ডয়েলের কাছে। কিন্তু হলে কী হবে! সরে আসার উপায় নেই। কেননা, আর্থার কোনান ডয়েল আর শার্লক হোমস দু-জনেই তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছেন। কাল্পনিক চরিত্র হয়ে উঠেছে রক্তমাংসের মানুষ। স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশি জনপ্রিয়। তাই স্রষ্টাকে বারবার ফিরে যেতে হয় সৃষ্টির কাছে। তাছাড়া উপায়ই-বা কী!

১৯৩০ সালে মৃত্যু হয় স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের। স্রষ্টার সঙ্গেই সৃষ্টিরও শেষ পরিণতি ঘটে। অর্থাৎ ওখানেই থেমে যায় তাঁর সৃষ্ট সব চরিত্রের জীবন। তারা আর এগোতে পারে না। কারণ, স্রষ্টা না থাকলে সৃষ্টির প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। শার্লক হোমস শেষ হননি। শেষ হয়নি তাঁর কীর্তিকলাপ আর রহস্যভেদের অভিযান। এগিয়ে এলেন নতুন প্রজন্মের নতুন স্রষ্টারা শার্লক হোমসের কাছে। একের-পর-এক তাঁরা লিখলেন হোমসের নতুন নতুন গোয়েন্দাকাহিনী। আবার ফিরে এলেন শার্লক হোমস। বিস্ময়, সত্যি বিস্ময়! শার্লক হোমস যে একটা কাল্পনিক চরিত্র—এ-কথা আজো অনেকে বিশ্বাস করে না। এখনও তাঁর নামে ২২১/বি, বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় সপ্তাহে গড়ে ৫০/৬০ খানা করে চিঠি আসে। সেসব চিঠি তো আর তাঁর সহকারী বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসনের হাতে পড়ে না। তবুও চিঠির উত্তর পান সকলেই। উত্তর দেওয়া হয় 'হোমস সোসাইটি'র পক্ষ থেকে। জানানো হয়, আমরা দুঃখিত। শার্লক হোম্‌স এখন আর গোয়েন্দগিরি করছেন না। তিনি তাঁর পেশা ছেড়ে মৌমাছি-পালনে ব্যস্ত। শার্লক হোমস ওই পত্রলেখকদের কাছে নিঃসন্দেহে এক জীবন্ত মানুষ। তিনি যে একটা কাল্পনিক চরিত্র—তা তারা মানতে চায় না। সত্যি এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—যেন এক মজার খেলা।

আর্থার কোনান ডয়েল

শার্লক হোমসকে নিয়ে গবেষণা চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। তাঁকে ঘিরে পৃথিবীর সেরা দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ডের মধ্যে গবেষণা-যুদ্ধ চলছে বহুবছর ধরে। দুই প্রতিষ্ঠানের দাবি—হোমস ছিলেন তাদের ছাত্র। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অক্সফোর্ডের দিকেই পাল্লা ভারী হয়। হোমস নাকি তাদেরই ছাত্র।

হোমসের জন্মসাল নিয়েও কিছুটা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। পরে মোটামুটিভাবে ১৮৮৭ সালে তাঁর জন্ম ধরে নেওয়া হয়েছে। ওই বছর 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটে বিশ্বের বিস্ময় শার্লক হোমসের। এক কাল্পনিক চরিত্রের যেন জীবন্ত আবির্ভাব। তখন ওই উপন্যাসে হোমসের বয়স ছিল তেত্রিশ। আর তারই জন্য অনেকে মনে করেন ১৮৫৪ সালে হোমসের জন্ম। তাই ১৯৫৪ আর ১৯৮৭ সালেই গোটা ব্রিটেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শার্লক হোমসের শতবর্ষপূর্তি সাড়ম্বরে পালিত হয়। একটা কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে সুশিক্ষিত ব্রিটিশদের এরকম পাগলামি বা মাতামাতি ভাবা যায়! তবুও মাতামাতি হয়েছিল। কারণ কল্পনার চরিত্র হয়ে উঠেছিল জীবন্ত। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের সৃষ্ট এই ধ্রুপদী চরিত্র রক্তমাংসের মানুষ হয়ে গিয়েছেন স্রষ্টার অনুপম লেখনীর জোরে। শার্লক হোমস অমর। যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে, ততদিন শার্লক হোমসও থাকবেন। শার্লক হোম্‌সের মৃত্যু ঘটিয়েও পার পাননি তাঁর স্রষ্টা। অনুরাগীদের চাপে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

কীভাবে হল বিদ্যুতের আবিষ্কার

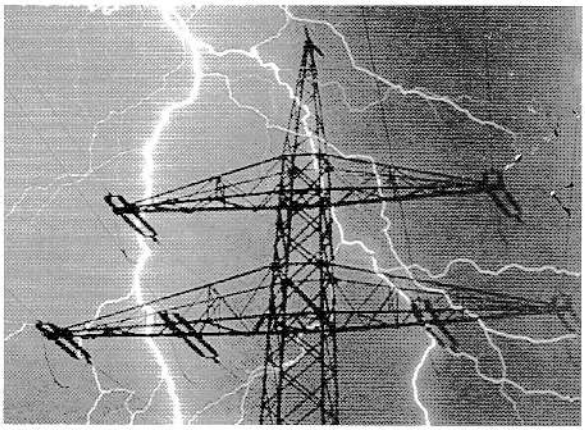

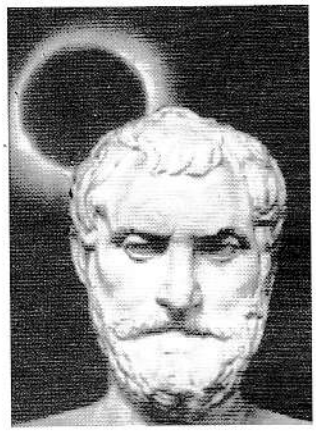

থ্যালিস

ধারণা করা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বছর পূর্বে অ্যাম্বার নামক পাইন গাছের একপ্রকার আঠা (যার অন্য নাম Electron) থেকে সর্বপ্রথম বিদ্যুতের আবিষ্কার হয়। আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর এটি একেবারেই নিষ্প্রাণ অবস্থায় ছিল। গ্রিক পণ্ডিত থ্যালিস (Thales) এটি আবিষ্কার, নামকরণ এবং কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করেন।

পাইন গাছের আঠা সংগ্রহ করার পর এটি মাটিতে রেখে পাথরের মতো শক্ত করলে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে এবং সেই পাথরের তৈরি গহনা থ্যালিসের আমলে বেশ প্রচলিত ছিল। থ্যালিস একদিন একটুকরো অ্যাম্বার পাথর নিয়ে তাঁর জামার হাতার সাথে ঘষে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, পাথরটিকে কোনো হালকা বস্তু—যেমন পাতা, ছোট কাগজ ইত্যাদির সংস্পর্শে আনলে এটি বস্তুগুলোকে আকর্ষণ করে এবং তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, কেবলমাত্র অ্যাম্বারই এটি করতে সক্ষম। তখন তিনি অ্যাম্বার বা Electron-এর নামানুসারে এর নাম দেন Electricity। এই আবিষ্কার প্রায় ২০০০ বছর পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি মজার ঘটনা হয়েই ছিল। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রানী এলিজাবেথের সময় Dr. S. W. Gilbart নামে এক বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, অ্যাম্বার ছাড়াও কিছু কিছু পদার্থ—যেমন: কাচ, হীরা, অভ্র, সালফার ইত্যাদি এ-ধর্ম প্রদর্শন করে। কিন্তু ঐ সময়ে বিদ্যুৎ বা Electricity সম্বন্ধে কারো ধারণা না-থাকায় অনেকে অনেক

মত প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন: অ্যাম্বার এবং অন্যান্য পদার্থ—যেমন কাচ, অভ্র, সালফার, হীরা ইত্যাদি ঘর্ষণের ফলে বাষ্পের সৃষ্টি হয়, যা পদার্থগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং অন্যসব হালকা বস্তুর সংস্পর্শে এলে এটি সেগুলোকে আকর্ষণ করে। আবার কেউ কেউ মনে করতেন: Electron এক প্রকার রশ্মি—যা বস্তুগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তা হালকা বস্তুর সংস্পর্শে আসলে রশ্মিগুলো সংকোচনের ফলে এটি ঐ হালকা বস্তুগুলোকে আকর্ষণ করে। এসব ধারণা কিছুদিন চলার পর ১৭৯১ সালে ইতালিয়ান চিকিৎসক Luisi Galvani (লুইজি গ্যালভানি) ব্যাঙের কাটা পা নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময় দেখেন যে, দুটি ভিন্ন ধাতু (লোহা, তামা) যদি ব্যাঙের পায়ে সংযুক্ত করা যায় তাহলে তার মাংশপেশি সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু কয়েকবছর পর স্বদেশীয় বিজ্ঞানী ভোল্টা (Volta) প্রমাণ করেন যে, ধাতু দুটি একত্র করলে যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাই মাংশপেশি সংকোচনে সাহায্য করে। তিনি 'ভোল্টারিক পাইল' নামে একটি ব্যাটারি তৈরি করে এটি প্রমাণ করার জন্যে বিদ্যুতের চাপের মাপকাঠি উদ্ভাবন করেন, ভোল্ট তাঁর নামানুসারেই করা হয়।

১৮২০ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী অ্যাঁদ্রে অ্যাম্পিয়ার (Andre Ampere) ভোল্টায়িক পাইল ব্যাটারির সাহায্যে চুম্বক ও বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে একটি পরীক্ষা করেন। তিনি কুণ্ডলী-পাকানো একটি দণ্ডে প্রবাহ চালিয়ে দেখেন যে, দণ্ডটি চুম্বকের মতো আচরণ করে এবং আকর্ষণ বা বিকর্ষণের পাশাপাশি উত্তর-দক্ষিণ মেরুর দিকে মুখ করে থাকে। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁর নামানুসারে প্রবাহের পরিমাণ মাপার এককের নাম হয় অ্যাম্পিয়ার (Ampere)। কয়েক বছর পর জার্মান বিজ্ঞানী জি.এস.ওম (G.S. Ohm) তারগুলোর প্রবাহের সময় বাধা দেয়ার প্রবণতা লক্ষ করেন। অর্থাৎ কোনো পরিবাহীর মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের সময় প্রবাহ বাধা পায়। তিনি এর নাম দেন রোধ বা রেজিস্ট্যান্স (Resistance), এবং এই বাধার পরিমাণ তাঁর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়। তিনি পরীক্ষা করে দেখেন যে, পরিবাহীর দৈর্ঘ্য বেশি হলে এর রোধের পরিমাণ বেশি হয়। তাঁর নামানুসারে কোনো পরিবাহীর মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের বাধার পরিমাণের একক ওম (Ohm) উদ্ভাবিত হয়। ১৭৫২ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) এক বিপজ্জনক পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, আকাশে যে বিজলি চমকায় তা-ও Electricity। তিনি ঘুড়ির ভেজা সুতোয় ঝলক (Spark) দ্বারা এ-পরীক্ষা করেন। পরে এ-পরীক্ষা করতে গিয়ে একজন প্রাণ হারান। ফ্রাঙ্কলিনই সর্বপ্রথম বিদ্যুতের দুটি প্রান্তের নেগেটিভ (Negative) এবং পজিটিভ (Positive) নামকরণ করেন।

১৮৩০ সালে বিজ্ঞানী ফ্যারাডে (Faraday) এবং জোসেফ হেনরি (Joseph Henry) এই বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করেন। এদের সাথে ছিলেন এডিসন (Edison), টেলসা (Telsa), ওয়েস্টিংহাউস (Westinghouse), মোর্স (Morse), বেল (Bell) এবং আরো অনেকে। বিজলি বাতি জ্বালানো এবং বিদ্যুৎ সৃষ্টি ও বিতরণের কাজ প্রথম করেন এডিসন (Edison)। পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ বা Alternating Current প্রথম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী টেলসা (Telsa)। বিজ্ঞানী বেল (Bell) এবং মোর্স (Morse) বিভিন্ন স্থানে তথ্য প্রেরণ বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

এঁদের সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই মার্কনি (Marconi) এবং অন্য বিজ্ঞানীরা তথ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিদ্যুতের ব্যবহার করার জন্য স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে আছেন।

আবদার রশীদ

রাজায় রাজায়

হোঁদল রাজা বললে ডেকে—
'বুদ্ধু রাজা, আজকে থেকে
করব না আর যুদ্ধবাজি
তুই যদি ভাই থাকিস রাজি!'
বুদ্ধু বলে—'বেশ তো হোঁদল
আজ থেকে আর নয়কো কোঁদল!
লাভটা কী বল্ লড়াই করে
লোক মেরে আর নিজেই মরে?'
হোঁদল বলে—'তার চেয়ে ভাই
সাগরপাড়ে চল না বেড়াই!
বালুর ঢিবি সাজিয়ে নিয়ে
খেলব দুজন ঘর বানিয়ে!'
বুদ্ধু বলে—'হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই,
সাগরপাড়ে চল তবে যাই—
বালুর ঢিবির ঘর বানাব,
দুইজনে বেশ বাদাম খাব!'

হোঁদল বলে—'বালুর ফাঁকে
মস্ত যদি কাঁকড়া থাকে?
হঠাৎ এসে কামড়ে দিলে
তখন যদি গজায় পিলে?'
বুদ্ধু বলে— 'কিংবা ধরো
ঢেউ এল এক মস্তবড়!
তখন যদি ঢেউয়ের সাথে
পটল তুলি দুইজনাতে?'
হোঁদল বলে—'তার চেয়ে ভাই
চল্ না খানিক যুদ্ধ লাগাই।'
বুদ্ধু বলে—'চল্ তবে তাই
যুদ্ধ করেই সময় কাটাই!'
ছুটল কামান, গোলাগুলি
লাগল ভীষণ যুদ্ধ—
নিপাত গেল হোঁদল রাজা
নিপাত রাজা বুদ্ধু!!

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পটকান যখন পটকাল

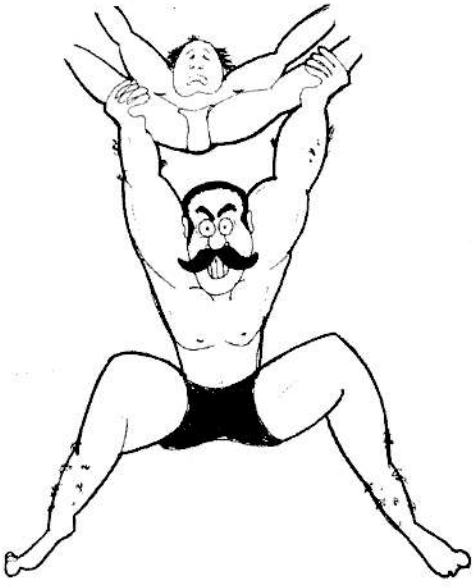

পটকান পালোয়ান ছিল শেরপুরের গর্ব। সে চেহারা না-দেখলে বিশ্বাস হয় না। ষাট ইঞ্চি বুক, আশি ইঞ্চি পেট, গরিলার মতো হাত-পা। শরীরটার কোথাও কোনো ভেজাল নেই। ভুঁড়িখানা ঢালের মতো শক্ত। পটকান পালোয়ান ভুঁড়ি দিয়ে বিস্তর কুস্তিগিরকে চেপে দমসম বের করে দিয়েছে।

তিন কুলে পটকান পালোয়ানের কেউ ছিল না। খুব অল্পবয়স থেকে ভীষণ খাই-খাই ছিল বলে খিটখিটে বাপ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই থেকে পটকান বিবাগী। অবশ্য সে বাপ এখন নেই, মা-ও গত হয়েছেন। পটকান তাই একা আনন্দে থাকে। সকালে দঙ্গলে গিয়ে তেল-মাটি মাখে, কসরৎ করে, মুগুর ভাঁজে। অসংখ্য ডন-বৈঠক দেয়। একসের ছোলা দিয়ে সকালে জল খায়। বেলা পড়লে রুটির পাহাড়, মাংসের পর্বত দিয়ে শেষ করে। বিকেলে একপুকুর দুধ আর এক গামলা বাদাম-বাটা খায়। রাতে ফের ঘিয়ের পরোটার বংশ লোপ করে চারটে মুরগি দিয়ে। এর ফাঁকে ফাঁকে এন্তার ডিম, সবজি, মিছরি, শরবত চালান হয়ে যায় তার অজান্তে। এসব ছোটখাটো খাবারগুলো সে খাওয়ার মধ্যে ধরে না।

পটকানের সঙ্গে সেবার লড়তে এল পাঞ্জাবের ভীম সিং, তারও বিশাল চেহারা। খাওয়াদাওয়াও প্রায় পটকানের সমান। জমিদারের কাছারিবাড়িতে লোক ভেঙে পড়ল কুস্তি দেখতে। পটকান ভীম সিংকে তিন মিনিটে চিত করে হাত ঝেড়ে বলল—ছোঃ। জমিদারের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলল—হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন। কিন্তু এসব চ্যাংড়া-প্যাংড়ার সঙ্গে লড়ার জন্য আমাকে ডাকা কেন?

সবাই ভাবে : ঠিক কথা। কিন্তু মুশকিল হল পটকান লড়বেই-বা কার সঙ্গে? দেশ-বিদেশ থেকে যারাই লড়তে আসে, সে যতবড় ওস্তাদই হোক, পটকান তিন মিনিটের বেশি সময় নেয় না। লড়াইয়ের শেষে আবার বলে—ছোঃ। জমিদারের দিকে চেয়ে অভিমানের সঙ্গে বলে—আনাড়িদের সঙ্গেই কি আমাকে বরাবর লড়তে হবে হুজুর?

জমিদারমশাই মহাসমস্যায় পড়ে বললেন—তা বাপু, তোমার যোগ্য কুস্তিগির পাই কোথায়? এঁরা যারা আসছেন লড়তে তাঁরাও সব নামডাকের লোক, কিন্তু তোমার কাছে কেউই ধোপে টেকে না দেখি—।

—তার চেয়ে হুজুর বন্দোবস্ত করুন, ওরা দুজন করে আসুক লড়তে, আমি একা।

তাই হল। লড়তে এল বচন পাণ্ডে আর হরি দোসাদ। দুজনকে দুবগলে নিয়ে হা-হা করে হেসে ওঠে পটকান। তারপর তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে—ছোঃ ছোঃ। বলে জমিদারবাবুর দিকে তাকায়—হুজুর, দেশে কি আর মানুষ পাওয়া গেল না!

জমিদারমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন—তাই তো! এরা তো দেখছি তেমন কিছু নয়। অথচ শুনেছিলাম এরা কিলিয়ে পাথর ভাঙে, পাঁচমণ ওজন তোলে এক-এক হাতে, হাতি বুকে নেয়। সেসব তো গল্পকথা নয় বাপু, নিজের চোখে দেখেই এনেছি। আচ্ছা দেখি তোমার উপযুক্ত যদি কাউকে পাই।

এরপর তিন পালোয়ান লড়তে এল একসঙ্গে। ভীষণ ভীষণ তাদের চেহারা। গোল্লা গোল্লা করে চায় আর দাঁত কিড়মিড় করে। তা সেই তিনজন যখন লড়তে নামল তখন বেলুন চুপসে আমসত্ত্ব হয়ে গেল ফের। তিনটেকে নিয়ে খানিক লোফালুফি করল পটকান, চেঁচিয়ে জমিদারমশাইকে বলল—হুজুর যখন বলবেন তখনই তিনজনকে মাটিতে ফেলব।

ফেললও তাই, তিনবার ছোঃ দিয়ে জমিদারমশাইয়ের দিকে তাকাতেই জমিদারমশাই বেজায় ভয়-পাওয়া মুখ করে মিনমিন করলেন—তাই তো বাপু, এ তো বড় মুশকিলে ফেললে তুমি।

খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে পটকান বলল—এরকম চললে আমাকে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে দেখছি।

এই কথায় সবাই ভারি চিন্তিত হয়ে পড়ে। জমিদারমশাইয়ের একেই হার্টের ব্যামো, বাঁ পায়ে বাতব্যাধি, রক্তচাপের রোগ, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, পেটটা ভুটভাট করে সবসময়ে। তার ওপর পটকানের এই কথা শুনে তিনি প্রায় অন্নজল ছাড়েন আর কী! শেরপুরের গর্ব পটকান পালোয়ান সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

শেরপুরের লোকেরা ভীষণ বিমর্ষ। পটকানের সঙ্গে কেউ লড়ে পারে না সে ঠিক, কিন্তু তা বলে একটু লড়াই হবে তো, কিছুক্ষণ কোস্তাকুস্তি করে তবে চিত হবি। এ যেন সব হেরোর দল মাটি নেয়ার জন্যই আসে। এইসব হেরোর দলকে শেরপুরের লোকেরা হারু বলে উল্লেখ করে। জেতে বলে পটকানের নাম তারা দিয়েছে জিতেন। সবাই বলাবলি করে—জিতেনের সঙ্গে এবার কোন হারু লড়তে আসছে রে?

তা এল এবার। সারাদেশে লোক পাঠিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে মানুষের চেহারার দশজন দানবকে ধরে আনা হল। তিনদিনে তারা শেরপুরের সব খাবার খেয়ে ফেলল প্রায়। চারদিকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। দশ পালোয়ান বাঘের মতো গর-র গর-র আওয়াজ ছাড়ে, মানুষের ভাষায় কথাই বলে না। দিনমানে তারা নিজেদের সামলাবার জন্য নিজেরাই নিজেদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। ভীষণ রাগী, কখন কার ঘাড় মটকে দিয়ে জেল হয়। তবু শেষরক্ষা হয় না বুঝি। তাদের যে-ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল তা মজবুত পাকা ঘর। তবু দশ পালোয়ানের নড়াচড়ায় মেঝে দেবে গেল, দেয়াল ভেঙে

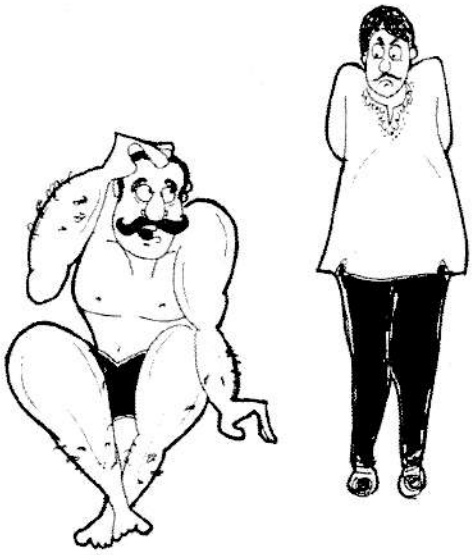

গেল একধারের। হাঁকডাকে চারধারে ভূমিকম্প হল কয়েকবার।

লড়াইয়ের দিন চারটে রথযাত্রার ভিড় ভেঙে পড়ল কাছারিবাড়িতে। হুলুস্থুল কাণ্ড। দশ দানব দঙ্গলের মাটি কাঁপিয়ে এসে ঢুকল একসঙ্গে। দশজনের সঙ্গে একা লড়বে পটকান।

চোখে দেখেও কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না ব্যাপারটা। পটকান দঙ্গলে ঢুকে গুরুপ্রণামটা সেরে নিল কেবল। তারপরই দেখা গেল সে এক-একটা দানবকে ধরে পটাপট ভিড়ের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে, ঠিক যেমন গদাই মালি বাগানের আগাছা তুলে ছুড়ে দেয় বেড়ার বাইরে। দু-মিনিটে দশ পালোয়ান সাবাড় করে ঠিক দশবার ছোঃ দিল পটকান। তারপর ভীষণ অভিমানের চোখে তাকাল জমিদার মশাইয়ের দিকে। বলল : হুজুর—

রোগা-ভোগা জমিদারমশাইয়ের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে অপমানে। তিনি কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন।

পটকান বলল—হুজুর, এরা সব কারা এসেছিল হুজুর? এসব রোগা-দুবলা লোক কোত্থেকে আনলেন?

হঠাৎ জমিদারমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—চোপরাও বেয়াদব! রোগা-দুবলা লোক? অ্যাঁ! রোগা-দুবলা লোক এরা সব!

বলতে বলতে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জমিদারমশাই বাতব্যাধির কথা ভুলে, হার্টের ব্যামোর কথা বিস্মরণ হয়ে, রক্তচাপকে পরোয়া না-করে, পেটের ভুটভাটকে উপেক্ষা করে একলাফে এগিয়ে এলেন দঙ্গলের মাটির উপর।

কিছুতেই তোমার শিক্ষা হয় না, অ্যাঁ... বলতে বলতে জমিদারমশাই পটকানের ঘাড়টা ধরে এক ঝটকায় তুলে ফেললেন মাথার উপরে। তারপর সে কী বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলেন, না-দেখলে বিশ্বাস হয় না।

পটকান প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে তখন—বাবা গো! গেলাম গো! মেরে ফেললে গো! কে কোথায় আছ ছুটে এস!

কে শোনে কার কথা! কয়েকবার আশ্বাসে ঘুরিয়ে জমিদারমশাই পটকানকে এক বেদম আছাড় মারলেন। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন—ছোঃ!

রাক্ষুসে প্রজাপতি

'প্রজাপতি' শব্দটা শুনলেই আমাদের মনে চমৎকার দুই ডানাঅলা একটি প্রাণীর ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু এই প্রজাপতিরই এক জাতভাই আছে—যারা শুধু ভয়ঙ্করই না, এত রাক্ষুসে যে, হিংস্র হয়ে উঠলে নিজেরাই নিজেদের মাংস খায়। এদের শরীরে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত পদার্থ—যার নাম সায়ানাইড। সায়ানাইড এতই বিষাক্ত যে, একটি আলপিনের মাথা সায়ানাইডে চুবিয়ে যদি কোনো মানুষের গায়ে একটি আঁচড় দেয়া যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষটি মারা যাবে। ভয়ঙ্কর এই প্রজাপতির নাম হেলিকনিয়াস। এদের সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। এই জাতের কিছু প্রজাপতি বনে-জঙ্গলেও দেখা যায়। বিশেষ করে কোস্টারিকায় এদের দেখা মেলে প্রচুর। সেখানে ওরা ভয়াল কালো লম্বা ডানা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওদের ওই লম্বা ডানার কারণে অনেক প্রাণিবিজ্ঞানী ওদের নাম দিয়েছেন 'লং উইং'। প্রাণিবিজ্ঞানী টমাস বেল্ট প্রথম এদের সন্ধান পান। প্রথম যখন তিনি এ প্রজাপতিগুলোর সন্ধান পান তখন একটি আশ্চর্য ঘটনা দেখেছিলেন। একটি রক্তচোষা বাদুড়কে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল ওই প্রজাপতি। বাদুড়টি যখন ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন প্রজাপতিটি বাদুড়টিকে আক্রমণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই মেরে ফেলল। তারপর আরও অনেক হেলিকনিয়াস প্রজাপতির দল এসে জুটল সেখানে। মৃত বাদুড়টিকে বেশ ধীরেসুস্থেই শেষ করে ফেলল রাক্ষুসে প্রজাপতির দল। হেলিকনিয়াস প্রজাপতির দেহেই শুধু নয়, ওদের ডিম এবং শুককীটেও মারাত্মক পরিমাণে সায়ানাইড থাকে। প্রশ্নটা হচ্ছে, ওদের শরীরে এই বিষাক্ত সায়ানাইডের উপস্থিতির রহস্যটা কী? কারণটা বের করেছেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের গবেষক ডারলিন মারাওস্কি। তিনি কোস্টারিকার কর্কোডাভো ন্যাশনাল পার্কের রেইন ফরেস্টে এই প্রজাপতির জীবনযাপন গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন, এরা 'প্যাশন ভাইন' নামক অত্যন্ত বিষাক্ত একটি গাছে ডিম পাড়ে, ওই গাছের পাতা খায়। এই উদ্ভিদে থাকে সেই মারাত্মক ভয়ঙ্কর বিষ সায়ানাইড। এদের জীবনটাই বলতে গেলে কাটে এই প্যাশন ভাইন গাছে। এদের শুককীট-মুককীট সবাই এই গাছের ডালপাতা খেয়ে বড় হয়। আর বিষে বিষে ভরে ওঠে এদের রঙচঙে শরীর। খিদে পেলে এরা আপন বাচ্চাকে পর্যন্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। খিদের মাত্রা খুব বেশি হলে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যারা হেরে যায় তাদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় জয়ী হেলিকনিয়াসরা। সাধারণ প্রজাপতির চেয়ে এরা পঁচিশগুণ বেশি বাঁচে। এদের বুদ্ধিও মারাত্মক। অন্যান্য প্রজাপতির তুলনায় এদের মাথায় মগজের পরিমাণও বেশি। সাধারণ প্রজাপতি শুধু ফুলের মধু খায়। এরা শুধু মধুই না, ফুলের পরাগগুলো পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। সবশেষে এদের রাক্ষুসেপনার আর একটি মজার কথা হচ্ছে, এদের শুককীটগুলো ছোটবেলাতেই এত খাই-খাই স্বভাবের হয় যে, খোলসের ভেতর একে অন্যকে খেয়ে ফেলে। এদের এই রাক্ষুসেপনার রহস্য আজও তিমিরেই রয়ে গেছে।

ঘড়ি

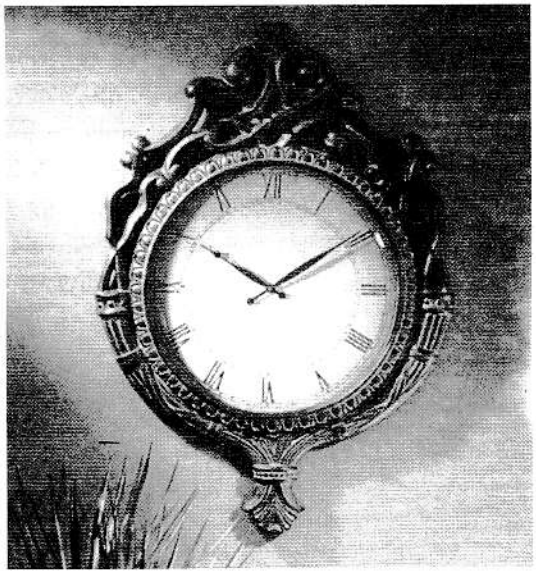

সময় প্রবহমান ধারা। এর শুরু নেই, শেষও নেই। কেবল দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কর্ম সুসম্পন্ন করতে, কোন ঘটনা কত আগে আর কোনটি কত পরে, তা জানতে আমাদের সময়কে ভাগ করে নিতে হয়।

অনেক আগে থেকেই মানুষ দিন ও রাতকে বিভিন্ন সময়ে ভাগ করে নেয়ার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। তারই প্রথম পদক্ষেপ সূর্য-ঘড়ি। দিনের বেলা সূর্যের আলো কোনো বস্তুতে পড়লে এর বিপরীতে ছায়া দেখা যায়। এই ছায়া দেখে মানুষ সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হল। সমতল ভূমির মাঝখানে একটি লম্বা কাঠি পুঁতে রাখা হয়। তার উপর সূর্যরশ্মি পড়ে মাটিতে ছায়া ফেলে। মাটিতে নানা দাগ কাটা থাকে। ছায়া যখন যে-দাগ স্পর্শ করে তখন সময় তত হয়। কিন্তু মেঘলা দিনে বা রাত্রিতে এ ঘড়ি কাজ করত না। তাই তৈরি করা হল বালি-ঘড়ি ও জল-ঘড়ি। এগুলো দিয়ে একটি ফুটো পাত্রতে বালি বা জল রাখলে তা ফুটো দিয়ে যতক্ষণে পড়ে যায়, তা দেখে সময় ঠিক করা হত। রাজা আলফ্রেড মোমবাতি দিয়ে এমনই ঘড়ি তৈরি করেন। এগুলো পুড়তে কত সময় লাগে তা দেখে তিনি মোমবাতির গায়ে দাগ কেটে সময়ের হিসাব করতেন। পৃথিবীর প্রথম নিয়ন্ত্রিত ঘড়িটি তৈরি করেন হল্যান্ডের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদ্যাবিদ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনজ (Christian Hygens ১৬২৯-১৬৯৫), সময়টা ছিল ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ। এ-ঘড়িতে চাবি দিলে তা আপনা-আপনি চলতে পারত। এ-ঘড়ির ভিতরে স্প্রিং-এর প্যাঁচ থাকে। আস্তে আস্তে কাঁটা যতই ঘোরে প্যাঁচও তত খুলতে থাকে। তাই ঘড়িতে চাবি দিতে হয়।

উল্লেখ্য যে, ভার ও স্প্রিংয়ের সাহায্যে কীভাবে ঘড়ি চালানো যায় এবং কাঁটা কীভাবে ঘোরে ও সময় নির্দেশ করে তা আবিষ্কার করেছেন বিখ্যাত গ্রিকবিজ্ঞানী আর্কিমিডিস। আর ঘড়ির পেন্ডুলামের সাহায্যে কিভাবে সময় বিভাগ করা যায় তা আবিষ্কার করেন স্পেনের করডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ১০০০ খ্রিস্টাব্দে। আজ পর্যন্ত ঘড়ির নানা উন্নতি সাধিত হয়েছে। এর নানা আকার তৈরি হয়েছে। আজ বিদ্যুতের তরঙ্গের সাহায্যে ঘরে বসানো আলাদা আলাদা ঘড়ি একসঙ্গে চালানো হয়। সব ঘড়িই সাধারণত এক নিয়মে চলে। ঘড়ির মধ্যে ছোট-বড় নানারকমের অনেক চাকা রয়েছে। চাকাগুলো দাঁতওয়ালা এবং একে অপরের সাথে সেট করা। ফলে একটা অন্যটাকে ঘুরতে প্রভাবিত করে। একটা চাকা ষাট সেকেন্ডে একবার ঘোরে এবং অন্যটা ষাট মিনিটে একবার ঘোরে। তার ফলে সেই চাকার সঙ্গে লাগানো কাঁটা ঘড়ির উপরে ডায়ালে আঁকা সেকেন্ড ও মিনিটের ঘর পার হয়। স্প্রিং, দোলক বা পেন্ডুলাম ও নিয়ন্ত্রণযন্ত্র থাকায় ঘড়ির কাজে ভুল হলে তা শুধরে দেয়া সম্ভব হয়।

আজ কাঁটা নেই, এমন ঘড়িও দেখতে পাওয়া যায় যা কোয়ার্টজ নামে পরিচিত। এখানে সময় গণিতের সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

হাস্যকৌতুক

প্রথম উকিল চিৎকার করে বললেন: 'আপনি একজন মাথামোটা লোক।'

দ্বিতীয় উকিল গলা আরও চড়িয়ে বললেন : 'আপনিও মাথামোটা এবং মিথ্যুক।'

প্রথম উকিল আবার চেঁচিয়ে উঠলেন: 'আপনি একটা ভণ্ড।' দ্বিতীয় উকিল প্রায় তেড়ে গেলেন প্রথম উকিলের দিকে: 'আপনি একটি শয়তান।'

বিচারক বললেন : 'অনুমতি দিলাম, যতক্ষণ-না আপনাদের সঠিক চরিত্র বুঝতে পারা যায়, ততক্ষণ ঝগড়া চালিয়ে যান।'

* * *

সাহেব তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন, রহমত—'তোর গিন্নীমাকে আজ দোপেঁয়াজা রান্না করতে বলবি।'

চাকরটা বেশ বুদ্ধিমান। সে ভাবল, দোপেঁয়াজার কথা বললে তার একটা খাবে সাহেব আর অন্যটা খাবে গিন্নীমা, তার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না। তাই বাড়িতে গিয়ে সে বুদ্ধি করে বলল, 'গিন্নীমা সাহেব আইজকে তিনপেঁয়াজা রাঁধতে কইছে।'

একথা শুনে তো গিন্নীমার আক্কেল গুড়ুম।

আবুল মনসুর

আঁকার আগে দেখা

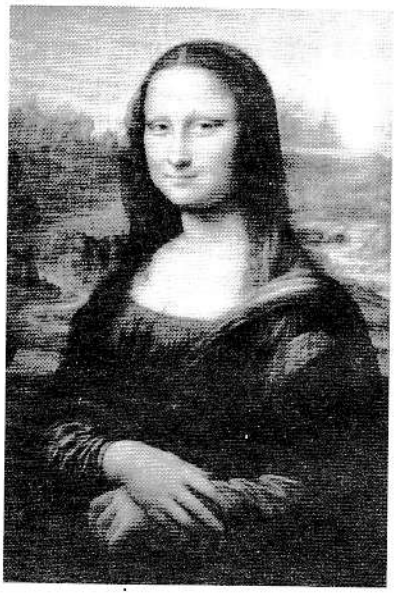

ভিঞ্চির *মোনালিসা*

সুলতানের *প্রথম বৃক্ষরোপণ*

মনে কর তুমি কাগজ-রং সাজিয়ে তুলি বাগিয়ে বসলে ছবি আঁকতে। কী আঁকা যায়?—পালতোলা নৌকা? ঘরবাড়ি গাছ, গাড়ি? ও অনেক এঁকেছি। প্রজাপতি, রংধনু? এসব হয়ে গেছে। বসার ঘরের দেয়ালে পুরনো একটা মস্ত ছবি আছে দাদার, ওরকম আঁকতে পারলে বেশ হয়। তিনুটা বড্ড বেশি দুষ্টু। এক মিনিট যদি একটু চুপচাপ থাকে। বিকেলে আইসক্রিমের লোভ দেখিয়ে অনেক কষ্টে রাজি করানো গেছে। ছবি দেখে তিনু তো রেগেমেগে অস্থির। বলে কিনা, ওটা রবিনদের পোষা বানরের মতো হয়েছে। তুমি মুখে বললে বটে, যা, যা, তোর চেহারা আবার ওর চেয়ে ভালো কীসে!

কিন্তু মনে মনে ভাবলে, দাদার ওই ছবিটার মতো হয় না কেন? যেন মনে হয় সত্যি সত্যি লোকটা বসে আছে। ছুঁয়ে দিলে বুঝি চমকে উঠবে। অমনটি আঁকতে হলে কি জাদু জানতে হবে? মোটেই না। যে-লোক জাদু দেখিয়ে বেড়ায় সে-ও কিন্তু মোটেই জাদু জানে না! তার বদলে কিছু কায়দা সে রপ্ত করে নেয়, দিনের-পর-দিন কষ্ট করে শিখে নেয়, তার সঙ্গে সে নিজে কিছু মেশায়। দুটো মিলিয়ে হয়ে যায় জাদু! তেমনি এক 'জাদুকর' তোমার বসার ঘরের দাদার ছবিটা এঁকেছিল। তাকেও কষ্ট করে কিছু ব্যাপার শিখে নিতে হয়েছিল—যাকে আমরা বলতে পারি ছবির ব্যাকরণ। লিখতে শেখার জন্য যেমন ভাষার ব্যাকরণ তেমনই আঁকতে শেখার জন্য ছবির ব্যাকরণ। কিন্তু ছবির ব্যাকরণের গোড়াতেই রয়েছে ঠিকভাবে দেখতে শেখার পাঠ।

শুধু চোখে দেখা নয়। তুমি বলবে, বারে! চোখ যখন আছে তখন সবই তো ঠিক ঠিকই দেখি। দেখতেও আবার শিখতে হয় নাকি? আমি বলব, আলবৎ হয়। অনেকেই চোখ থাকলেও ঠিকমতো দেখে না। রাস্তার উল্টোদিক থেকে স্কুলের হেডস্যারকে আসতে দেখলে তুমি অন্যদিকে তাকাতে তাকাতে চলে যাও। তুমি তো দেখেও না-দেখার ভান করলে, অনেকে কিন্তু সত্যি সত্যি দেখেও দেখে না। ছোটবেলায় স্কুলে আমাদের খুব মজার একটা খেলা ছিল। সবাই লাইন বেঁধে দাঁড়ালে একটা বাক্স-ভর্তি আলপিন, সুঁই, বোতাম, সুতো, চিরুনি, ছুরি, কলম, পেন্সিল, রাবার—এরকম আরো সব নানান জিনিস চোখের সামনে ধরা হত। একেকজনের সামনে একেক মিনিট। এরপর মন থেকে লেখ, তার মানে যে সব পেরেছে সে শুধুই চোখ দিয়ে দেখেনি, মন দিয়েও দেখেছে। অনেক সময়ই আমরা, অনেক সময় কেন, প্রায় সময়ই শুধু খালিচোখেই দেখি। তার সঙ্গে মনের চশমাটা যোগ করি না। মন দিয়ে দেখা মানে বুদ্ধি দিয়ে দেখা, হৃদয় দিয়ে দেখা। এক-দঙ্গল লালপিঁপড়ের কর্মকাণ্ড দেখে দেখে তুমি সারাদিন কাটিয়ে দিতে পার, ছাদে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের পেঁজাতুলোর মতো মেঘের মধ্যে তুমি মনে মনে কত মূর্তি কল্পনা করতে পার। অধিকাংশ বড়দের কাছে এগুলো কোনো দেখবার ব্যাপারই নয়। সেজন্য আমরা বড়রা প্রায়ই চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাই না। ছোটদের দেখবার আকাঙ্ক্ষা বড়দের চেয়ে বেশি। শিল্পী হতে হলে এই দেখার চোখটাকেই তৈরি করতে হবে। করতে হবে ছোটবেলা থেকেই। আলোছায়া বিভিন্ন বস্তুর ওপর কীভাবে কাজ করে, দূরে গেলে একটা জিনিসকে কেমন দেখায়, কাছে এলে কেমন, বেলা বাড়তে থাকলে আকাশ, গাছপালা কিভাবে ধীরে ধীরে রং পাল্টাতে থাকে, বেলা কমতে থাকলে কীভাবে সব বদলায়, আলোতে কেমন রং, ছায়াতে কেমন, জলের মধ্যে প্রতিবিম্ব কেমন, প্রতিটি মানুষের, জীবজন্তুর স্বভাব-চরিত্র কেমন আলাদা আলাদা রকমের—এসব দেখতে শেখা চাই। রাস্তার মোড়ের গাছটি বর্ষায়, হেমন্তে, বসন্তে কত ভিন্ন ভিন্ন সাজ নেয় খেয়াল করে দেখেছ কি? ছবি আঁকতে বসার আগে আমাদের চারপাশের সবকিছুকে খুব মন দিয়ে দেখে নিতে হবে।

আমরা মোটেই ঠিক ঠিক দেখি না। এবার তুমি নিশ্চয় রেগে যাচ্ছ। ঠিক ঠিক দেখি না মানে কী? তার মানে আমরা একটা জিনিস যেমনটা আছে তেমন দেখি না—লালকে কালো দেখি, হলুদকে সবুজ? সোজাকে কি উল্টো দেখি? অনেকটা কিন্তু তাই। বহুকিছুই যেমনটি আছে আমরা তেমনটি দেখি না! বাস্তবের অনেক ব্যাপারকেই আমরা আসলের চেয়ে অন্যভাবে দেখি। মনে কর লম্বা একটা সোজা রাস্তার এক মাথায় তুমি দাঁড়িয়ে আছ। দুপাশে সারি সারি বিজলিবাতির লাইটপোস্ট। তুমি দেখছ লাইটপোস্টগুলো যত দূরে যাচ্ছে ততই আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে এত্তটুকুন হয়ে গেছে। এক্কেবারে শেষেরটাকে দেখাচ্ছে একটা ম্যাচের কাঠির মতো। এইবার একটা ফিতে নিয়ে সবগুলোকে মেপে দেখ, সবাই সমান। তাহলে আমরা ঠিক ঠিক দেখি কেমন করে? তুমি বলবে, বারে, দূরে গেছে বলেই তো ওটা ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু দূরে গেলে সব জিনিসকেই ছোট দেখায়, ব্যাপারটা আমরা জানি বলেই এতে সহজে বুঝতে পারছি, না-হলে এত বড় লাইটপোস্টটা অইটুকু ম্যাচের কাঠির সমান কেমন করে দেখলাম ভাবতে ভাবতে ঘাম ছুটে যেত। এভাবে একটা বইকে শুধু পাশ থেকে দেখলে দেখতে পাই আমার স্কুলের স্কেলটির মতো, একটি লাঠিকে ডগার দিক থেকে দেখলে ছোট্ট একটা বলের মতো দেখব, তার দৈর্ঘ্যের কিছুই দেখতে পাব না। আমাদের দেখার এই ভুল সম্পর্কে আমরা অভ্যস্ত বলেই এগুলো আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। এই যে দেখার মধ্যে নানারকম গোলমাল ঘটে যায়, ছবি আঁকতে গেলে কিন্তু এগুলো ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। পাহাড়টাতে চড়ে দেখলাম ঘন সবুজ ঘাসে ভরা, যখন

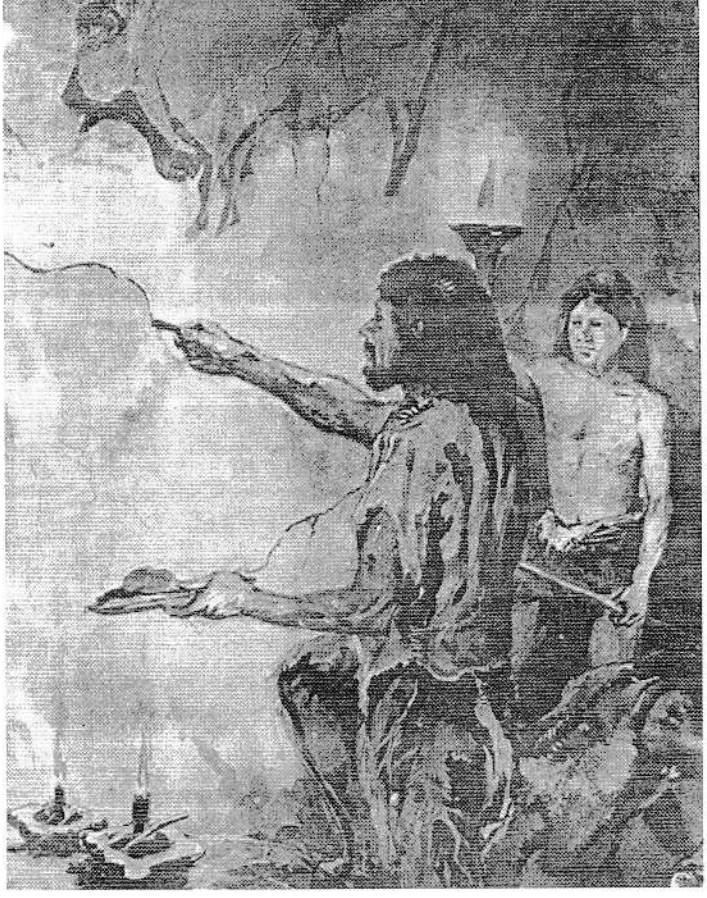

ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি, পেছনে ফিরে দেখি গাঢ় নীল দেখাচ্ছে। পাহাড়টা আসলে মোটেই নীল নয়, সবুজও নয়। কিন্তু! সে কী কথা! তুমি বলবে, নিজে চড়ে দেখলাম কলাপাতার মতো সবুজ ঘাসে আগাগোড়া ঢাকা, আপনি বলছেন সবুজ নয়! কারণ সবুজ বলে কোনো আসল রং নেই। সবুজ হচ্ছে অন্য দুটি রং মিশে তৈরি। তাহলে দেখা যাচ্ছে রংয়ের ব্যাপারটাও আমাদের একটু জেনে নিতে হয়।

আসল রং আর নকল রং-এর কথা

সবুজ-এর পেছনে তাহলে লুকিয়ে আছে অন্য দুটি রং। ওরা হচ্ছে হলুদ আর নীল। ওদের পিছনে কারা? না ওদের পেছনে আর কেউ নেই। ওরা একেবারে পাক্কা খাঁটি রং। শুনলে অবাক হবে, এরকম আসল রং আছে সারা দুনিয়াতে মাত্র তিনটে। হলুদ আর নীল তো বটেই, তাছাড়া শুধু লাল! তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, তোমার আশেপাশে যে হাজারো রং ভিড় করে আছে তার পনেরো আনাই ফাঁকি, নকল—কমলাই বলো, বেগুনি বলো, ধূসর বলো, পাঁশুটে, ফিরোজা, আসমানি, যা-ই বলো। সবই ওই লাল নীল হলুদকে নানাভাবে গুলিয়েই তৈরি। লাল আর নীল মিলে বেগুনি। লাল-হলুদে—কমলা—এইভাবে। শাদা আর কালো সম্পর্কে তোমার মনে নিশ্চয় এতক্ষণে খটকা জেগেছে। তাহলে এদের কথাও কিছুটা জেনে রাখ—শাদা হচ্ছে সব রং-এর সমাহার, অর্থাৎ যেখানে সব রং উপস্থিত; আর কালো হচ্ছে যেখানে কোনো রং-ই নেই, অর্থাৎ সব রং অনুপস্থিত।

হাসিখুশি আর গোমড়া রং

রংদের আবার নানান ধরনের রকমফের আছে। বহুরকমের দলাদলি। স্বভাব-চরিত্রের কথাটাই আজকে শুধু আমরা আলাপ করব। তোমাদের যেমন নানানজনের নানান স্বভাব—কেউ বেশিরকম দুষ্টুগোছের, কেউ শান্তমতো, কেউ বা শুধু ছিঁচকাঁদুনে, তেমনি রংদের হাসিখুশি আর গোমড়ামুখো—এই দুইভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। ছবির ভাষায় এদের বলা হয়ে থাকে উষ্ণ রং (Warm color) আর শীতল রং (Cool color)। উষ্ণ রংগুলো বেশ উজ্জ্বল, হাসিখুশি, আর শীতল রং মৃদু, ছায়া-ছায়া, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। উষ্ণ রংগুলো সবসময়ই উজ্জ্বল এবং বেশিরকম চোখে পড়ে আর একটা খুশি আর ফূর্তির ভাব নিয়ে আসে। লাল, কমলা, হলুদ, হালকা বেগুনি, কলাপাতা সবুজ—এরা সব অমনি উষ্ণ রং। মন খারাপ করা রং হল কালো, ধূসর, গাঢ় নীল, খয়েরি—এইসব। এদের দেখলে মনটা কেমন ভার-ভার মনে হয় না? ছবি আঁকতে গেলে রং-এর এইসব চরিত্রগুলো মনে রাখতে হবে। না-হলে তোমার ছবিতে যে-ভাবটা প্রকাশ করতে চাও সেটি কখনো ঠিকমতো ফুটবে না। তুমি বর্ষাদিনের কান্না-কান্না ভেজা-ভেজা একটা ছবি আঁকতে চাও, সেখানে লাল-হলুদ লাগালে ওই ভাবটা কিছুতেই ধরা যাবে না।

তাহলে ছবি আঁকতে গেলে আগে দেখতে শিখতে হবে আমাদের। আমাদের দেখতে শিখতে হবে জিনিসপত্রের আকার-প্রকার এবং সেগুলোর রং-এর স্বভাব-চরিত্র। আমরা আমাদের দৃষ্টিতে অনেককিছুই ভুলভাবে দেখি, অনেককিছুই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, এ-সবকিছুকেই ঠিক-ঠিকমতো দেখা এবং বোঝার দৃষ্টি আগে অর্জন করতে হবে। তবেই আমরা হতে পারব সত্যিকার দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পী।

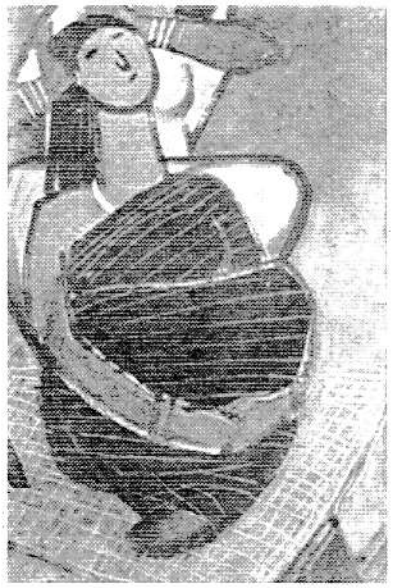

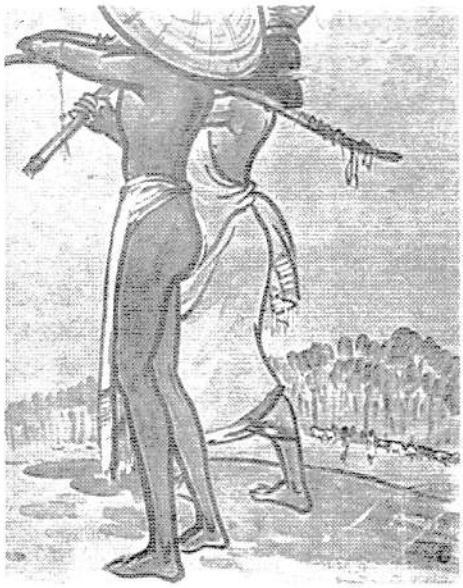

জয়নুল আবেদিনের দুটি চিত্রকর্ম

হিউয়েন-সাঙ-এর ভারতভ্রমণ

চোর নয়, ডাকাত নয়, রাজদ্রোহীও নয় সে। তবু তাকে পালাতে হচ্ছে, একাকী, রাত্রির অন্ধকারে, কাকপক্ষীকে মনের কথা জানতে না-দিয়ে।

তবু কথা গোপন রইল না। সিয়াংফু শহর থেকে অশ্বারোহী সৈনিক বের হল পরদিনই—পলাতককে ধরে নিয়ে যেতে হবে—জীবিত বা মৃত—তাইশুঙ-এর সম্রাটের কাছে।

মহাচীন তখন খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, বহুরাজক। দশটা রাষ্ট্র পাশাপাশি রেষারেষি করছে, প্রত্যেকেরই শাসক নিজেকে বলেন সম্রাট। এক রাজ্যের অধিবাসী অনুমতি পায় না অন্য রাজ্যে যাওয়ার, কী জানি পররাজ্যে গিয়ে সে যদি নিজের দেশের গোপন কথা ফাঁস করে দেয়! অনুমতি প্রার্থনা করে ব্যর্থমনোরথ হয়েছেন হিউয়েন-সাঙ।

তবু—তবু তাঁকে যেতে হয়েছে। দুর্বার টানে তাঁকে টেনেছে ভারত—অর্ধ-এশিয়ার ওপার থেকে। মরুপথ, গিরিপর্বত, হ্রদ, নদী, হিমবাহ অতিক্রম করে ধ্যানের দেশে তাঁকে পৌঁছুতেই হবে—অমিতাভ শ্রীবুদ্ধের কর্মভূমিতে। প্রভুর ডাক তিনি শুনতে পেয়েছেন নিম্ন-হিমালয়ের অরণ্যে-ঢাকা এক পবিত্র ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে, তাঁকে দর্শন করতেই হবে সে-পুণ্যতীর্থ।

এ-আকুলতাকে অবাস্তব মনে করেছেন চীনা রাজপুরুষগণ। নিজের দেশে কনফুশিয়াসের মতো ধর্মনিয়ন্তা, লাও-জের মতো সত্যদ্রষ্টা থাকতে ধর্মজিজ্ঞাসু একজন চীনবাসীর ধরণীর অপরপ্রান্তে কেন ছুটতে হবে তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য, তা তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য। আর দুর্বোধ্য বস্তুকে সন্দেহের চোখে দেখাই তখনকার রাজনীতি।

হিউয়েন-সাঙকে তাই সন্দেহ করেছেন রাজপুরুষেরা—তাঁকে নগরে দেখা যাচ্ছে না শুনে সঙ্গে-সঙ্গে সৈন্য পাঠিয়েছেন পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে ধরে আনবার জন্য।

এ-সম্ভাবনার কথা অজ্ঞাত ছিল না পলাতকের। সারারাত্রি তিনি দ্রুতপদে সেইদিকেই ধাবিত হয়েছেন, সাধারণ ভ্রমণকারীরা প্রাণান্তেও যেদিকে যায় না। কারণ সেদিকে প্রসারিত পথহীন মহামরুর অনন্ত বালুকাবিস্তার, তার ভিতর পা দেওয়া মানেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়া।

তবু গোবির পথেই পা চালিয়েছেন বেপরোয়া পর্যটক। কারণ তিনি জানেন—ঐ পথই একমাত্র পথ, যেদিকে রাজার শিকারিরা অনুসরণ করবে না তাঁকে।

করেওনি তারা। রাত্রি প্রভাতে হিউয়েন-সাঙ দেখলেন সম্মুখে তাঁর গোবির লালবালুকা দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। পাকা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো একটা অস্থিসার লাল ঘোড়াকে এনে ছেড়ে দিল সেই বালির ভিতরে। তার সম্মুখের দুই পায়ে ছাঁদন বেঁধে।

হিউয়েন-সাঙ হেসে ফেললেন—বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ-বালির রাজ্যে ঘোড়াটা কী খাবে?

গম্ভীর হয়ে বুড়ো বলল—খাবে বালি।

বালি? অবাক হয়ে যান হিউয়েন-সাঙ।

—আমার ও-প্রাণীটা চেহারায় ঘোড়ার মতো বটে, কিন্তু স্বভাব ওর উটের মতো। বালির ভিতরও কোথাও কোথাও কাঁটাগাছ জন্মায় এক-আধটা, তাই ও খায়। পানি না-খেয়েও থাকতে পারে দুই-চারদিন। আর সবচেয়ে বড় কথা, মরুভূমি পার হওয়ার পথঘাট ওর মুখস্থ। এতবার গিয়েছে আমার সঙ্গে।

মহাচীনে টাকা বলতে তখন একমাত্র চালু জিনিস ছিল রুপোর বাট। তা আর কতগুলো মানুষে বইতে পারে? যা হোক অল্প কয়েকটা ছিল হিউয়েন-সাঙ-এর সঙ্গে, তা দিয়েই ঘোড়াটাকে সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিনে ফেললেন। এর যেসব গুণের কথা বলছে বুড়ো, তার অর্ধেকও যদি সত্য হয়, হিউয়েন-সাঙ-এর পক্ষে এ হবে অমূল্য সম্পদ; তার কারণ যে-পথে তিনি এসে পড়েছেন, গোবি মরুভূমি তাঁকে পার হতেই হবে।

সেই ঘোড়া তাঁকে নিয়ে চলল মরুর বুকের উপর দিয়ে। হ্যাঁ, ঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছে—তাতে ভুল নেই। কারণ মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে কঙ্কাল—মানুষেরও বটে, ঘোড়ারও বটে। কোনোটা জীর্ণ, ভগ্ন, বালির ভিতর অর্ধেক বিলীন। কোনোটা আবার অটুট রয়েছে এখনও। লালবালির উপরে শাদা হটহট করছে আগুন-রঙা রোদ্দুরে।

মাঝে মাঝে জলের কূপ। মরুভূমিরও বয়স যতদিন, এসব কূপেরও ততদিন। সম্রাটেরা যুগে-যুগে সংস্কার করেছেন বইকি, নইলে বালিতে ভরাট হয়ে যেত কবে! সংস্কারও করেছেন, সুরক্ষিতও করেছেন। প্রত্যেকটা কূপের পাশে একটা করে পাহারা-ঘাঁটি। সেখানে সশস্ত্র সান্ত্রি রয়েছে দুটো কাজ করার জন্য। প্রথম, পানি যাতে কেউ অপচয় না-করে, তাই দেখা। দ্বিতীয়, সন্দেহজনক কোনো লোক দেখলে তাকে তীর মেরে বিঁধে ফেলা।

এখন সব জায়গায় সান্ত্রিরা তত হুঁশিয়ার নয়। হিউয়েন-সাঙকে সন্দেহ সবাই করল না। কিন্তু কয়েক জায়গায় করেও ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের ফলে যে-উত্তর তারা হিউয়েন-সাঙ-এর কাছে পেয়েছিল, তাতে খুশি হতে পারেনি। পলাতক চোর বা ডাকু সন্দেহে মেরেও ছিল তীর, ঘোড়া ছুটিয়ে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন হিউয়েন-সাঙ।

এগোতে লাগলেন ওপারের পানে। কিন্তু একবার বড় মুশকিল হল মরুর শেষপ্রান্তে এসে। সেখানে একটা নদী, রীতিমতো গভীর এবং খরস্রোতা। একটিমাত্র জায়গায় পানি কম খুব, সেইখান

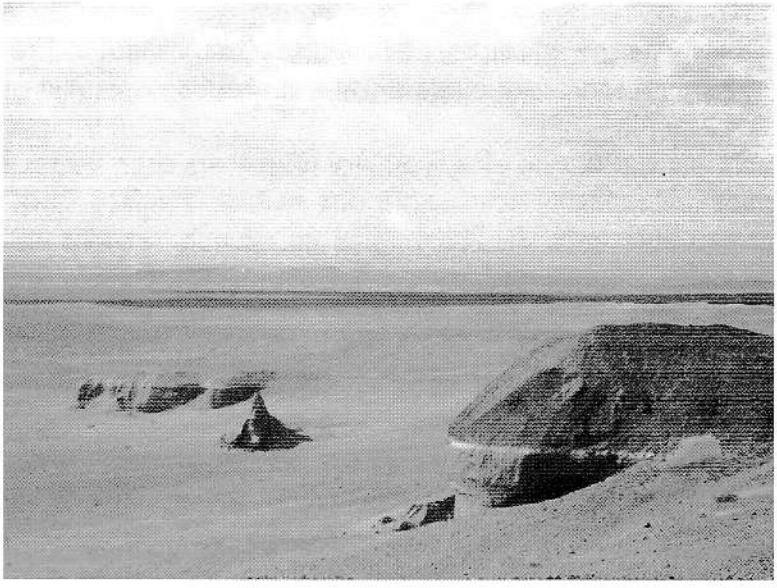

দিয়েই মরুচরেরা হেঁটে পার হয়। আর সেই পারাপারের এ-মুখেই পাড়ের উপরে এক ঘাঁটি, সান্ত্রিরা সেখানে দ্বিগুণ সতর্ক।

হিউয়েন-সাঙ-এর কথাবার্তা তাদের পছন্দ হল না—তাড়া করল তাঁকে। তিনি প্রাণ নিয়ে ছুটে পালালেন আবার মরুর দিকেই। সারাদিন ঘুরলেন হতাশায়, মর্মবেদনায় পাগলের মতো হয়ে। ভগবান বুদ্ধ কি এই অধম-সেবককে হাত ধরে টেনে নেবেন না নিজের কাছে?

সন্ধ্যার ঠিক আগে, ঘাঁটি থেকে বহুদূরে নদীতীরে আবার উপস্থিত হলেন তিনি। নদী প্রশস্ত, গভীর, স্রোত অতিমাত্রায় প্রবল। নিজে তিনি সাঁতার জানেন না। এই আধমরা ঘোড়া তাঁকে পিঠে নিয়ে কখনোই এ-নদী সাঁতরে পার হতে পারবে না।

হিউয়েন-সাঙ আকুল কণ্ঠে প্রভু বুদ্ধকে ডাকতে লাগলেন—পার কর গো, পারের কাণ্ডারি। নইলে এই নদীতেই আমি আত্মবিসর্জন দেব।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটা গাছের গুঁড়ি নদীস্রোতে ভেসে আসতে আসতে সম্মুখেই আটকে গিয়েছে একটা বাঁকের মুখে। তখন হিউয়েন-সাঙ মরিয়া। ঘোড়াটাকে সেইখানে ছেড়ে দিয়ে তিনি জলে নেমে সেই গুঁড়ি ধরলেন। সামান্য ঠেলতেই সেটা আবার স্রোতে ভাসতে লাগল। আর অনুকূল বাতাস পেয়ে কোনাকুনি এগুতে লাগল ওপারের পানে। ওপারে তুর্কিমুলুকের খাঁ-এর এলাকা। তুরুক সওয়ারিরা হিউয়েন-সাঙকে নিয়ে গেল খাঁ-এর দরবারে। খাঁ তাকে সন্দেহের চোখে তো দেখলেনই না, বরং তাঁর ধর্মানুরাগের পরিচয় পেয়ে খুবই প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

খাঁ তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করলেন রাজোচিত। তারপর প্রচুর অর্থ এবং কয়েকজন অনুচর তাঁকে দিলেন। অনুচরেরা পামির মালভূমি পার করে দিয়ে আসবে তাঁকে। হিউয়েন-সাঙ-এর পথের বিপদ আশাতীত রকম হ্রাস পেল এখন থেকে।

সমরখন্দের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হল। খাঁ-এর পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকাতে সব দ্বারই এখন অবারিত তাঁর সামনে। হিউয়েন-সাঙ সমরখন্দের বর্ণনা করেছেন অকুণ্ঠ প্রশংসার ভাষায়। অতুল সমৃদ্ধি এই নগরীর। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। উর্বর সুশ্যাম ভূখণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত এ-নগরী সুজলা, সুফলা, ফুল্লকুসুমিতা। সমরখন্দের ঘোড়ার প্রশংসা সারা পৃথিবীতে। অধিবাসীরা কারিগরিতে সুনিপুণ, উদ্যমী, শ্রমশীল।

অবশেষে পামির পার হয়ে আফগান ভূমির ভিতর দিয়ে হিউয়েন-সাঙ প্রবেশ করলেন ভারতে—তাঁর ধ্যানের ভূমিতে। ঐতিহাসিকগণ বলেন—ধর্মের মোহ পর্যটকের স্বচ্ছদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল ভারতে প্রবেশের পর। ভারত সম্বন্ধে তাঁর বিবরণ বস্তুনিষ্ঠ নয় সর্বক্ষেত্রে। তত্ত্বকথার রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে তিনি সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। খাঁটি ইতিহাস হিসেবে তাঁর বর্ণনাকে গ্রহণ করা চলে কিনা, খুব সন্দেহ আছে।

যাই হোক, তাঁর বর্ণিত ভারতে জীবিত নগরীর চেয়ে মৃতনগরীর সংখ্যা বেশি। যেসব স্থান একদা ছিল বৌদ্ধধর্মের পুণ্যপীঠ, তা তখন ধ্বংস্তূপে পরিণত। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ে বুদ্ধদেবের প্রচারিত নবধর্ম নিষ্প্রভ।

দীর্ঘ ষোলো বৎসর ভারতে কাটিয়েছিলেন হিউয়েন-সাঙ। নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন। রাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনের সভায় অতিবাহিত হয়েছিল কয়েকটি দীর্ঘ, মূল্যবান বৎসর। তক্ষশিলা ও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় দুটি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উক্তিতে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পরিপূর্ণ। নালন্দাতে তো তিনি ছাত্ররূপে অধ্যয়নই করেছিলেন দশবর্ষ কাল!

অবশেষে ধর্মজ্ঞানে সুসমৃদ্ধ হিউয়েন-সাঙ প্রত্যাবর্তন করলেন নিজ দেশে। আসার সময় পামিরের উত্তরদিক দিয়ে তিনি এসেছিলেন। যাওয়ার সময়ে গেলেন দক্ষিণদিকের পথে। আফগানিস্তান থেকে কাশগড়, কুয়েন লুন পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর ইয়ারকন্দ, তারপর চীনের মহাপ্রাচীরের কাছাকাছি পৌঁছে পূর্বের পথে।

সিয়াংফুর নিকটবর্তী হতে-না-হতে সম্রাটের দূত এসে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল মহাপর্যটককে। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও ধর্মানুরাগের খ্যাতি আগেই পৌঁছে গিয়েছে মহাচীনে। সম্রাট তাইশুঙ তাঁকে গ্রহণ করলেন শ্রদ্ধায় ও সমাদরে। তাঁর মুখ থেকে ভারতের সব কথা শুনলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। তারপর তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন নিজের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রিত্ব নেবার জন্য।

বলাবাহুল্য ধর্মপ্রাণ হিউয়েন-সাঙ-এর কাছে এ-প্রস্তাব গ্রহণীয় ছিল না। তিনি এক ধর্মবিহারে প্রবেশ করে সেইখানে জীবন কাটিয়ে দিলেন বৌদ্ধধর্মগ্রন্থসমূহকে সংস্কৃত থেকে চীনাভাষায় অনুবাদ করে। সম্রাটের অনুরোধে একটিমাত্র কাজ তিনি করেন—তা হল, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে যাওয়া।

হাস্যকৌতুক

শিকারে বেরিয়ে পথে প্রথমেই নাসিরুদ্দিনের সামনে পড়ে রাজামশাই ক্ষেপে উঠলেন। 'লোকটা অপয়া। আজ আমার শিকার পণ্ড। ওকে চাবকে হটিয়ে দাও।'

রাজার হুকুম তামিল হল। কিন্তু শিকার হল জবরদস্ত। রাজা নাসিরুদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন।

'কসুর হয়ে গেছে নাসিরুদ্দিন। আমি ভেবেছিলাম তুমি অপয়া। এখন দেখছি তা নয়।'

নাসিরুদ্দিন তিনহাত লাফিয়ে উঠল।

'আপনি ভেবেছিলেন আমি অপয়া? আমায় দেখে আপনি ছাব্বিশটা হরিণ মারলেন, আর আপনাকে দেখে আমি বিশ ঘা চাবুক খেলাম। অপয়া যে কে সেটা বুঝতে পারলেন না?

খায়রুল আলম সবুজ

রেনেসাঁস

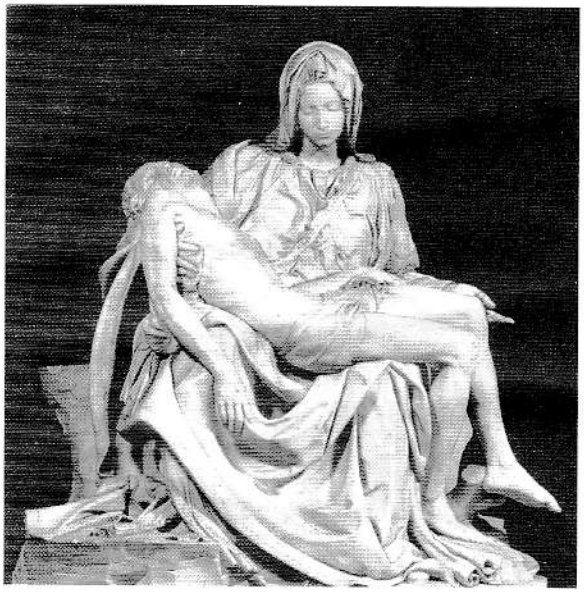

মিকেলেঞ্জেলোর ভাস্কর্য *পিয়েতা*

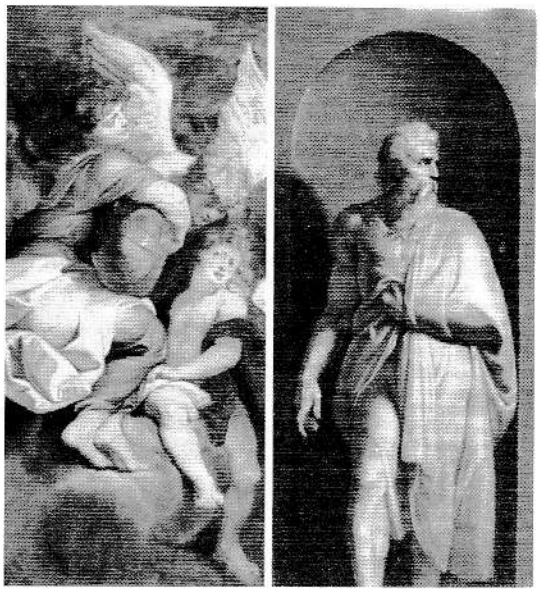

রাফায়েলের দুটি চিত্রকর্ম

যারা শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে জড়িত, লেখাপড়ার সঙ্গে জড়িত তাদের কাছে রেনেসাঁস অত্যন্ত পরিচিত একটি শব্দ। রেনেসাঁস—Renaissance শব্দটির আভিধানিক অর্থ পুনর্জন্ম—rebirth। The Renaissance বলতে বুঝায় একটি বিশেষ সময়কে। সে-সময়কাল চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক জুড়ে বিস্তৃত। এই পুরোটা সময় ধরে বিশ্বের শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী কিছু কর্মকাণ্ড হয়েছে। সেসব ধ্রুপদ আঙ্গিকের এবং সর্বকালের বলে স্বীকৃত। আর এইসব কর্মকাণ্ডের সবটাই ঘটেছে ইউরোপে। প্রথমে ইটালির উত্তরাঞ্চলে তারপর ধীরে ধীরে সারা ইউরোপে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ হঠাৎই প্রাচীন গ্রিক ও রোমক শিল্পসাহিত্য, ধ্যানধারণা ও চিন্তা-চেতনার আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং নতুন উদ্দীপনায় নতুনভাবে প্রাচীনের মূল্যায়নে মেতে উঠে। শুরু হল এক পুনর্জাগরণ। এ-কারণেই রেনেসাঁস-এর আর-এক অর্থ পুনর্জাগরণ। কোথাও যদি মানুষ নবতর সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নতুন আগ্রহ নিয়ে আপ্রাণ জেগে ওঠে তাহলে তাকেও আমরা রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ বলি। বাংলা শিল্পসাহিত্যের অঙ্গনেও এরকম পুনর্জাগরণের কাল এসেছিল। ইউরোপে এই পুনর্জাগরণকাল তিন শতক জুড়ে বিস্তৃত হলেও এর শুরুটা হয়েছিল উত্তরাঞ্চলে। আগেই বলেছি, চতুর্দশ শতকের শুরুতে এখানকার শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই মূলত

এর উন্মেষ ঘটেছিল। তার পরবর্তী দুই শতক অর্থাৎ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক ধরে পুনর্জাগরণের এই ঢেউ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

ইউরোপে শিল্পসাহিত্যের ধারা প্রবহমানকাল ধরেই তথাপি একটা সম্পূর্ণ আলাদা ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ রেনেসাঁসকে পূর্ববর্তী সময় থেকে একান্ত আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে। আর এই লক্ষণটি হল প্রাচীন গ্রিক ও রোমক চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রতি মানুষের বিস্ময়কর আগ্রহ। এই আগ্রহের তীব্রতার কারণেই কালজয়ী শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সর্বকালের বিখ্যাত দুটি নাম এই সময়ের শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে—এদের একজন হলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) আর অন্যজন মিকেলেঞ্জোলো (১৪৭৫-১৫৬৪)।

এই সময়ে মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি কৌতূহল নিয়ে তার চারপাশকে দেখতে শুরু করল। দেখা দিল সবকিছুকেই প্রশ্ন করার প্রবণতা। রাজনীতি নিয়েও নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবনা-চিন্তা শুরু হল এবং পরবর্তী সময়ে মানবসভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে সে-সবেরও সূত্রপাত এই সময় থেকে।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি এসে জার্মানির মেইঞ্জ শহরে এক অচিন্ত্যনীয় ঘটনা ঘটল। সে-ঘটনা না-ঘটলে পৃথিবীর বর্তমান চেহারা হয়তো আজকের মতো হত না। জোহান গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করে ফেললেন। এ-যাবৎকাল মানুষ হাতে লিখেই বইয়ের কপি তৈরি করত কিন্তু ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে হাতে লেখার অবসান হল। গুটেনবার্গ একধরনের টাইপ আবিষ্কার করলেন—চাইলে এই টাইপ উঠানো যায়, সরিয়ে ফেলা যায়, আবার চাইলে বসানো যায়। বর্তমানে তো সবকিছুই কম্পিউটারে কম্পোজ করা হয়। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত অন্যদেশের মতো আমাদের দেশেও এভাবেই লেটার বসিয়ে কম্পোজ করা হত। এসব প্রেসকে লেটার-প্রেস বলা হত। ছোট্ট একটুকরা সিসার মাথায় অক্ষর বসানো থাকত। এই অক্ষরগুলো পাশাপাশি বসিয়ে শব্দ এবং বাক্য কাগজে তৈরি করা হত। এভাবে লাইনের-পর-লাইন কম্পোজে পৃষ্ঠা ভরে উঠত—এক পৃষ্ঠা ম্যাটার ভালো করে বেঁধেছেদে তাতে কালি লাগিয়ে শাদা কাগজে ছাপ ফেলা হত। এই পদ্ধতিতেই ছাপার কাজ বহুকাল চলেছে।

মানুষ একসময় হাতে লিখে বই বানাত, সে-কথা কি এখন ভাবা যায়? আজ এই একবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে ছাপার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। গুটেনবার্গের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে প্রয়োজনমতো বইছাপা সম্ভব হল। জ্ঞান ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল দিগদিগন্তে দূরদূরান্তে।

রেনেসাঁসের শেষ ধাপে সাহিত্যের দুজন স্তম্ভতুল্য মনীষী জন্মালেন, তাঁরা হলেন ইংল্যান্ডের উইলিয়াম শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) এবং স্পেনে মিগুয়েল ডি সার্ভেন্টিস (১৫৪৭-১৬১৬)।

সমুদ্রপথে নতুন নতুন দেশ-মহাদেশ আবিষ্কারে মেতে উঠলেন শত শত নাবিক। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে ভিড় জমালেন এই যাত্রায়। এদের বেশিরভাগই মূলত এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের একটা সহজপথ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা, ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান—এই সময়ের কয়েকজন দুঃসাহসিক নাবিক। এই নতুন নৌপথ আবিষ্কারের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। গড়ে ওঠে ব্যাংকিং হাউস এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলেফেঁপে উঠল পুঁজির পরিমাণ—ব্যস সব আয়োজন সম্পূর্ণ হল। এরপর দ্রুতগতিতে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল সভ্যতা। যতই দিন যাচ্ছে গতি ততই বাড়ছে। তবে একপর্যায়ে বোধহয় গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়। সেজন্যে মানুষের বোধের ক্ষেত্রে আর-একটি পুনর্জাগরণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

সরদার জয়েন উদ্‌দীন

টাকার মেশিন

কোনো দেশে নাকি অনেক রাজা আছে। কেউ খামারের রাজা, কেউ লোহালক্কড় বা মেশিনপত্রের রাজা, কেউ-বা আবার তেলের রাজা। এইসব রাজার বেশুমার টাকা। এত টাকা যে, নিজেরা হিসাবই রাখতে পারে না। তাই ব্যাঙ্কেই তাদের হিসাব-নিকেশ চলে। একথা শুনে অবধি ভাবনায় আর কূল পাই না, এত টাকা দিয়ে এই রাজারা করে কী? তুমিই বল, তোমার যদি এত টাকা থাকত, যা কিনা তুমি গুনে হিসাব করতে হিমশিম খেতে, তাহলে তুমি কী করতে?

তাই তো, মাথাটা গুলিয়ে যাবার মতোই তো ভাবনার বিষয়টা। এত টাকা থাকলে আমরা তা দিয়ে কী করতাম! ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবে আমার মনে হল কী জান? মনে হল, এত টাকাওয়ালা ইয়া বড় বড় রাজাগুলো আমার-তোমার মতো মানুষই নয়। তাহলে কেমন মানুষ? আমার মনে হয়, এই ধরো, তারা এক-একজন খুব মস্তবড় এক-একটা জোয়ান, আর এই পেট নামক বস্তু তাদের তিন-চারটে করে হবে নিশ্চয়ই। তোমার আমার দাঁত কয়টা? বত্রিশটা তো? আর তাদের হল কিনা কমসে-কম একশো বত্রিশটা। এইসব দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে তারা খুব খায়, রাত দিন কেবল খায় খায় আর খায়, গোগ্রাসে সব গিলে খায়।

কী বলছ? ধ্যেৎ, তা-ও কি কখনো হয় নাকি?

ধ্যেৎ তো বলছ, তাহলে বল, এত টাকা দিয়ে তারা করে কী? আমি তো হলপ করে বলতে পারি, বলতে পারি এজন্যে যে, এটা আমার বিশ্বাস, এইসব টাকার কুমিররা ভোর থেকে শুরু করে গভীর

রাত পর্যন্ত অনবরত শুধু খায়। শহরের মিষ্টির দোকানে যত মিষ্টি আছে, হাঁ করে সেসব কেবল গিলতে থাকে। ডিম, মাখন, হাঁস-মুরগি, পুডিং-কেক, আঙুর-বেদানা, আপেল-নাশপাতি, কমলা-কলা ইত্যাদি চিবিয়ে গিলছে। খেতে-খেতে সন্ধ্যার দিকে যখন চোয়াল ধরে আসে, যখন আর মুখ চলতে চায় না, তখন চাকরগুলো খাবার চিবিয়ে দিতে থাকে এবং তারা গিলে খায় শুধু। তারপর একসময় অসাড় হয়ে আসে এবং নিথর হয়ে ঘুমিয়ে যায়। পরদিন কিন্তু ঘুম ভেঙেই রাক্ষসের বাচ্চার মতো হা-করে থাকে, দাও-দাও, খাবার দাও।

চিন্তা করে আমার এটাও ধারণা হয়েছে যে, এত চেষ্টা করে এত খেয়ে তাদের ব্যাঙ্কে জমা টাকার যে-সুদ হয় তার সামান্য অংশও তারা খরচ করতে পারে না। তাছাড়া রোজই তো আরো রাশি রাশি টাকা আয় হচ্ছে তাদের। তুমি হয়তো ভাবছ, আমার এটা অদ্ভুতরকম একটা কল্পনা, এবং এরকম কল্পনা সত্য হতে পারে না—ডাহা মিথ্যা কথা। একটা লোক অত খাবার খেতে পারে নাকি?

না-ই যদি খায়, তাহলে অত টাকা দিয়ে করে কী? এই রাজাদের তাহলে এমন টাকার কুবের হয়ে লাভটা কী? আমি আরো ভেবেছি, তাদের জুতোর চামড়া নিশ্চয়ই সোনার পাতে ছাওয়া। এবং গায়ের জামা সোনার সুতোয় বুনানো। সে-জামার বোতামগুলো ফুটবলের মতো ইয়া বড় বড়, হীরা-রত্ন, মণি-মাণিক্য দিয়ে তৈরি। সোনার হ্যাট নিশ্চয় তারা মাথায় পরে। যে-লেপটা তারা গায়ে দিয়ে ঘুম যায় সেটা নিশ্চয়ই সোনার তুলো দিয়ে তৈরি। তা হবে না-ই বা কেন? তোমরাই ভাবো তো দেখি, টাকা হয়েছে তো খরচ করবার জন্যেই। খরচই যদি না-হল, তবে সে-টাকার দরকারটা কী?

তোমরা নিশ্চয়ই আমার মনের এই ভাবনাকে আজগুবি ভেবে অবাক হচ্ছ। আমি কিন্তু সত্যই বলছি, আমার কাছে এ কিন্তু মোটেই আজগুবি নয়। এটা আমার বিশ্বাস। কেননা, ঐ রাজারা টাকা খরচ করে কী দিয়ে?

আমি এটা নিয়েও ভেবেছি, ঐ রাজারা এত টাকার উপায়ই-বা করে কী করে? মনে হয়, তাদের হাত দুখানা খুব বড়। বড় মানে কত বড়? এই ধর, সেই নিজের দেশে বসে হাত বাড়িয়ে আমার দেশের পাট, চা; আরব, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের তেল, সোনা এসব সাপটে জড়ো করছে নিজের বাড়িতে। এই রাজাদের নিয়ে এত-যে কল্পনা করলাম, কিন্তু তবুও ভাবতে পারছিনে তাদের মাথাটা কেমন দেখতে, কত বড়ই-বা সেটা? মাথাটা আছে কি নেই, তা-ও অনেক সময় মনে সন্দেহ জাগায়। কেননা, মস্তবড় মাংসপিণ্ড যে-দেহটা, তার কাজ তো কেবল খাওয়া আর পৃথিবীর সব দেশ থেকে দামি দামি জিনিসপত্র টেনে এনে তা থেকে চটকে টাকা বের করা। তাই তার দেহটার উপর মাথাটা নাই-বা থাকল। ওটার দরকারটা কী? থাকলেই বরং বিপদ। মাথা থাকলে পৃথিবীর নানা দেশের লোক ঠকিয়ে, উপবাসে রেখে, এত টাকা কি নিজের দেশে গাদা করা যায়? মাথা নেই বলেই তো ঐ রাজাগুলো তাদের মস্ত দুহাত বাড়িয়ে পাগলের মতো পৃথিবীর ধনদৌলত জাপটে ধরে বুকের পাশে টেনে আনছে। তারপর বিরাট আকার হা করে সেই ধন-দৌলত মুখের গর্তের মধ্যে কেবল ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং দাঁতগুলো দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করে গিলে ফেলছে। যখন সেইসব রাজাদের সম্বন্ধে আমার মনে এমন একটা অদ্ভুত কল্পনা চলছে, ঠিক সেই সময় শুনতে পেলাম, এই আমাদের দেশে সেই লাখ লাখ কোটি কোটি, বেশুমার টাকার মালিক এক রাজা এসেছেন। এই-পড়ি কি সেই-পড়ি করে আমি তো দৌড়-দৌড়-দৌড়। দেখব একবার, আমার এই চর্মচক্ষে একবার দেখব, দেখে চোখ-দুটো জুড়াব। লোকটা, সেই রাজার রাজা ব্যক্তিটা, দেখতে কেমন? পেটটা আর হাত দুখানা তার কতবড়, মাথাটা আছে কি নেই।

ও বাবা, এ যে মহাবিপদ। সেখানে যে কাউকে ঢুকতেই দেবে না! চারিদিকে পাহারা। মনে মনে

ফন্দি-ফিকির আঁটলাম। তারপর অনেক কষ্টে এদিক থেকে সেদিক পালিয়ে লুকিয়ে, সেই রাজার রাজা যে-কামরায় থাকেন, তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখলাম, একটা কিম্ভূতকিমাকার বুড়োলোক কামরার সামনে বসে আছে। সে তার কুতকুতে দুটো চোখের পাতা অনেক কষ্টে টেনে তুলে, মনে হল, আমায় বলল, কী চাই?

বললাম, আপনার কাছে আমি বিশেষ কিছুই চাই না। শুধু দয়া করে আমাকে এই কামরাটায় ঢুকতে অনুমতি দিন।

তিনি বললেন, কেন, এ কামরায় ঢুকবার তোমার দরকারটা কী?

তাঁকে অনেক বিনয় করে বললাম, দেখুন, আমি অনেক আশা করে, অনেক দূর থেকে এসেছি। বিদেশ থেকে যে রাজার রাজা লোকটা এসেছেন, শুধু তাঁকে একনজর দেখব বলে। দয়া করে আমায় নিরাশ করবেন না। ঐ বুড়োলোকটা ইঁদুরের মতো একটু হেসে বললেন, কেন, তাঁর কাছে তোমার কী দরকার?

ঐ তো বললাম, একনজর দেখব বলে।

সে-লোকটা আবার তেমনি করে একটু হেসে বললেন, ও এই! তাহলে শোনো, আমিই সেই লোক। এ-কথা শুনে আমি তো হেসে আর বাঁচিনে। বুড়োলোকটা বলে কী! তামাশা করছে নাকি আমার সাথে?

বললাম, কী যে ছাই মিছে কথা বলছেন, চালাকি করবার আর জায়গা পান না! ভাবছেন, আমি বুঝি খুব বোকা, আর আমাকে ঠকাবেন!

লোকটা শাদাসিধেভাবে বললেন, না ভাই, বিশ্বাস কর, আমিই সেই লোক।

এখন দেখছি, আমার কল্পনা ভুল, বেমালুম ভুল। ঐ লোকটার চেহারা একেবারে সাধারণ একজন অতিবেশি বুড়োমানুষের মতো। লোকটা বসেছিল একখানা আরাম-চেয়ারে হেলান দিয়ে, খুব বয়স্ক কিন্তু থুত্থুড়ে নয়। বেশ মোটাতাজা; দাড়ি-গোঁফ কামানো কি মাকুন্দ, ঠিক বোঝা যায় না। আমার-তোমার হাতের মতোই দুখানা হাত তার। গালের মাংস চোয়াল থেকে আলাদা হয়ে ঝুলে পড়েছে, এমনি ঢল-ঢলে। নিচের পুরু ঠোঁটটাও নেতিয়ে ঝুলে পড়া। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, বাঁধানো দাঁতগুলো ইঁদুরের দাঁতের মতো ছোট ছোট। চোখে যে বেশি দেখতে পায় না, তা তার কুৎ-কুৎ করে তাকানো থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া সামনে ছোট টেবিলটার উপরে খুব পুরু লেন্সের একজোড়া চশমা পড়ে রয়েছে। চোখের ভ্রূতে শাদা কি কালো একটাও চুল নেই। মাথাটাও তেমনি, চুল উড়ে গিয়ে একেবারে তেপান্তরের মাঠ হয়ে গেছে। মুখখানা যেন শিশুর মুখের মতো শাদাসিধে। তার মুখ দেখে তুমি বুঝতেই পারবে না, এই লোকটা এখুনি দুনিয়ায় এল, না দুনিয়া থেকে যাবার জন্যে পা এগিয়ে আছে।

জামাকাপড়ের দিক দিয়েও আমার কল্পনা এক নম্বরও পেল না। সাধারণ একজন মানুষের মতোই তার পোশাক। সোনা একরকম তার দেহে নেই বললেই চলে। যা আছে, তার শুধু হাতের একটা আংটিতে, আর কবজির ঘড়িটাতেও থাকতে পারে। সব মিলিয়ে কত আর হবে, খুব বেশি হলে এক-আধ ভরি।

তাহলে তোমরাই বল, এই লোকটাকে আমি সেই বিদেশের সেই বেশুমার টাকার মালিক—রাজার রাজা বলে স্বীকার করি কী করে?

সেজন্যে আমার আদৌ বিশ্বাস হল না যে, এই সেই লোক যার অগাধ টাকা, অশেষ সম্পত্তি এবং যার কথা আমি এতকাল ধরে ভাবছি। মনে মনে ভাবলাম, বিদেশে এসে ফাঁকি দিয়ে বড়লোকি নাম জাহির করবার আর জায়গা পাও নাই বাবা! দাঁড়াও, তোমার ধাপ্পাবাজি এক্ষুনি ছুটিয়ে দিচ্ছি। বললাম, দেখুন, আপনি যে গালগল্প ফাঁদছেন, আপনিই সেই রাজার রাজা, ও আষাঢ়ে গল্প আমি বিশ্বাস করিনে, বুঝলেন?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, কেন বিশ্বাস করছ না?

জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে বলুন তো, আপনি ঘুম থেকে উঠে কয়টা মুরগি খান?

গম্ভীর হয়ে তিনি জবাব দিলেন, মাংস-টাংস আমি খাইনে বাবা, ও ডাক্তারের বারণ। মাংস তো দূরের কথা, খাওয়ার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমি একরকম খাই-ই না। সামান্য এককোয়া লেবু, একটু ফলের শরবত, একটু স্যুপ আর চিনিছাড়া সামান্য একটু কফি কি চা।

এমনভাবে লোকটি কথাগুলো বলল যে, আমার মনে হল, নিছক সত্যিকথাই বলছে। তাই ভারি ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

বললাম, আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি সত্যি করে বলুন, দিনের মধ্যে আপনি আর কী কী খান?

তিনি তেমনিভাবে বললেন, আমি যা বলছি, বিশ্বাস কর। এক আধ স্লাইস রুটি, সবজি কি মাংসের স্যুপ আর মাঝে মাঝে ফলের রসই আমার খাদ্য। আমি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছি কিনা।

আমার বিশ্বাস তখন কর্পুর হয়ে বাতাসে উড়তে শুরু করেছে। তাই অবাক হয়ে বললাম, তাহলে আপনি আপনার এত টাকা দিয়ে কী করেন?

বুড়োর ঘাড়টা একটু দুলে উঠল, ঠোঁটদুটোর আকৃতি দেখে মনে হল তিনি আমার কথা শুনে

হাসছেন। বললেন, এ তো আজব কথা, টাকা দিয়ে কী করি! দুটো রেললাইন আছে, দু-অঞ্চল থেকে গম বয়ে এনে গুদামে তুলবার জন্যে। কিন্তু আর একটা অঞ্চলে এবার কৃষিখামার সম্প্রসারিত হয়েছে। সেদিকে নতুন একটা লাইন প্রয়োজন, সেটা করতে হলে টাকা দরকার।

এত গম দিয়ে কী করবেন? তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, কেন, বেচে টাকা করব।

সে-টাকা কী করবেন?

আরে, তুমি আচ্ছালোক তো, সোনার খনি লোকে কেন কেনে। সোনা তুলে বিক্রি করব। অনেক টাকা আসবে।

সে-অনেক টাকা দিয়ে কী করবেন?

উত্তর মহাসাগরে তেলের সন্ধান হয়েছে, সে-খনি কিনবার ইচ্ছে রয়েছে।

তেলের খনি কিনে কী হবে?

বোকালোক তো তুমি! সোনা আর পেট্রোল—এতে প্রভেদ নেই। বরং এখন পেট্রোলের প্রয়োজন অধিক হয়ে উঠছে। এতে টাকা আরো বেশি আসে।

আরো বেশি টাকা কীসের জন্যে?

তিনি বললেন, তোমাকে নিয়ে আচ্ছা বিপদ তো। আরো টাকা—আরো বেশি টাকা করবার জন্যে।

আমি বললাম, আহা, তা নয়, আরো বেশি টাকা দিয়ে আপনি কী করবেন?

আমার এরূপ প্রশ্ন শুনে বুড়ো অবাক চোখে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘাড়টা পেছনের দিকে একটু টেনে নিলেন। তারপর কেমন যেন ভঙ্গি করে বললেন, তুমি কি পাগল নাকি? আমিও সোজাসুজি তাঁকে বললাম যে, আমিও তো ঐ কথাটাই ভাবছি, আপনি টাকার পাগল নাকি? ঘাড়টা একটু দুলিয়ে মাথাটা একটু নিচু করে বুড়ো তাঁর সেই ছোট্ট ছোট্ট দাঁত দু-পাটি বের করে অদ্ভুতভাবে হাসলেন, তারপর কুৎ-কুৎ করে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি বেশ মজার লোক দেখছি। তোমার মতো অদ্ভুত চিন্তার লোক আমি এর আগে কখনো দেখিনি। আমি তাঁর গলার দিকে চাইতেই দেখলাম, কালো ছোট 'বো'টার সঙ্গে একটা ছোট্ট সোনার পিন আঁটা। সেই পিনটার মাথায় একটুকরো হীরে জ্বলজ্বল করছে।

মনে মনে বললাম, আহা, ঐ হীরে যদি একনম্বর একটা ফুটবলের সাইজও হত, তাহলেও আমার কল্পনাটা একটু সত্য হত। দেখছি, আমার সব কল্পনা, চিন্তাভাবনা একেবারে মাটি। একটুখানি নীরব থেকে বললাম, আচ্ছা, সারাটা দিন আপনি কী করেন?

বুড়ো ইঁদুরের মতো মুচকি হেসে জবাব দিলেন, আমার নানা চিন্তাভাবনা করতে হয়। কোথায় শিল্পকারখানা গড়া যায়, কোন দেশ থেকে কী কেনা যায়, ইত্যাদি। অর্থাৎ অর্থ উপার্জন কী করে হয়, সেই সবই আর কি! মানে, টাকা আয় করবার ফন্দি-ফিকির।

আবার সেই প্রশ্ন এল। বললাম, সে-টাকা দিয়ে কী করেন?

আরো টাকা করি!

আরো টাকা দিয়ে কী করেন?

আরো টাকা করি।

আমি একটু থেমে বললাম, তাহলে দেখছি, আপনি টাকা তৈরি করার একটা মেশিন—মানুষ না।

চাঞ্চল্যকর মামলা

খেলাধুলায় ম্যারাথন নামের প্রাণান্তকর দৌড়টিই বোধকরি সবচেয়ে উত্তেজনাকর আইটেম। এমন দীর্ঘতম আর কঠিন দৌড়-প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তার ওপর জিতে-যাওয়া সত্যি যে কী সাংঘাতিক একখানা ব্যাপার, তা বলাই বাহুল্য।

আর সেই থেকেই এই প্রবাদটিরও জন্ম। অনেক লম্বা কোনোকিছু হলেই এখন লোকে তাকে তুলনা করে ম্যারাথন দৌড়ের সাথে।

বহুবছর আগে এমনি একটা ম্যারাথন রেকর্ড করেছিলেন ফ্রান্সের এক ব্যারিস্টার সাহেব। সেটা ছিল অবিরাম কথা বলার রেকর্ড।

অবশ্য বিশ্ব-অলিম্পিক বা অন্য কোনো খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় নেমে তিনি এই রেকর্ড করেননি। করেছিলেন একান্তই প্রয়োজনের তাগিদে—তাঁর এক মক্কেলকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে একটানা একশ বিশ ঘণ্টা কথা বলার এই অবিশ্বাস্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

উকিলের নাম ছিল মি. লুইস বেনার্ড (১৭৮৮-১৮৮৫)। আদালতের এই বিচারের ঘটনাটি ছিল যেমন চাঞ্চল্যকর তেমনি মর্মান্তিকও বটে।

ব্যারিস্টার লুইস বেনার্ড সাহেবের মক্কেলটির নাম ছিল জেনারেল জিন ট্রভট। জিন ট্রভট ছিলেন তৎকালীন ফ্রান্সের রাজকীয় বাহিনীর একজন জেনারেল। লোকটি আসলেই ছিলেন সৎ এবং সত্যিকারের একজন বীরযোদ্ধা।

তা হলে কী হবে, তাঁর কয়েকজন ব্যক্তিগত শত্রুর চক্রান্তে পড়ে তিনি সহসা ফেঁসে গেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হল কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ।

অবশেষে ১৮১৬ সালে ফ্রান্সের রেন্নেস শহরের সামরিক আদালতে উঠল এই মামলা। অভিযোগগুলো চক্রান্তমূলক এবং মিথ্যে হলেও মামলায় জেনারেল জিন সত্যি সত্যি দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেলেন। আদালত তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

মামলায় আসামিপক্ষের উকিল ছিলেন এটর্নি লুইস বেনার্ড। মামলায় তাঁর মক্কেল হেরে গেলেন। অথচ তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করেছিলেন বেনার্ড। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে এঁটে উঠতে পারলেন না।

এদিকে রায় ঘোষণা হওয়ার অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দণ্ডাদেশ কার্যকর করার কথা।

আদালতে রায় ঘোষণা হওয়ার সাথেসাথেই তিনি এই রায় শিগগির কার্যকর না-করার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি আবেদনে বললেন—তাঁর মক্কেল নিরপরাধ এবং দেশের একজন শ্রদ্ধেয় বীরযোদ্ধা। তিনি স্বয়ং ফ্রান্স সম্রাটের একজন স্নেহভাজন সৈনিক। তিনি সম্রাটের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেছেন। তাই সম্রাটের কাছ থেকে প্রাণভিক্ষার সর্বশেষ খবর না-আসা পর্যন্ত যেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর স্থগিত রাখা হয়।

কিন্তু সামরিক আদালত বেনার্ড সাহেবের এই আবেদন মঞ্জুর করতে পারলেন না। কারণ সম্রাট থাকেন ভার্সাই শহরে। যেখানে জেনারেল জিনের বিচার হচ্ছিল—এখান থেকে পাঁচদিনের পথ। বলা বাহুল্য—তখন তো আর দ্রুতগামী কোনো যানবাহন ছিল না। যানবাহনের মধ্যে ছিল ঘোড়া, আর না-হয় ঘোড়ার গাড়ি।

কিন্তু সামরিক আদালত অত সময় অপেক্ষা করতে রাজি নয়। একটি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামিকে অতিরিক্ত আয়ুদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এদিকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জারি হওয়ার সাথে সাথেই এটর্নি বেনার্ড সাহেব জেনারেল জিনের স্ত্রীকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন সম্রাটের কাছে।

মিসেস জিন সম্রাটের কাছে গিয়ে স্বামীর জন্য প্রাণভিক্ষা চাইবেন। যদি তিনি তা চেয়ে আনতে পারেন সত্যি সত্যি, তাহলেই তাঁর স্বামীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হবে।

দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে মিসেস জিন পাগলের মতো ছুটে চলেছেন ভার্সাই শহরের দিকে—সম্রাটের কাছে। কিন্তু তিনি যত দ্রুতই যান-না কেন, ফিরে আসতে তো কম করে হলেও পাঁচদিন লাগবে। কিন্তু আদালত তো এতদিন অপেক্ষা করবে না।—তাহলে উপায়?

সহসা এক বুদ্ধি খেলে গেল বেনার্ড সাহেবের মাথায়। তিনি আবার আদালতে এক আবেদন পেশ করলেন। আবেদনে তিনি বললেন, তাঁর মক্কেলের স্ত্রী ফিরে না-আসা পর্যন্ত যদি সময় না-ই দেয়া হয়, তবে মহামান্য আদালতে যেন তাঁর আবেদনের স্বপক্ষে অন্তত তাঁর নিজের কিছু বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দান করেন। কারণ মক্কেলের পক্ষ হয়ে তিনি আদালতে যে-আবেদন করেছেন, সে-সম্পর্কে তাঁর নিজের কিছু বক্তব্য আছে, তা তিনি পেশ করতে চান।

অতঃপর সামরিক আদালত একান্ত মানবিক কারণে তাঁর এই সামান্য প্রার্থনাটুকু মঞ্জুর করলেন।

অনুমতি পেয়ে বেনার্ড সাহেব আদালতের সামনে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বললেন—তাহলে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে যেন এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা না-হয়। অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ ধরে আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন ততক্ষণের মধ্যে জেনারেল জিনকে হত্যা করা যাবে না।

—বেশ তাই হবে। আদালত বেনার্ড সাহেবের এই যুক্তিও মেনে নিলেন।

অতঃপর এটর্নি লুইস বেনার্ড সাহেব শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য। যে-বক্তৃতার কথা আগেই বলেছি—সেই ম্যারাথন বক্তৃতা।

কিন্তু সেই-যে একবার শুরু হল আর তো শেষ হয় না। বয়োবৃদ্ধ পক্বকেশ বেনার্ড সাহেবের মুখ থেকে যেন কথার খই ফুটতে শুরু করেছে। অজস্র ধারায় বেরিয়ে আসছে যুক্তির পরে যুক্তি। দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত।

দিন গেল। রাত গেল। বিচারপতির আসনে বসেই মহামান্য বিচারপতি একসময় শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সহসা জেগে উঠে নিজের চোখ দুহাতে রগড়াতে-রগড়াতে সবিস্ময়ে দেখলেন, তখনও বেনার্ড সাহেবের মুখ থেকে বক্তৃতা চলছে। কোনো শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, নেই যেন কথার শেষ।

এমনি করে পার হল একদিন, দুদিন, তিনদিন। অবশেষে চারদিন। এল পাঁচদিন পরের রাত। সুদীর্ঘ এই পাঁচদিন-পাঁচরাত ধরেই লুইস বেনার্ড সাহেব তাঁর বক্তৃতা দিয়ে গেলেন অবিরাম গতিতে—অনর্গলভাবে।

অবশেষে সবাই ধরতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা। বুঝতে পেরেছিলেন বিচারপতি স্বয়ং নিজেও। তিনি-যে শুধু সময় নষ্ট করার জন্যই এমন কাণ্ড করছেন—সবার কাছেই ধরা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। আদালত তাঁকে বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। আরো শর্ত হল তাঁর বক্তব্য শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা যাবে না। এই মারপ্যাঁচেই তিনি কাবু করে ফেললেন আদালতকে।

এদিকে সত্যি সত্যি পাঁচদিনের দিন জেনারেল জিন সাহেবের স্ত্রী পড়িমরি করে এসে ঢুকলেন আদালতকক্ষে।

হাতে তাঁর সম্রাটের আদেশনামা। সম্রাট ক্ষমা করে দিয়েছেন জেনারেল জিনকে। এবার বেনার্ড সাহেব জেনারেল জিনের স্ত্রীর হাত থেকে ক্ষমার আদেশপত্রটি আদালতে পেশ করে শেষবারের মতো বললেন, 'মহামান্য আদালত, আমাদের মহানুভব সম্রাট আমার মক্কেল জেনারেল জিন ট্রভটকে অতীত গৌরব ও বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি মহামান্য আদালতের সামনে সম্রাটের সেই আদেশনামা পেশ করছি।'

এই বলে শ্রান্ত-ক্লান্ত বেনার্ড সাহেব এসে বসে পড়লেন তাঁর নিজের আসনে। এত শ্রান্তি-ক্লান্তির পরেও তাঁর মুখেচোখে ফুটে উঠল বিজয়ের হাসি। তাঁর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মক্কেলের জীবন রক্ষা পাওয়ার হাসি। কত যেন আনন্দের হাসি।

হাস্যকৌতুক

কারো মৃত্যু হলে শোক জানানোর জন্য কালো পোশাক পরে মোল্লার দেশের লোকেরা। মোল্লাকে সেই পোশাকে হাঁটতে দেখে একজন জিজ্ঞেস করল, কেউ মরল নাকি, মোল্লাসাহেব?

সাবধানের মার নেই, বলল মোল্লাসাহেব, কোথায় কখন কে মরছে তা কি কেউ বলতে পারে?

ভলিবল খেলা হয় কীভাবে?

আউটডোর অথবা ইনডোর-এ যে-কোনো বয়সের পুরুষ বা মহিলাদের মধ্যে ভলিবল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। ৯মি. প্রস্থ ও ১৮ মি. দৈর্ঘ্যের একটি পরিষ্কার সমতলক্ষেত্রে ভলিবল খেলা হয়। এই সমতল জায়গাটির মাঝামাঝি একটি সেন্টার লাইন কেটে ভাগ করা হয়। এই সেন্টার লাইন বরাবর একটি জাল বা নেট উঁচু করে টাঙানো থাকে। এই নেটের উচ্চতা হয় পুরুষদের জন্যে ২.২৩ মিটার, মহিলাদের জন্য ২.২৪ মিটার এবং জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যে ২.১৩ মিটার। উচ্চতাটি মাপা হয় নেটের সর্বোচ্চ প্রান্ত থেকে নিচের ভূমি সমতল পর্যন্ত। সার্ভিস অঞ্চল নির্দিষ্ট থাকে কোর্টের প্রান্তিক লাইনের ডানদিকে $\frac{১}{৩}$ পরিমাণ স্থান জুড়ে। সার্ভিস শুরু হয় এই স্থানটির ভেতর বা বাহির থেকে।

ভলিবল খেলা হয় দুটি টিমের মধ্যে। প্রতি টিমে থাকে ছয়জন করে খেলোয়াড়। এর মধ্যে নেটের কাছাকাছি এবং নেটের দিকে মুখ করে ফরওয়ার্ড অঞ্চলে থাকে ৩ জন এবং ব্যাককোর্ট বা পেছনের দিকে থাকে বাকি ৩ জন। সার্ভিং টিমের রাইট ব্যাক সার্ভিং অঞ্চল থেকে হাতের সাহায্যে বলে আঘাত করে বলটি নেটের উপর দিয়ে বিপক্ষদলের অঞ্চলে ছুড়ে দিয়ে খেলা শুরু করেন। বলের মাপ হয় প্রায় ২২ সে.মি. ব্যাসের। বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা বলটি গ্রহণ করে আবার সেটি অপর দলের অঞ্চলে ফেরত পাঠায়। একটি টিমের যে-কোনো খেলোয়াড় মাত্র ৩ বার হাত বা মুষ্টির আঘাতে বিপক্ষ-অঞ্চলে বলটি ছুঁড়তে পারেন। কোনো খেলোয়াড় খেলা চলাকালীন বলটি ধরে রাখতে পারবে না বা অপরপক্ষের অঞ্চলে যেতে বা নেট স্পর্শ করতে পারবে না। বলটি খেলা চলাকালীন সময়ে কোনোমতেই মাটি স্পর্শ করবে না বা একই খেলোয়াড় পর পর দুবার বলটি ছুঁতে পারবে না। যিনি সার্ভ করেন, যতক্ষণ-না তাঁর টিম খেলায় কোনো ভুল করছেন বা খেলা শেষ

করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সার্ভ করে যাবেন। সার্ভিস পরিবর্তন হলে প্রতিপক্ষ দল সার্ভিস করার অধিকারী হবেন। রিসিভিং টিম কোনো ভুল বা ফাউল করলে—যেমন, খেলা চলাকালীন সময়ে বল মাঠের বাইরে চলে গেলে বা বল ফেরত পাঠাতে ব্যর্থ হলে সার্ভিং পয়েন্ট লাভ করবেন। ভলিবল খেলার জন্যে প্রয়োজন অল্প সরঞ্জাম ও খেলার উপযুক্ত মাঠ। 'সাইড আউট' ঘোষণার সময় কোনো পয়েন্ট দেয়া হয় না। খেলা নষ্ট না-হলে একটি সফল খেলার জন্যে এক পয়েন্ট যোগ হয়।

যে-টিম প্রথমেই ১৫ পয়েন্ট স্কোর করে বা Ball in play-র আট মিনিটের মধ্যে বেশিরভাগ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে তারাই বিজয়ী হয়। অবশ্য বিজয়ী দুই বা আরও পয়েন্টে এগিয়ে থাকলে তারাই বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়। তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি খেলায় জয়ী হলে—সেই টিম বিজয়ী ঘোষিত হয়।

ভলিবল খেলাটি কে প্রচলন করেছিলেন?

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ম্যাসাচুসেটসের হলিওক (Holyoke) শহরের Young Men's Christian Association (YMCA)-এর ফিজিক্যাল ডিরেক্টর Willian G. Morgan প্রথম এই খেলাটির উদ্ভাবন করেন। তিনি অবশ্য খেলাটির নাম দেন মিন্টোনেট (Mintoneette)। পরে Spring Field College-এর একজন অধ্যাপক এ-খেলায় বলটি মাটিতে না-ঠেকিয়ে (Volley) বিপক্ষ ক্ষেত্রে ফেরত পাঠানোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে নাম দেন ভলিবল (Volley Bell)। খেলার নিয়ম-কানুনগুলো প্রথমে মরগ্যান সাহেবই ঠিক করেছিলেন এবং এটি ১৮৯৭-এ উত্তর-আমেরিকার Athletic League of the Men's Christian Association-এর সরকারি হ্যান্ডবুকে ছাপান হয়। ভলিবল খেলা খুব দ্রুত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, খেলাধুলার জগতে, শিল্প-কারখানার খেলাধুলার বিভাগে, সামরিক বিভাগের সৈন্যদের মধ্যে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠনের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। অন্যান্য দেশেও এটি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯১৬ সালে YMCA এবং National Collegiate Athletic Association (NCAA) যৌথভাবে আইন-কানুনগুলো প্রকাশ করে। The United States Voley Ball Association (USVBA) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভলিবল খেলার নিয়ম-নির্ধারক পরিচালন সংস্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালে প্যারিসে The International Volley Ball Federation গঠিত হয়। USVBA ও অন্যান্য আরও ১২জন সদস্য নিয়ে এটির কর্মসমিতি গঠিত হয়। ফ্রান্সের পল লিবো (Paul Libaud)-এর সভাপতিত্বে এবং তাঁর সফল পরিচালনায় ফেডারেশনের সদস্য-দেশের সংখ্যা ১৯৭০ সালের মধ্যে একশতেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

এই আন্তর্জাতিক ফেডারেশন ১৯৪৯ এবং ১৯৫২ সালে যথাক্রমে পুরুষদের এবং মহিলাদের জন্যে বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে আয়োজিত অলিম্পিক গেমস-এ প্রথম এই খেলাটি আয়োজিত হয়। এরপর থেকে প্রতিটি অলিম্পিকেই ভলিবল খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়।

অমরনাথ রায়

আমাদের দাঁত, তার গঠন ও যত্ন

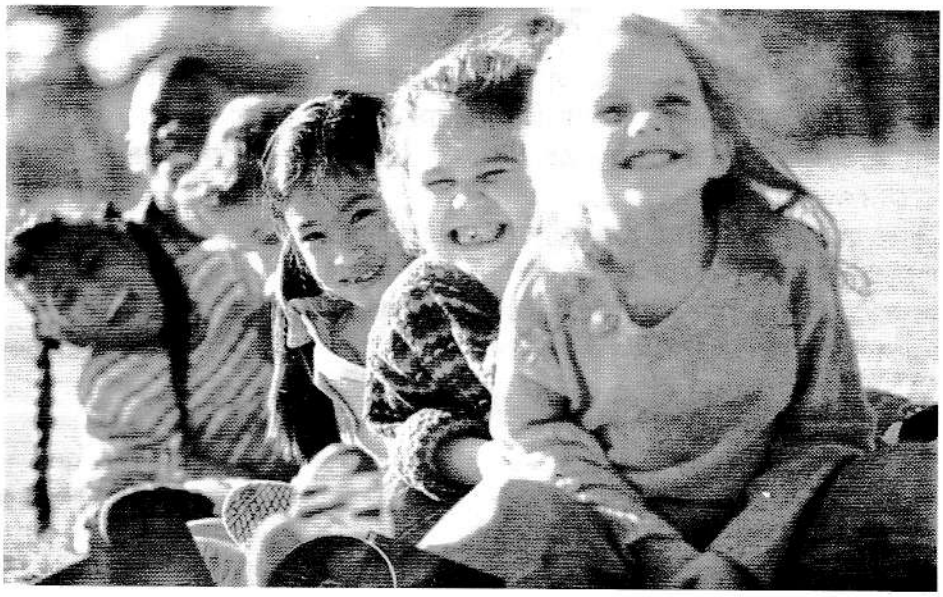

সুস্থ সবল মাড়ি ও দাঁত হল আমাদের সার্বিক সুস্থতার এক জরুরি অঙ্গ। দাঁতকে অবহেলা করলে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তাই ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিলে, দেখবে ওরাও তোমার খেয়াল রাখবে।

এবার দাঁতের গঠনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। হাতির দাঁতের মতো শুভ্র ও মোলায়েম 'ডেন্টিন' নামক একটি পদার্থ দ্বারা দাঁতের দ্বিতীয় স্তরটি গঠিত হয়। 'এনামেল' আমাদের শরীরের সবচেয়ে শক্ত টিস্যু এবং এটি আমাদের দাঁতের বাইরের স্তরটি গঠন করে। ডেন্টিন এনামেলের থেকেও নরম পদার্থ।

মাড়ি হল প্রবালের মতো গোলাপি তন্তুপূর্ণ টিস্যু। এটি দাঁত এবং দাঁতের গোড়া ঢেকে রাখে, এছাড়া মাড়ি দাঁতের নিচের হাড়টিকেও ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি চিবোনোর সময়কার চাপ সহ্য করে।

হাড়ের মতো দেখতে 'সিমেন্টাম' হল একটি পাতলা স্তরের টিস্যু, যা দাঁতের গোড়াকে সুরক্ষিত রাখে। দাঁতের স্পর্শ, ব্যথা ইত্যাদির অনুভূতির বার্তা মস্তিষ্কে পাঠায় নার্ভ বা স্নায়ু। এটি দড়ির মতো দেখতে একটি তন্তুযুক্ত জিনিস।

'মজ্জা' হল দাঁতের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ অংশ। এতে আছে স্নায়ু ও রক্তবাহী শিরা। দাঁতের গোড়া মাড়ির নিচে লুকিয়ে থাকে। একটি দাঁতের একটি, দুটি অথবা তিনটি গোড়াও থাকতে পারে। এতে দাঁতের গোড়ার নালী থাকে এবং এটি মজ্জাকে ধারণ করে।

এবারে আসা যাক দাঁতের প্রকারভেদের কথায়। খাবারকে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে ফেলে যে-দাঁত, তার নাম 'ইনসিজার্স'। খাবার ছেঁড়ার জন্যে তীক্ষ্ণ ও ধারালো দাঁতের নাম 'ক্যানাইনস'। খাবারের টুকরোগুলোকে ভাঙার জন্যে যে-দাঁত আছে, তার নাম 'প্রিমোলার্স'। 'মোলার্স' নামক দাঁতের কাজ হল—আরো ভালোভাবে হজমের জন্যে খাবারকে পিষে ফেলা।

ছেলেবেলায় একটি শিশুর মুখে কুড়িটি দুধ-দাঁত থাকে। এর মধ্যে আটটি ইনসিজার্স, চারটি ক্যানাইনস, আটটি মোলার্স সব মিলিয়ে কুড়িটি দুধ-দাঁত বা প্রাথমিক দাঁত থাকে।

ছয় থেকে এগারো বছর বয়সের মধ্যে ঐ দুধ-দাঁতগুলো সব পড়ে যায় এবং তার জায়গায় স্থায়ী বা দ্বিতীয় পর্যায়ের দাঁত গজায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মুখে বত্রিশটি স্থায়ী দাঁত থাকে। এরমধ্যে আটটি ইনসিজার্স, চারটি ক্যানাইনস, আটটি প্রিমোলার্স এবং বারোটি মোলার্স দাঁত। শেষের চারটি মোলার্স দাঁতকে আক্কেল-দাঁত বলে। এই আক্কেল-দাঁতগুলো কখনও কিশোর বয়সে, কখনও-বা পূর্ণবয়সেও গজায়।

'প্লাক' হল আঠালো ও প্রায়-অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুর আস্তরণ, যা দাঁত ও মাড়ির উপর ক্রমাগত জমতে থাকে। যদি কেউ খাওয়ার পর নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না-করে, তাহলে এটি খাবারের কণায় উপস্থিত চিনির সঙ্গে মিশে অ্যাসিড উৎপন্ন করে যা দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর। প্লাক দাঁতের এনামেলে হামলা করে এবং তার ফলে এনামেল ক্ষয়ে দাঁতে ক্যাভিটি বা গর্ত সৃষ্টি হয়। একবার ক্যাভিটি সৃষ্টি হলে তা পরবর্তী স্তর ডেন্টিনে ছড়িয়ে পড়ে। যদি দাঁতের ডাক্তারকে দিয়ে ক্যাভিটি ভরিয়ে নেওয়া যায় তবে এই ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

যদি ডেন্টিনের পর্যায়তেই ক্যাভিটি ভরানো না-হয়, তাহলে ক্ষয়টি আরও গভীরে অর্থাৎ মজ্জায় ছড়িয়ে যায়। তখন দাঁতে খুব ব্যথা হতে পারে। শেষপর্যন্ত এই ক্ষয় দাঁতের গোড়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি ফোড়ার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায়, কেবল গোড়ার নালীর চিকিৎসা করেই দাঁতটিকে বাঁচানো যেতে পারে। অন্যথায় দাঁতটি তুলে ফেলাই ভালো।

দাঁতকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে নিচের চারটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে অবশ্যই।

ভিটামিন ও খনিজপদার্থ সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

দুপুরে ও রাতে খাওয়ার মাঝখানে মিষ্টি বা চটচটে খাবার খাওয়া চলবে না।

প্লাক তুলে ফেলার জন্য প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করতে হবে।

বছরের কমপক্ষে একবার অথবা দুবার দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে দাঁত পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

হাস্যকৌতুক

প্রথম বন্ধু— জানিস, আমি আর নানা একই দিনে...একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয় বন্ধু— দূর, তা কি কখনও হয়?

প্রথম বন্ধু— কেন হবে না। মা যে আমায় বাবা বলে ডাকে।

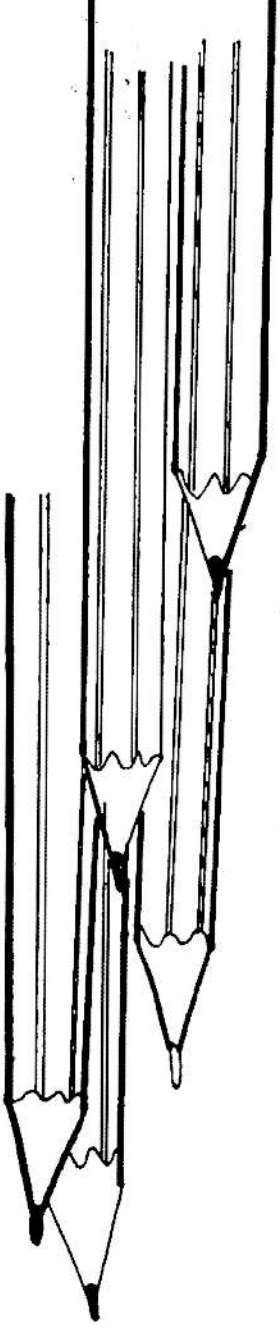

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

অধ্যবসায়

পাছে কোনো বিঘ্ন হয়, এই ভাবি মনে
কার্যে নাহি হাত দেয় যত নিচ জনে।
একবার বাধা পেলে মধ্য যে জন,
হতাশ হইয়া করে চেষ্টা বিসর্জন।
কোনো কাজ ধরে যদি উত্তম যে জন,
হউক সহস্র বিঘ্ন ছাড়ে না কখন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ডমরুধরের কুমির শিকার

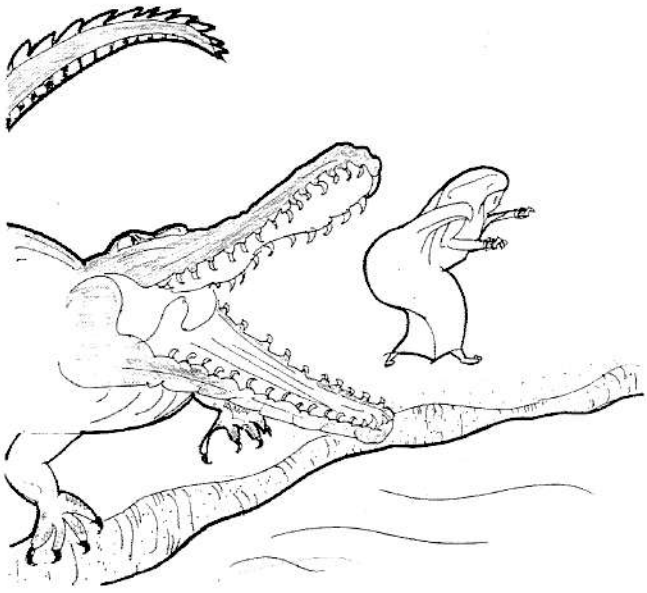

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন—শুনিয়াছি যে, সুন্দরবনে নদীনালায় অনেক কুমির আছে। তোমার আবাদে কুমির কীরূপ?

ডমরুধর বলিলেন—কুমির! আমার আবাদের কাছে যে-নদী আছে, কুমিরে তাহা পরিপূর্ণ। খেজুরগাছের মতো নদীতে তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়। অথবা কিনারায় উঠিয়া পালে পালে তাহারা রৌদ্র পোহায়। গরুটা, মানুষটা, ভেড়াটা, ছাগলটা বাগে পাইলেই লইয়া যায়। কিন্তু এসব কুমিরকে আমরা গ্রাহ্য করি না। একবার আমার আবাদের নিকট এক বিষম কুমিরের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার দেহ বৃহৎ, তালগাছের ন্যায় বড়, ইহার উদর এই দালানটির মতো। অন্যান্য কুমির জীবজন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এ কুমিরটা আস্ত গরু, আস্ত মহিষ গিলিয়া ফেলিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁধ দিয়া মানুষ ও গরু-বাছুর লইয়া যাইত। লাঙ্গুলে জল আনিয়া দেয়াল ভিজাইয়া গর্ত করিত। ইহার জ্বালায় নিকটস্থ আবাদের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রজাগণ পাছে আবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করে আমাদের সেই ভয় হইল। তাহার পর লাঙ্গুলের আঘাতে নৌকা ডুবাইয়া আরোহীদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে-নিমিত্ত ও-পথ দিয়া নৌকায় যাতায়াত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই ভয়ানক কুমিরের হাত হইতে কীরূপে নিষ্কৃতি পাই এইরূপ ভাবিতেছি। এমন সময় আমার আবাদের নিকট একখানি নৌকা ডুবাইয়া তাহার আরোহীদিগকে একে-একে আমাদের সমক্ষে সে

গিলিয়া ফেলিল। এই নৌকায় এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে সপরিবারে পূর্বদেশে যাইতেছিলেন। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার গৃহিণীর সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তোমরা জানো যে কুমিরের পেটে মাংস হজম হয়, গহনা পরিপাক হয় না। কুমির যখন সেই স্ত্রীলোককে গিলিয়া ফেলিল তখন আমার মনে এই চিন্তা উদয় হইল—চিরকাল আমি কপালে-পুরুষ। যদি এই কুমিরটাকে আমি মারিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পেট চিরিয়া ওই গহনাগুলি বাহির করিব। অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। বড় একটি জাহাজের নোঙ্গর কিনিয়া উকো ঘষিয়া তাহাতে ধার করিলাম। তাহার পর, যে-কাছিতে মানোয়ারি জাহাজ বাঁধা থাকে, সেইরূপ এক কাছি ক্রয় করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া আমি আবাদে ফিরিয়া আসিলাম।

আবাদে আসিয়া শুনিলাম যে, কুমির আর-একটা মানুষ খাইয়াছে। চারদিন পূর্বে এক সাঁওতালনি বুড়ি বেগুন-মাথায় করিয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল। সে যেই নদীর ধারে গিয়াছে, আর কুমির তাহাকে ধরিয়া বেগুনের ঝুড়ির সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে সাঁওতাল-প্রজাগণ খেপিয়া উঠিয়াছে। বলিতেছে যে, আবাদ ছাড়িয়া তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে।

আবাদে আসিয়া নোঙ্গরটিকে আমি বড়শি করিলাম। তাহাতে জাহাজের কাছি বাঁধিয়া দিলাম। নোঙ্গরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে এক মহিষের বাছুর গাঁথিয়া নদীর জলের নিকট বাঁধিয়া দিলাম। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সে গাঁ-গাঁ শব্দে ডাকিতে লাগিল। তাহার ডাক শুনিয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে সেই প্রকাণ্ড কুমির আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার লেজের ঝাপটে পর্বতপ্রমাণ এক ঢেউ উঠিল। সেই ঢেউয়ে বাছুরটি ডুবিয়া গেল। তখন আমরা আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরক্ষণেই কাছিতে টান পড়িল। তখন আমরা বুঝিলাম যে নোঙ্গরবিদ্ধ বাছুরকে কুমির গিলিয়াছে। বড়শির ন্যায় নোঙ্গর কুমিরের মুখে বিঁধিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি পঞ্চাশজন লোক আসিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। ভাগ্যে গাছে পাক দিয়া রাখিয়াছিলাম। তা না হইলে কুমিরের বলে এই পঞ্চাশজন লোককে নদীতে গিয়া পড়িতে হইত।

আমরা সেই রাক্ষস-কুমিরকে বড়শিতে গাঁথিয়াছি। ওই কথা শুনিয়া চারদিকের আবাদ হইতে অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল। প্রায় পাঁচশত লোক সেই রশি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দারুণ আসুরিক বলে কুমির সেই পাঁচশত লোকের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কখনও আমাদের ভয় হইল যে, সে-জাহাজের দড়া-বা ছিঁড়িয়া যায়। কখনও ভয় হইল, গাছ উৎপাটিত হইয়া নদীতে গিয়া-বা পড়ে। নিশ্চয় একটা-না-একটা বিভ্রাট ঘটিত যদি-না সাঁওতালগণ কুমিরের মস্তকে ক্রমাগত তীর বর্ষণ করিত, যদি-না নিকটস্থ দুইটি আবাদের লোক বন্দুক আনিয়া কুমিরের মাথায় গুলি করিত। তীর ও গুলি খাইয়া কুমির মাঝে-মাঝে জলমগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নিশ্বাস লইবার জন্য পুনরায় তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে হইল। সেই সময়ে লোকে তীর ও গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। কুমিরের রক্তে নদীর জল বহুদূর পর্যন্ত লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কুমিরের সহিত আমাদের এইরূপ যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃকালে কুমির হীনবল হইয়া পড়িল। বেলা নয়টার সময়ে তাহার মৃতদেহ জলে ডুবিয়া গেল। তখন অতিকষ্টে তাহাকে আমরা টানিয়া উপরে তুলিলাম।

বড়-বড় ছোরা, বড়-বড় কাস্তে আনিয়া তাহার পেট চিরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে-রাক্ষস-কুমিরের পেট অতি কঠিন ছিল। আমাদের সমুদয় অস্ত্র ভাঙিয়া গেল। অবশেষে করাতি আনাইয়া করাতের দ্বারা তাহার উদর কাটাইলাম। কিন্তু পেট চিরিয়া তাহার পেটের ভিতর যাহা দেখিলাম তাহা দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির!

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—কী দেখিলে?

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন—কী দেখিলে?

ডমরুধর বলিলেন—বলিব কী ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমিরের পেটের ভিতর দেখি যে, সেই সাঁওতাল বুড়ি চারদিন পূর্বে কুমির যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সে পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছে।

শঙ্কর ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কুমিরের পেটের ভিতর সেই ঝুড়ির উপর সে বেগুন বেচিতেছিল!

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল? কুমিরের পেটের ভিতরে সে খরিদ্দার পাইল কোথা?

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন—তোমার এক কথা! কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল, সে-খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না। সমুদয় গহনাগুলি সে নিজের গায়ে পরিয়াছিল তাহা দেখিয়াই আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম—ও গহনা আমার! অনেক টাকা খরচ করিয়া আমি কুমির ধরিয়াছি, ও গহনা খুলিয়া দে।

কেঁউমেউ করিয়া বুড়ি আমার সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার পুত্রগণ ও তাহার জাতিভাইগণ কাঁড়-বাঁশ ও লাঠিসোঁটা লইয়া আমাকে মারিতে দৌড়িল। আমার প্রজাগণ কেহই আমার পক্ষ হইল না। সুতরাং আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

সাঁওতালগণ সেই বুড়িকে ঘরে লইয়া গেল। দিনকয়েক শূকর মারিয়া ও মদ খাইয়া তাহারা আমোদপ্রমোদ করিল। পূর্বদেশীয় সে-ভদ্রমহিলার একখানি গহনাও আমি পাইলাম না। মনে মনে

ভাবিলাম যে, কপালে-পুরুষের ভাগ্যও সকল সময় প্রসন্ন হয় না।

লম্বোদর বলিলেন—এত আজগুবি গল্প তুমি কোথায় পাও বল দেখি?

ডমরুধর বলিলেন—এতক্ষণ হাঁ করিয়া এক-মনে এক-ধ্যানে গল্পটি শুনিতেছিলে। যেই হইয়া গেল, তাই এখন বলিতেছ যে, আজগুবি গল্প। কলির ধর্ম বটে!

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কুমিরের গল্প-যে সত্য, তাহার কোনো প্রমাণ আছে?

ডমরুধর উত্তর করিলেন—প্রমাণ? নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কোমরের ব্যথার জন্য এই দেখ সেই কুমিরের দাঁত আমি পরিয়া আছি।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—সে-কুমির যদি তালগাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তাহার দাঁত এত ছোট কেন? ঠিক অন্য কুমিরের দাঁতের মতো কেন?

ডমরুধর উত্তর করিলেন—অনেক মানুষ খাইয়া সে-কুমিরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।

বই আবিষ্কার

যে-বই আমরা আজ পড়ি সে-অবস্থায় এর পৌঁছুতে প্রায় হাজার বছর সময় লেগেছে। পৃথিবীর প্রথম বই দেখতে যেমন ছিল তা দেখে হয়তো কেউ তাকে বই-ই বলতে চাইবে না।

কয়েক হাজার বছর আগে ব্যাবলনীয় ও আসিরীয়রা একধরনের মাটির ফলক তৈরি করত। এই মাটির ফলকের উপর তারা বিভিন্ন নথি ও লেখা, যা সংরক্ষণ আবশ্যক তা খোদাই করে রাখত। মাটির এই ফলকে ভেজা-অবস্থায় তারা তীক্ষ্ণ সরু কাঠি দিয়ে 'কিউনিফর্ম' লিখত খোদাই করে। এটিকে স্থায়ী করতে তারা চুলার আগুনে পুড়িয়ে একে শক্ত করে ফেলত। কখনো কোনো নথি বা বিষয় এত বড় হত যে কয়েকটা মৃৎফলক প্রয়োজন হত। এরকম কয়েকটি ফলককে বৃহৎভাবে বই বলে গণ্য করা যেতে পারে।

প্রাচীন মিশরীয়রা আধুনিক বইয়ের বেশ কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছিল। তারা 'প্যাপিরাস' নামক তৃণজাতীয় গাছের পাতা থেকে একধরনের কাগজ তৈরি করে। এই কাগজগুলো আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে লম্বা করে তার উপর প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে রাখত। এরপর গোলাকৃতি হাড় বা কাঠের টুকরার গায়ে এই হলদে কাগজটি পেঁচিয়ে তা সংরক্ষণ করত।

ভূষা মিশ্রিত পানি কালি হিসেবে ব্যবহার করে মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিফিক লিপি বা চিত্রলিপির সাহায্যে বহু কবিতা, গল্প ও নথি লিখে রাখত। এই গোলাকৃতি বইগুলো বহন করা সহজ ছিল না বলে কখনো কোনো লেখার কাজ আলাদা পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হত। এই আলাদা পৃষ্ঠাগুলো সুতলি দিয়ে বাঁধা হত। একে বই বলা যায়।

অন্যান্য সভ্যতা, যেমন : গ্রিক, রোমান এরাও কাগজে বা কাপড়ে লিখিত ভাষ্য কাঠের চাকতিতে পেঁচিয়ে রাখত।

গুটেনবার্গের প্রিন্টিং প্রেসে চলন্ত ধাতুর টাইপ ব্যবহৃত হত। আর এই প্রেসে যে প্রথম বইটি ছাপা হয় তা-ই প্রথম আধুনিক বই। এটি হল বিখ্যাত গুটেনবার্গ বাইবেল (Gutenberg Bible)—প্রকাশিত হয় ১৪৫৩ থেকে ১৪৫৭-এর মধ্যে।

মজার এক উদ্ভিদ

ব্যাঙের ছাতা। নামটার মধ্যে কেমন যেন একটা রূপক আছে। ছেলেবেলায় বইয়ে আমরা ছত্রাকের নিচে গোল-গোল চোখ বের করে ব্যাঙকে বসে থাকতে দেখেছি। আসলে এই ছত্রাক বা ছাতার সঙ্গে ব্যাঙের আদৌ কোনো যোগাযোগ নেই। ইংরেজরা ছত্রাককে বলতেন, টোডস্টুল। তাঁরা ছত্রাক খেতে ভীষণ ভয় পেতেন। এর কারণও অবশ্য আছে। নিউইয়র্কের পিকস্কিল অঞ্চলে ট্রিনিটি এপিস্কোপাল চার্চ। সেখানে খোদাই করা আছে এক মর্মান্তিক ঘটনার কথা। পঁয়ত্রিশ বছরের উইলিয়ম গ্লাউড এবং তাঁর স্ত্রী চৌত্রিশ বছরের সারা ছত্রাকের বিষক্রিয়ায় মারা যান ১৮৩৮ সালের দোসরা অক্টোবর। তাঁদের চার বছরের ছেলে চার্লসও এই মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হয়। তারা আসলে ইংল্যান্ডের আদি বাসিন্দা। আমেরিকায় ছত্রাকের বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর এটাই প্রথম লিখিত নজির। সাধারণভাবে ছত্রাককে বলে 'মাশরুম'।

ছত্রাক আসলে কী? এরা একধরনের উদ্ভিদ। তবে গাছের মতো ছত্রাকের শিকড় নেই। নেই ফুল, বীজ বা পাতা। এদের আকৃতির কোনো বিশেষ চেহারা নেই। বাসি পাউরুটির গায়ে সবুজ রঙের ছোপ। অত্যন্ত খুদে, চোখে প্রায় না-দেখতে পাওয়া দানার আকারের ছত্রাক; আবার বড় গাছের গুঁড়িতে তিন ফুট চওড়া ধাপ তৈরি করা ব্রাকেট মাশরুম—সবই ছত্রাক। বেশিরভাগ ছত্রাকের ছাতা আছে। এই অংশটুকু তার ফুল। মাটির নিচে বা গাছের গুঁড়ির মধ্যে বসানো আছে অসংখ্য সূক্ষ্ম শিকড়ের মতো জালি। এই জালি অন্য গাছ বা পচা মাটির ঘাসের ভেতর থেকে নিংড়ে আনে রস—পরগাছা জীবনের রসদ। বাইরে বেরিয়ে থাকা ছাতা আসলে বংশবৃদ্ধির চাবিকাঠি। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ বীজ। ইংরেজিতে বলে 'স্পোর'।

'অ্যামানিটা' প্রজাতির বীজ এত ছোট যে, মটরদানার আয়তনে প্রায় দশ হাজার স্পোর ধরে যেতে পারে। প্রাগ মিউজিয়ামে রাখা আছে একটি আট পাউন্ড ওজনের মাশরুম। জনৈক চেক-বিজ্ঞানী হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, তার ভেতর ১.৫ লক্ষ কোটি স্পোর লুকিয়ে আছে। এদের খুব অল্পই অবশ্য মাশরুমের জন্ম দেয়। বৃষ্টি, ঝড়, জোলো হাওয়ায় বাতাসের আর্দ্রতার পরিবর্তন হলে ছত্রাকের বীজগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের গতি খুব শ্লথ। অনেকটা ধীরগতির ছবির মতো। একটা সাধারণ আকৃতির স্পোর এক ফুট পথ যেতে প্রায় দশ মিনিট সময় নেয়।

বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে উপযুক্ত পরিবেশ, জল ও খাবারের প্রাচুর্য পেলে স্পোরেরা বাড়তে থাকে। প্রথমে এরা থাকে গোলাকার। তারপর সেই গোল ক্রমশ লম্বাটে হয়ে মাটি বা গাছের গায়ে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে জালের সৃষ্টি করে। একে বলে মাইসেলিয়াম। এক বীজের শাখা অন্য বীজের শাখার মুখোমুখি হলে এরা জুড়ে যায়। দ্বিতীয় পর্বের মাইসেলিয়াম জন্ম নেয় এই জোড় থেকে। ভারি বর্ষা হলে জোড়ের মুখে গোলাকৃতি বল দেখা দেয়। তারপর সেই বলসমেত মাইসেলিয়াম প্রবল গতিতে বড় হয়ে ওঠে। মাটি ফুঁড়ে বা গাছের গুঁড়ি ভেদ করে হঠাৎই মাথাচাড়া দেয় সজীব পূর্ণাঙ্গ মাশরুম।

আমাদের দেশে খাবার হিসেবে ছত্রাক পরিচিত হলেও তেমন জনপ্রিয় নয়। তবে জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, পোল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং নানা জাতির বাসভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাশরুমের খুব কদর। পশ্চিমের দেশে অপেশাদার ছত্রাক-সংগ্রাহকদের প্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। নাম—বোস্টন মাইকোলজিক্যাল ক্লাব। সংক্ষেপে বিএমসি। মাশরুমের উপাদেয় রন্ধনপ্রণালী এবং তার উপকারিতা সম্পর্কে নিয়মিত ভাষণ ও সভার আয়োজন ছাড়াও এই ক্লাবের সদস্যরা ব্যাঙের ছাতার স্যুপ থেকে আরম্ভ করে মিষ্টি অবধি পরিবেশন করতেন বিভিন্ন অঞ্চলে। জাপানিদের প্রিয় মাতসুতেক হল পাইন মাশরুম। ইতালিয়ানদের পছন্দ বোরোউইক, স্টেইনপিলজ, পোরোসিনো ইত্যাদি। ইরোক্যুইস জাতির আদিবাসী আমেরিকানরা মাশরুমের স্বাদের সঙ্গে সুস্বাদু মাংসের তুলনা করত।

সব ছত্রাক খাওয়া যায় না। কোনো কোনোটায় এমন বিষ যে, দাঁতে কাটলে অবধারিত মৃত্যু। তাই খাওয়ার উপযোগী মাশরুম চেনা খুব জরুরি। জনশ্রুতি আছে, বিষাক্ত ছত্রাক ফোটানো জলে কালো হয় না। কিছু ছত্রাক আবার নেশা ধরায়। খাওয়ার আধ কি একঘণ্টার মধ্যে কখনও নিজেকে খুব সুখী মনে হয়, কখনও-বা অজানা দুঃখে লোকে কেঁদে আকুল। সে-সময় চোখ বুজলে ধারালো ফলা, চোখ ধাঁধানো রং, এবং নানা কল্পনার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে রং আরও রকমারি হয়। মাথার ভেতর যেন আতশবাজির জলসা বসে। স্বপ্নের দৃশ্যগুলো খুব তাড়াতাড়ি বদলায়। কিন্তু তৃতীয় ঘণ্টায় সব জৌলুস শেষ। চমৎকার ছবিগুলো ক্রমশ হারিয়ে যায়। গা-গোলানো বমি, এমনকি প্যারালিসিস হয়ে অঙ্গহানিতে এই নেশার চূড়ান্ত পরিণতি হতে পারে।

অতএব সাবধান। ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম উপাদেয় হলেও বাগানের আনাচে-কানাচে যেসব ছত্রাক জন্মায়, ভালো করে কুল-ঠিকুজি না-জেনে তা কখনোই খাওয়া উচিত নয়। তাতে জীবন সংশয় হতে পারে। বাজার থেকে বাছাই-করা মাশরুম কিনে স্বাদ মেটানো বরং চমৎকার চিন্তা।

ছত্রাক একধরনের উদ্ভিদ। এই ছত্রাক নিয়ে দেশ-বিদেশে নানা গল্প চালু আছে। ষোড়শ শতকে ধারণা ছিল, বজ্রপাতে মাটি ফুঁড়ে ব্যাঙের ছাতা গজায়। প্রাচীন গ্রিসে বলা হত, ঝড়বাদলের রাতে মাটির গায়ে ফসকুড়ি ওঠে। সেটাই ব্যাঙের ছাতা। এত দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্যই প্রচলিত আছে বিখ্যাত প্রবাদ—ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা!

পেন্সিল আবিষ্কার

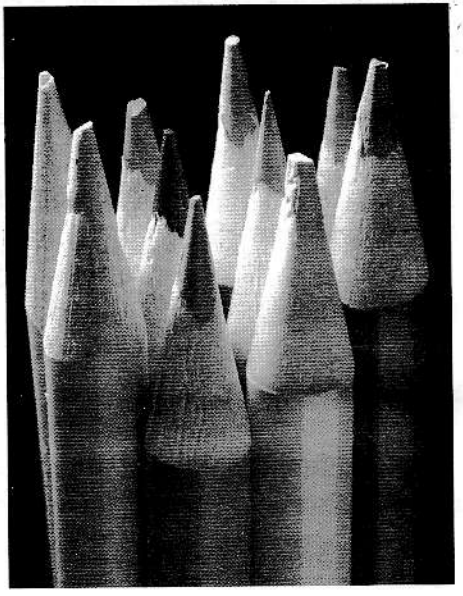

পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের কাছে পেন্সিল একটি অপরিহার্য বস্তু। তোমরা যে পেন্সিল ব্যবহার কর, তার নাম লেড পেন্সিল। লেড মানে সিসা। আর পেন্সিল কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ পেনসিলিয়াম থেকে। পেনসিলিয়াম শব্দের মানে হচ্ছে—ছোট্ট লেজ। অর্থের দিক থেকে বিবেচনা করলে এ-কালের লেড পেন্সিল নামের কোনোই সার্থকতা নেই। কারণ এ-কালের লেড-পেন্সিলে যেমন লেড বা সিসা নেই, তেমনি নেই পেনসিলিয়াম বা ছোট্ট লেজও। তবে এর এমন নাম হল কেন, তা নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে? তবে শোনো সে-কথা।

অনেক-অনেক দিন আগে গ্রিক ও রোমানরা লিখবার জন্যে ও ছবি আঁকবার জন্যে সিসা নামক ধাতু ব্যবহার করতেন। শাদা কাগজে সিসা দিয়ে দাগ কাটলে দাগটা ফিকে কালো রঙের হত। সিসার এই ব্যবহারের কথা স্মরণ করেই পেন্সিলের আগে লেড কথাটি ব্যবহার করা হত এবং এখনও হয়ে থাকে। কারণ সিসার ইংরেজি নাম 'লেড'।

সেকালে লেখার জন্যে আরেকটি জিনিস ব্যবহৃত হত। সেটি কী জানো তো?—ছোট্ট একটি কাঠি। তার একপ্রান্তে লাগানো হত কোনো পশুর গায়ের বা লেজের নরম একটুখানি লোম। এ-কালের তুলির মতো অনেকটা দেখতে। এই তুলির ছোট্ট লোমশ লেজটিকে বলা হত, পেনসিলিয়াম। এই পেনসিলিয়াম শব্দটি থেকেই পেন্সিল কথাটির উদ্ভব হয়েছে। আর সেই নাম আজও চলছে।

তোমরা তো জানো, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সব জিনিসেরই পরিবর্তন ঘটে থাকে। পেন্সিলের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজকাল লেড বা সিসা দিয়ে পেন্সিলের সিস তৈরি হয় না। আর পেন্সিলের ডগা থেকে সেই-যে পশুচর্মের ছোট্ট লেজ—তা-ও অন্তর্হিত হয়েছে।

একালের পেন্সিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। এই পেন্সিল তো তোমরা প্রতিদিনই ব্যবহার করে থাক। কাজেই এর চেহারাটি কেমন তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

আধুনিক পেন্সিলের সূচনা হয়েছে অনেককাল আগে, সম্ভবত ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময় থেকে পেন্সিলের সিসে সিসার বদলে গ্রাফাইট-দণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। তখনকার পেন্সিলে কেবলমাত্র একটি গ্রাফাইট-দণ্ডই থাকত। তার উপরে কোনো আবরণ থাকত না।

গ্রাফাইট জিনিসটা হল কার্বনের একটি রূপভেদ। নরম ও পিচ্ছিল এই পদার্থটি দিয়ে লিখলে কাগজে কালচে দাগও পড়ত বটে তবে লেখা তেমন স্পষ্ট হত না। সেইজন্যে পেন্সিলের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়, আর সেই সংস্কারটি করেন নিকোলাস কোঁতে নামে এক ফরাসি কারিগর, ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি গ্রাফাইটের মিহি গুঁড়োর সঙ্গে একরকম মাটি মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত দণ্ড তৈরি করেন। সরু সেই দণ্ডই তখন থেকে পেন্সিলের সিস হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। তাতে কাগজে বেশ সুন্দর লেখা পড়তে থাকে।

পেন্সিলের সিসের গায়ে তখনও কিন্তু কাঠের আবরণ দেওয়া হয়নি। সেটা করা হয় আরও পরে—১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। উইলিয়ম মনরো ছিলেন একজন আমেরিকান কারিগর। তিনিই প্রথম পেন্সিলের সিসের উপর কাঠের আচ্ছাদন পরিয়ে পেন্সিলকে শুধু সুদৃশ্যই করেননি, পেন্সিল দিয়ে লেখা বা আঁকার কাজকে আরও সুবিধাজনক করে দেন।

তবেই দেখ, একটা আবিষ্কারকে সম্পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করতে কত বছর কেটে যায়, কত মানুষের বুদ্ধি ও কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয়!

তালগাছ এত লম্বা হয় কেন?

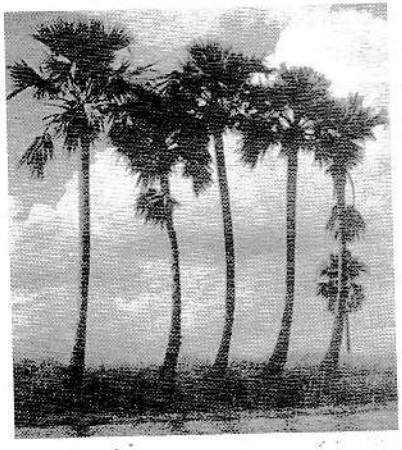

গাছের পাতায় যে খাবার তৈরি হয় তা পুষ্টি জোগায় গাছের যাবতীয় অংশ, অর্থাৎ মূল থেকে শুরু করে কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল-ফল সবকিছুকেই। যে-গাছের অনেক ডালপালা, সে-গাছের কাণ্ড লম্বায় বাড়ে কম, কারণ খাবারের বড় অংশটাই ব্যয় হয় ডালপালা, ফুল-ফলের চাহিদা মেটাতে। তালগাছের ডালপালা প্রায় নেই বললেই হয়। তালগাছের পাতা সবই মাথার উপরে এক জায়গায় ঝাঁক বেঁধে থাকে। সেই পাতায় যে-খাদ্য তৈরি হয় তার বেশিরভাগটাই কাণ্ডের বরাদ্দ। শাখা-প্রশাখা তৈরির জন্য যে-পরিমাণ পুষ্টির প্রয়োজন, সেটা কাণ্ডের ভাগে পড়ায় তা উপর দিয়ে বেড়ে চলে। এই কারণেই অন্যসব গাছের তুলনায় তালজাতীয় গাছ এত লম্বা হয়।

সাজেদুল করিম

এক ক্ষুদে অংকের ম্যাজিক

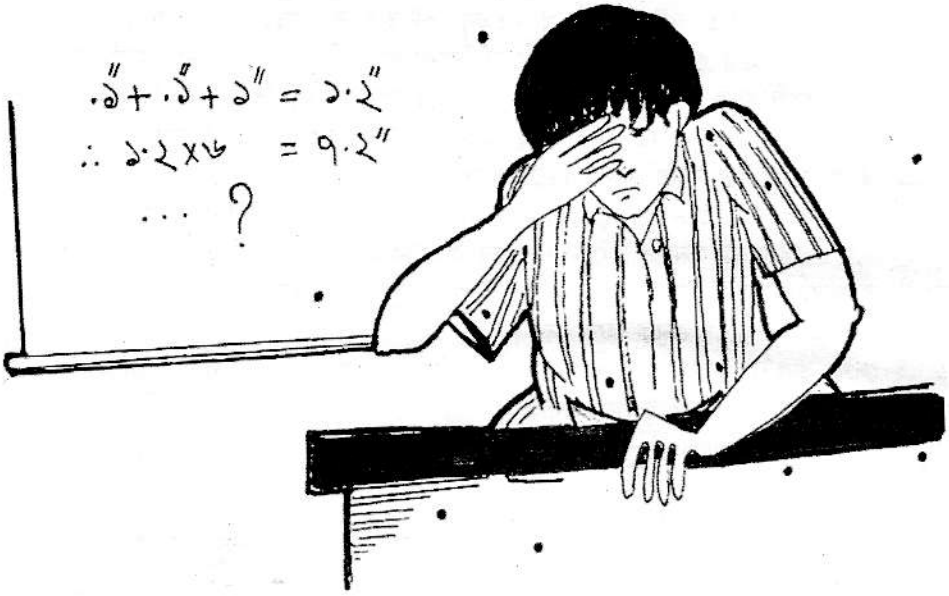

হাকিম হওয়া কী-যে শক্ত সে আমরা জেনেছিলাম আমাদের ক্লাস বন্ধু 'বিকেসিকে'র [পুরো নাম নাই-বা জানলে] কাছ থেকে। বিকেসিকে ছিল আঁকে তুখোড় এক ছেলে। কেবল তাই নয়, ডিটেকটিভি বুদ্ধিতেও মগজটা ছিল তার টইটম্বুর। পরবর্তীজীবনে সে একজন নামকরা হাকিম হয়েছিল এবং সরকারের ডিটেকটিভ বিভাগের বড়কর্তা হিসেবে শেষজীবনে অবসরগ্রহণ করেছিল। আঁকের সাথে ডিটেকটিভি মিলিয়ে সে কঠিন কঠিন প্রশ্নের সমাধান করত এবং এভাবে হাকিম হওয়ার পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু সব জানবার আগে তোমাদের একটুখানি পূর্ব-ইতিহাসও জেনে নিতে হয় যে।

যেহেতু ঘটনাটা সত্য, তোমাদেরকে এদেশের আগের যুগের হাকিম-নির্বাচনপদ্ধতির সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। পাকিস্তান আমলের সেই ইপিসিএস পরীক্ষার কথা তো শুনেছ। তারও আগের যুগে এরি নাম ছিল 'বি-সি-এস'। গ্রাজুয়েট না-হলে বি-সি-এস পরীক্ষায় কেউ বসতে পারত না। আর এ-পরীক্ষায় যাঁরা ভালো ফল করতেন তাঁরাই হতেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেকালে বাঙলাদেশের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। যেমন ধরো, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র অথবা স্বনামখ্যাত নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর। এত কঠিন পরীক্ষা বাঙলাদেশে আর বুঝি হত না। দেশের সেরা মেধাবী ছেলেরা এ-পরীক্ষায় যোগ দিতেন এবং প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করে হাকিম-ম্যাজিস্ট্রেট বনে যেতেন।

আচ্ছা, ভাবো দেখি একবার, এহেন পরীক্ষায় যদি ক্লাস থ্রি-ফোরের আঁক কষতে দেয়া হয় তবে কেমন মজা হয়? টুকটুক করে তোমরা আঁকগুলো কষে ফেলবে। মোটা মোটা নম্বর পাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাকিম-ম্যাজিস্ট্রেট বনে যাবে। নয় কি? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বি-সি-এস পরীক্ষায় যে-সব প্রশ্ন আসত, সেগুলো ছিল অসম্ভবরকম শক্ত, যেমন শক্ত নাকি ছিল হাকিম হওয়া।

কিন্তু একবার এক মজা হয়েছিল।—

সত্যিই একটা অঙ্ক এসেছিল একেবারে সোজা। অথচ ওই সোজা অঙ্কটাকে নিয়ে কত কাণ্ড-কীর্তিই-না হল। পরীক্ষার প্রশ্নটা আর কিছু নয়, ওটা ছিল একটা লাইব্রেরির অঙ্ক। কোনো এক লাইব্রেরির শেলফে পাশাপাশি সাজানো ছিল ছটা বই, যেমন পাশাপাশি সাজানো থাকে, তোমরা দেখে থাকবে যে-কোনো পুস্তকাগারে। এবং যেহেতু একই বই এর ছটা কপি, তাই প্রতিটি বই ছিল একই সাইজের। এবং ঐ সাইজের পরিমাপ ছিল নিম্নরূপ: প্রতিটি বই-এর দুটো কভারের প্রতিটি ছিল .১ ইঞ্চি পুরু; আর কভার ছাড়া পাতার অংশ ছিল ১ ইঞ্চি পুরু। একদিন লাইব্রেরিয়ান বই ঝাড়তে গিয়ে দেখতে পেলেন: একটা পোকা প্রথম বইয়ের প্রথম পাতা থেকে শুরু করে শেষ বইয়ের শেষ পাতা অবধি সোজা একটা ছিদ্র করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে,—ঐ ছিদ্রপথের দৈর্ঘ্য কতটুকু?

ব্যস। তোমরা তো মনে মনে হাসছ। ইস, এত সোজা এই হাকিম-ধরা-পরীক্ষা। এমন অঙ্ক যে একটা কচি খোকাও কষে দিতে পারে। সেবারকার বি-সি-এস পরীক্ষার্থীদের মনের ভাবখানাও ছিল তাই। চটপট তারা অঙ্কটা কষে ফেলল। প্রথমত একটা বই-এর মোট পুরুত্ব তারা বের করল = দুটো কভার+পাতা= .১″ + .১″ + ১″= ১.২″; কাজেই ছটা বই-এর মোট পুরুত্ব হবে ১.২″×৬ = ৭.২″; হ্যাঁ, তাই হবে।

এ থেকে যে বাদ দিতে হবে দুটো কভার, এ আর বুঝতে কারু বাকি রইল না। কারণ পোকাটা ছিদ্র করা শুরু করেছিল প্রথম বই-এর প্রথম পাতা থেকে (প্রথম মলাট থেকে নয়); কাজেই প্রথম মলাটটা বাদ গেল। আবার যেহেতু পোকাটা গিয়েছিল শেষ বই-এর শেষ পাতা অবধি, তাই শেষ মলাটটাও বাদ যাবে। কাজেই দুটো মলাটের মোট পুরুত্ব .১″ + .১″ =.২″ বাদ দিলেই হল। ৭.২″ থেকে বাদ ২″ বাদ দিলে ফল দাঁড়ায় ৭ইঞ্চি। সুতরাং উত্তরটা হবে ৭″ (সাত ইঞ্চি)—নয় কি?

আমিও সেবার সেই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ছিলাম। হল থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ফল মিলামিলি করে দেখলাম—হাঁ সবারই উত্তর ৭″ ইঞ্চি হয়েছে। আমরা সবাই নিশ্চিত হলুম। কিন্তু বিকেসিকের ফল দেখা গেল মাত্র ৫″ ইঞ্চি। আমরা তাকে ভুল ঠাউরে যে যার ঘরে চলে গেলাম।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বের হল। দেখা গেল, সবাই সেবার সে অঙ্কে গোল্লা পেয়েছে। কেবল বিকেসিকেই পুরো নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। আমরা যারা ফল মিলামিলি করেছিলাম, সবাই তো অবাক। ব্যাপার কী! আমাদের আবার ভুল হল কোথায়? সুতরাং একদিন সদলবলে গিয়ে বিকেসিকের কামরায় চড়াও হলাম। বললাম, ভাই, ব্যাপারটা কী বলতো? আমাদের ভুলটা কোথায়?

বিকেসিকে তখন নতুন করে হাকিম হয়েছেন। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'বস, আগে চা খাও। তারপর না-হয় বলা যাবে।' আমরা বসে পড়লাম এবং বিকেসিকে বেয়ারাকে ডেকে চা দিয়ে যেতে বললেন। বয় চা এনে কাপে একটুখানি ঢেলেছে কি, অমনি বিকেসিকে ওকে থামতে বললেন। বয় চা ঢালা বন্ধ করলে তখন বিকেসিকে বললেন, আগে একটা ম্যাজিক অঙ্কের গল্প বলি শোনো। ছেলেবেলায় মাস্টারমশায় এটা আমাদের কষতে দিয়েছিলেন। মনে কর, এটা একটা ম্যাজিক চায়ের বাটি [চায়ের কাপটি দেখিয়ে]। প্রতি মিনিটে মিনিটে এর ভেতরের চা নামক পদার্থটি পরিমাণে ডবল হয়ে বেড়ে যাচ্ছে। এবং আরও মনে কর যেন, এভাবে দশ মিনিটে

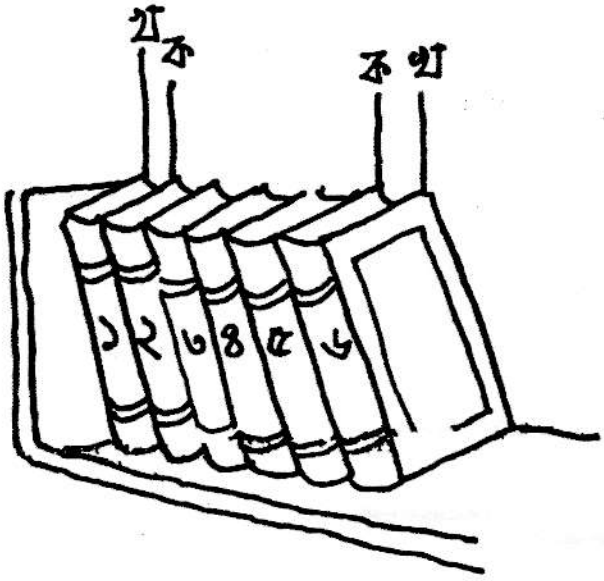

চায়ের কাপটা পূর্ণ হল। তাহলে বলতো দেখি কাপটা অর্ধেক পূর্ণ হতে কত মিনিট সময় লাগবে? আমরা কেউ কেউ বললাম, কেন, পাঁচ মিনিট! আমি ছিলাম আবার উচ্চতর অঙ্কে এম.এ., বললুম, 'এ সোজা অংক নয় হে। এ কষতে হলে, Differential Calculus-এর দরকার হবে।' বিকেসিকে হেসে উঠলেন, 'তোমরা কেউ পারলে না। পাত্রটি অর্ধেক পূর্ণ হতে ৯ মিনিট সময় লাগবে। প্রতি মিনিটে যদি ডবল হয়ে বেড়ে যায় এবং ১০ মিনিটে যদি পাত্রটা পরিপূর্ণ হয়, তাহলে বুঝতে হবে আগের মিনিটে অর্থাৎ ৯ মিনিটের সময় পাত্রটা অর্ধেক পূর্ণ ছিল। নয় কি?'

এতক্ষণে আমরাও বুঝতে পেরে হো-হো করে হেসে উঠলাম। তখন বিকেসিকে বললেন, 'এখন, ছেলেবেলায় তোমাদের মতো আমিও কিন্তু ঐ অঙ্কটি পারিনি। পারিনি সত্য, কিন্তু মাস্টারমশায় যে উপদেশটি দিয়েছিলেন, সেটা আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন : অনেকগুলো অঙ্ক আছে, সেগুলো শুধু অঙ্ক নয়, ডিটেকটিভ প্রশ্নও। প্রথমত একটা আঁক কষতে গিয়ে দেখবে সেখানে ডিটেকটিভের কিছু আছে কিনা! সেটা আগে ভালো করে দেখে নেবে। তারপর আঁকটা কষবে! এখানেও তাই হয়েছে। এক পাকা ডিটেকটিভের মতো আমার মনে প্রথম খটকা বাঁধল— হ্যাঁ, যদি সত্যিই এ আঁকটা এত সোজাই হত, তবে বি-সি-এস পরীক্ষার মতো কঠিন পরীক্ষায় এত মোটা নম্বরে এটা থাকত কি?' [অন্যান্য প্রশ্নের চেয়ে ঐ প্রশ্নের নম্বর ছিল একেবারে ডবল]।

আমরা বললাম, 'তা তো বটেই। কিন্তু খটকাটা কী?'

বিকেসিকে হাসলেন। কোনো কথা না-বলে, নক্সার মতো করে একটা ছবি আঁকলেন। তারপর বললেন : এ ছবিটার দিকে একটু তাকাও তো। ভালো করে চিন্তা করে দেখ: উত্তর হবে 'ক' থেকে 'ক' পর্যন্ত যোগ দিলে যা হয়। আর তোমরা লিখেছিলে 'খ-খ'। [চিত্র দ্রষ্টব্য]।

তবু আমাদের মাথায় ঢুকে না।

ফের বিকেসিকে হাসেন। এবার বেয়ারাকে ডেকে ছটা মোটা বই আনালেন অফিস লাইব্রেরি থেকে। বইগুলো আসল।

: বইগুলো সাজাও তো।

আমি বইগুলোকে সাজালাম।

: এখন দেখাও তো দেখি কোথায় প্রথম বইটা।

সবাই হাত দিয়ে সবচেয়ে বাঁ-এর বইটি দেখাল। আমিও তাই করলাম । [চিত্র দ্রষ্টব্য]।

: বেশ। এবার দেখাও তো প্রথম বই-এর প্রথম পাতা কোন্‌টি।

সবাই বইয়ের সবচেয়ে বাঁ পাতাটা দেখালেন।

: হল না। হল না। ওটা বুঝি প্রথম? ও-যে শেষ পাতা। বিকেসিকে বললেন।

: তাই নাকি? এতক্ষণে আমাদের চমক ভাঙে। সত্যিই তো! বইটি খুলতেই দেখালেন, সবচেয়ে বাঁ-এর পাতাটিকে, যা আমরা এতক্ষণ প্রথম পাতা ভেবে বসে আছি, সেখানেই যত ভুল। [চিত্র দ্রষ্টব্য]।

তারপর বিকেসিকে বললেন, 'এবার দেখাও তো, শেষ বই-এর শেষ পাতা কোন্‌টি?'

আমরা সবচেয়ে ডান ধারের বইটির সবচেয়ে ডান পাতাটি দেখাতেই বিকেসিকে বললেন, 'ও যে প্রথম পাতা।' পুস্তক খুলতেই তা প্রমাণিত হল। তারপর বললেন, 'এখন বুঝলে তো? প্রথম বই-এর প্রথম পাতা আরম্ভ হয়েছে এবং শেষ বই-এর শেষ পাতা হয়েছে ছবির 'ক' চিহ্নিত জায়গায়। আর তোমরা ভুল করেছিলে ছবি 'খ' চিহ্নিত জায়গায় মনে করে। সুতরাং ৭.২´ থেকে বাদ যাবে কেবল দুটো কভারই নয়, দুটো পুস্তকের পাতার অংশ। অর্থাৎ ৭.২´ থেকে বাদ দিতে হবে ২.২´ ; কাজেই ফল দাঁড়াবে ৫´। এই বলে বিকেসিকে থামলেন।

সুতরাং দেখলে তো, সামান্য একটু ডিটেকটিভি বুদ্ধির অভাবে একটুখানি এক ক্ষুদে অঙ্ক এতগুলো তুখোড় পরীক্ষার্থীকে সেবার কি ঠকানোই-না ঠকাল!

কাঠঠোকরা গাছের গুঁড়ি ঠোকরায় কেন?

কাঠঠোকরা গাছের কোটরে বাস করে। পুরনো, মৃত গাছের পড়ে-যাওয়া গুঁড়ি ঠুকরে, ফাঁকফোকর বানিয়ে সেখানেই বাসা বানায়। যেসব পোকামাকড় কাঠঠোকরার প্রিয় খাদ্য, তাদের বাস গাছের বাকলের ভেতর। এদেরই খোঁজে কাঠঠোকরা তার লম্বা, ছুঁচালো, শক্ত ঠোঁট দিয়ে গাছের গুঁড়ি ঠোকরায়। কাঠঠোকরার জিভও অস্বাভাবিক রকমের লম্বা। ঠোঁটের ভেতরে তা স্প্রিং-এর মতো গুটিয়ে থাকে। গাছের গুঁড়িতে গর্ত বানানোর পর তার ভেতরে পোকামাকড়ের সন্ধান পেলে, সরু লম্বা জিভের সাহায্যে কাঠঠোকরা তা মুখের ভেতর টেনে নিয়ে আসে।

লৌকিক বৈজ্ঞানিক ধাঁধা

ধাঁধার জগতে একটা মস্তবড় অংশ অধিকার করে রেখেছে লৌকিক ধাঁধা। লোকের মুখে মুখে ফিরছে, অন্দরমহলেও আছে সে, বাইরের দালানেও। বিষয়গত জটিলতা কিছু নেই। জীবনের এবং জীবজগতের সকল ক্ষেত্রেই লৌকিক ধাঁধার প্রবেশের অবাধ অধিকার। লৌকিক ধাঁধা আছে ছোটদের মধ্যে, বড়রাও তাকে নিয়ে যথেষ্ট আনন্দ পায়। বয়সের ভেদাভেদ নেই, অন্দরমহল বাহিরমহল নেই; জাতি-ধর্ম, কুলীন-অকুলীন, অভিজাত-অনভিজাত, লৌকিক ধাঁধার জগতে সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

কী নেই লৌকিক ধাঁধার মধ্যে? আমরা মানুষেরা আছি সেখানে, আছে আমাদের চেহারা, সম্পর্ক আর আচার-আচরণ। তাছাড়া আছে আরও কতরকমের প্রাণী—পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা। কিন্তু লৌকিক ধাঁধা শুধুই প্রাণিবাচক নয়। লৌকিক ধাঁধার উপকরণ অজস্র—তৈজসপত্র, নানা জিনিসের ব্যবহার, অনেক ধরনের আচরণ, গাণিতিক, গ্রহ-নক্ষত্র, আর কীই-বা নয়।

লৌকিক ধাঁধার মধ্যে এমনকিছু ধাঁধা পাওয়া যায়, যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় আছে। মানুষকে নিয়েই আছে একটি অতি প্রাচীন ধাঁধা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এ-ধাঁধাটি আছে, তবে আছে তা ভিন্ন পরিবেশনভঙ্গিতে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষের জীবনের গতি বিচিত্র। শৈশবে সে অসহায়, তখন সে চারপায়ে হামাগুড়ি দেয়, যৌবনে সে স্বাবলম্বী, তখন তার দুই পা, বার্ধক্যে তার শরীর হয় লাঠির উপরে। এই চিন্তাটাকে ধাঁধার ভেতর দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে:

সকালে কে চারিপায়ে যায়?
দ্বিপ্রহরে হাঁটে দুই পায়ে?
তিন পায়ে চলে সন্ধ্যায়?

গ্রিকসাহিত্যে এটিই তো স্ফিংক্সের-এর ধাঁধা। স্ফিংক্স নামে একটি রাক্ষসী পথের পাশে বসে প্রত্যেক পথিককে ধাঁধা জিজ্ঞেস করত। উত্তর দিতে না-পারলেই মৃত্যু। অবশেষে রাজা ঈদিপাস এই ধাঁধার উত্তর দিয়ে রাজ্যকে রাক্ষসীর অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছিলেন।

এই ধাঁধাটিকে আরও অন্যভাবে বলা যায় :

প্রথমে চারটি পা
তারপরে দুটি
শেষকালে তিনপা
হাঁটে গুটিগুটি।

দেহের বর্ণনা করা হয়েছে এমন ধাঁধাও লোকসাহিত্যে প্রচুর।

পৃষ্ঠ, মাথা, পা
কর্ণ আর নাসিকা
চক্ষু, দুই হাত, দশ আঙুল নাই।
এমন কী জীব আছে, বল দেখি ভাই।

এখানে নাই যে নাভি সেটুকু ভুললেই মুশকিল এবং ধাঁধার ফাঁদে পা দেওয়া।

আমরা পাঁচ ভাই
একসাথে খাই।

এই ধাঁধাটির উত্তর কী?

খাওয়ার সঙ্গে যখন পাঁচ ভাইয়ের সম্পর্ক, তখন এই পাঁচটি ভাই হাতের পাঁচটি আঙুল ছাড়া আর কী হতে পারে? লোকসাহিত্যে আমাদের দেহ-সংক্রান্ত একটি খুব সুন্দর এবং প্রচলিত ধাঁধা আছে:

আসে একবার,
যায় একবার,
আসে আবার
কিন্তু আবার যে যায়,
আসে না আর।

আমাদের দেহ-সংক্রান্ত কী আছে যা একবার যাওয়ার পরে দ্বিতীয়বারেও আসে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের যাওয়াটা বরাবরের মতো যাওয়া? এটি হল দাঁত।

মানব-শরীরের কথা বাদ দিয়ে তৈজসপত্র-সংক্রান্ত একটি ধাঁধার কথা এবার উল্লেখ করি। এই ধাঁধাটি পশ্চিমবাংলার সমস্ত অঞ্চলেই রীতিমতো প্রচলিত :

কলকাতাতে লাগল আগুন
তমলুক গেল পুড়ে,
কাঠখালি থেকে বেরুল ধোঁয়া
নারকেলডাঙ্গা ফুঁড়ে।

এই ধাঁধার উত্তর হুঁকো।

গাছপালা নিয়ে অজস্র ধাঁধায় গাছপালার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

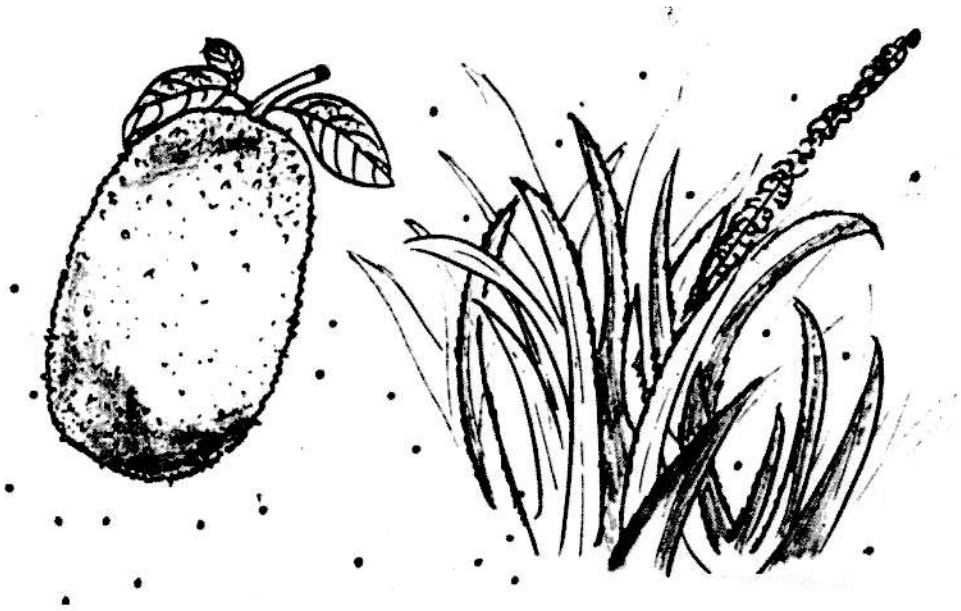

আগায় থরথর,
গোড়ায় মৌ।
কী এ জিনিস? ধাঁধার উত্তর নিশ্চয়ই আখ।
আনারসও আছে লৌকিক ধাঁধায়।
আনারস নিয়ে যত ধাঁধা তা বলা হয়েছে এভাবে :
আশ্চর্য মহাশয়,
বিশ্চর্য কথা
কোনখানে কে শুনেছে
যে ফলের আগায় পাতা।
বা,
বিধাতার একি কল
একটি গাছে একটি ফল।
আলুর বৈশিষ্ট্য কী?
ফল আছে, তার ফুল নাই।
কাঁঠালের স্বভাব ধরা পড়েছে নিচের ধাঁধাটির মধ্যে:
তেল চিকচিক পাতা, ফলে ধরে কাঁটা
পাকলে মধুর মধুর, বীজ গোটা গোটা।

গাছপালা বা ফলমূল নিয়ে অজস্র ধাঁধা আছে। এইসব ধাঁধার ভেতর দিয়ে উদ্ভিদের বা তার অংশবিশেষের বা অনেকসময় তার ফল বা মূলের বৈজ্ঞানিক পরিচয় ধরা পড়ে।

সিঁদুরে টগমগ কাজলেরি ফোঁটা
কোন ফল এটি? এটি কুঁচ ফল।
ছুঁচসম মাথা তার
করাতসম ধার।
কার? নিশ্চয়ই কেয়া ফুলের।
ঝিঙের বৈশিষ্ট্য কী?
দশ শির জন্ম তার নয় সে রাবণ
মেয়েদের হাতে তার নিশ্চয় মরণ।
বেল-পাতা বা বেলফল কী রকম?
তিন একী পাতা তার সব ডালে কাঁটা।
খেতে লাগে মধুর যত, মুখে লাগে আঁঠা।
লোকসাহিত্য থেকে আর-একটি সুন্দর হেঁয়ালি তুলি:
পাকাও খাই, কাঁচাও খাই
খেতে বললে চটে যাই।

কী এমন জিনিস আছে—যা পাকা খাই, কাঁচা রান্না করেও খাই, কিন্তু খাওয়ার কথা বললেই চটে যাই। কাঁচকলা ছাড়া এখানে আর কী হতে পারে?

যদি বলি,
আছে যত আসবে তত
তার অর্ধেক তার অর্ধেক
আপনাকে নিয়ে একশত।
তাহলে আছে কতজন?

আছে নিশ্চয় ৩৬ জন। কারণ আছে ৩৬, আসবে ৩৬, আর তার অর্ধেক ১৮, আর আঠারোর অর্ধেক ৯ আর নিজের জন্যে ১—মিলে হল ১০০।

গাণিতিক আর-একটি লৌকিক ধাঁধা বলি :

একটি বাঁধে কতগুলো পদ্মফুল ফুটে আছে। অনেকগুলো ভ্রমর উড়ে গিয়ে বসল সেখানে। যদি দুটো করে ভ্রমর একটা ফুলে বসে, তাহলে একটা ফুল বেশি হবে, আর যদি একটা করে ভ্রমর একটা ফুলে বসে, তবে আবার একটা ভ্রমর বেশি হয়ে যাবে।

কতগুলো ফুল ছিল আর কতগুলোই-বা ভ্রমর?

চারটি ভ্রমর আর তিনটি ফুল নিয়ে সহজেই সমস্ত শর্ত মেলানো যায়। লৌকিক ধাঁধায় গণিতের এইভাবে কিছু বিক্ষিপ্ত ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও, বারোয়ারিতলায় গণিত কিন্তু সর্বজনীনতার আসন পায়নি। সাধারণ মানুষ, অর্ধশিক্ষিত আর অশিক্ষিতের সংখ্যাই যাদের মধ্যে বেশি, দিনের শেষে আর-পাঁচটা হালকা বিষয়ের বদলে গণিতের মতো একটা জটিল বিষয়ের ওপরে মন ঢেলে দেবে, তা স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমাদের প্রাচীন-সাহিত্যে সংখ্যা আর সাল, তারিখ, সনের ব্যবহার দেখা যায় অনেক সময়ে কবিতার ভেতর দিয়ে। একটি কাব্য কত সনে রচিত হয়েছে, কোন নৃপতি কোন সনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন—সাল, তারিখ, সনের এইরকম হাজারো প্রশ্ন আছে।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হইলেন শাহ গৌড়ের সুলতান।
কত সনের ঘটনা?

সিন্ধু, ইন্দু, বেদ, মহী—এই চারটি শব্দ চারটি সংখ্যাকে বোঝায়।

সিন্ধুর সংখ্যা ৭, ইন্দু বা চন্দ্র ১, বেদ ৪ আর মহী (পৃথিবী) ১। অঙ্কের বাম গতি, তাহলে সিন্ধু, ইন্দু, বেদ, মহী ১৪১৭ শকাব্দকে নির্দেশ করে।

এরকম আর-একটা পদ তোলা যাক।

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভনে ভাবিয়া ভবানী।

গ্রহ সংখ্যায় ৯, ঋতু ৬, কাল ৬ আর শশী ১। অঙ্কের বামদিকে গতি নিয়ে গ্রহ, ঋতু, কাল, শশীর থেকে ১৬৬৯ শকাব্দ পাওয়া যায়।

লৌকিক ধাঁধার শেষ নেই, তার বৈচিত্র্যেরও পরিমাপ করা যায় না। লোকের মুখে মুখেই তার উদ্ভব, লোকের মুখে মুখেই সে ফিরছে এক অঞ্চল থেকে আর-এক অঞ্চলে, এক জেলা থেকে আর-এক জেলাতে, যেন সে কত আটপৌরে, তার আভিজাত্য নেই, তার কৌলীন্য নেই। হয়তো ধাঁধার মধ্যে যে-সূত্র দেওয়া আছে, তা অর্থহীন, অস্বচ্ছ, অসম্পূর্ণ, তার সঙ্গে উত্তরের যোগ অসম্ভব ক্ষীণ, তবু সে ধাঁধার একটি উত্তরই নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। কিন্তু সব লৌকিক ধাঁধা সেরকম নয়। কিছু কিছু লৌকিক ধাঁধা পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে, আছে একটা সত্য, একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। হয়তো বিষয়টা একেবারে ঘরোয়া, হয়তো হেঁসেলের উপকরণ, হয়তো দাদি বা নানির শীতল-পাটি বিছিয়ে পা ছড়িয়ে ছোটদের গল্প বলার বিষয়, তবু ধাঁধার ভেতর দিয়ে যখন তা আসে, অবাক হয়ে তখন দেখতে হয় যে, একেবারে হেঁয়ালির মতো সে নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আছে, সত্যতা আছে, তাৎপর্য আছে। লৌকিক ধাঁধার মধ্যে সেইরকম ধাঁধার দিকেই আমাদের লক্ষ্য।

হাস্যকৌতুক

মার্কিন মুলুকে একবার এক হোটেলমালিকের জরিমানা হল ঘোড়ার মাংস মিশিয়ে চিকেন কাটলেট তৈরি করার অপরাধে।

বিচারক তাকে সাজা দেবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আচ্ছা, তুমি এ দু জাতের মাংস কী অনুপাতে মেশাও?

ফিফটি ফিফটি—হোটেল মালিকের জবাব।

ফিফটি ফিফটি, মানে আধাআধি? বিচারক জানতে চাইলেন, সেটা কীরকম হিসাব হল?

হোটেল মালিক জবাব দিল, 'জি, একটা মুরগির মাংসের সাথে একটা ঘোড়ার মাংস।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল

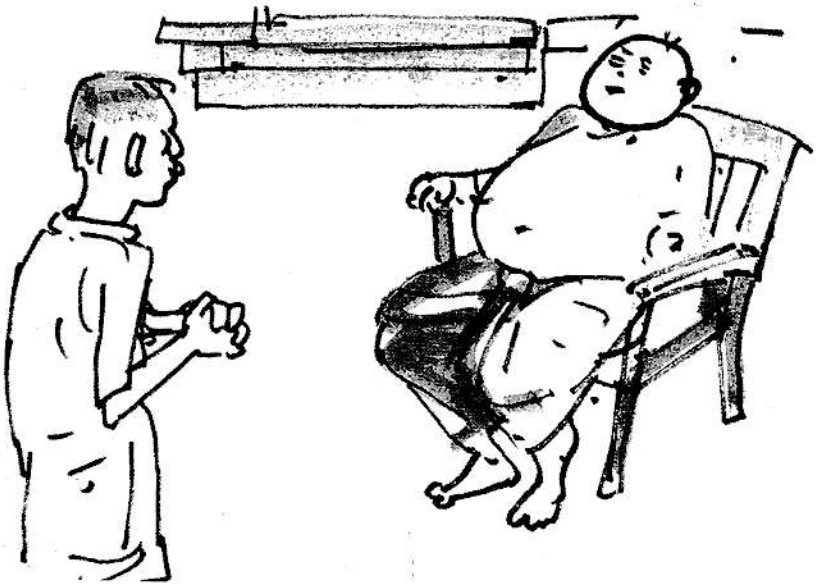

তৈল যে কী পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ—বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কী? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর-কীসে পারে!

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান। যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না, উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না—কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না-থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গবর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে-মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য 'ফিলিনথ্রপি'। যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি। চাকরবাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্‌গম হয়, সেই অগ্ন্যুদ্‌গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না-থাকিত তবে গৃহে-গৃহে গ্রামে-গ্রামে পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসংবাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে, যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান। কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে-সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু-না-কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না—একজন ইংরেজিওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দুও দিলে যত কার্য হয়, বিনা-কৌশলে কলস-কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে তাহাতে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরো মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতিবিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না-থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ-প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে

তৈল দিতে পারে না। তৈলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্টিকল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোনো রায়বাহাদুর অথবা খাঁ-বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্তত উকিলিশিক্ষার নিমিত্ত ল-কালেজে একজন তৈল-অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালোই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ-বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ-বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমতো লেকচার পাওয়া যায় না। যদিও কোনো রীতিমতো কালেজ নাই তথাপি যাঁহার নিকট চাকরির বা প্রোমোশনের সুপারিশ মিলে। তাদৃশ লোকের বাড়ি সদাসর্বদাই গেলে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালির বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালির একমাত্র ভরসা তৈল—বাংলায় যে-কেহ কিছুই করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কী কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড়লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে-শিক্ষা এদেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ-বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের ধ্রু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষে মনে রাখা উচিত—এক তৈলে চাকা ঘোরে আর-তৈলে মন ফেরে।

গোপালের দূরদৃষ্টি

গোপাল এক ছোকরাকে মাটির কলসি দিয়ে পাঠাল কুয়ো থেকে পানি আনতে। 'দেখিস, কলসিটা ভাঙিস না'— বলে হঠাৎ একটা থাপ্পড় মারল ছোকরার গালে। এক পথচারী ব্যাপারটা দেখে বলল— 'কলসি না-ভাঙতেই চড়টা মারলে কেন, গোপাল?'

'তোমার যেমন বুদ্ধি', বলল গোপাল, 'ভাঙার পরে চড় মারলে কি আর কলসি জোড়া লাগবে?'

প্রবালের কথা

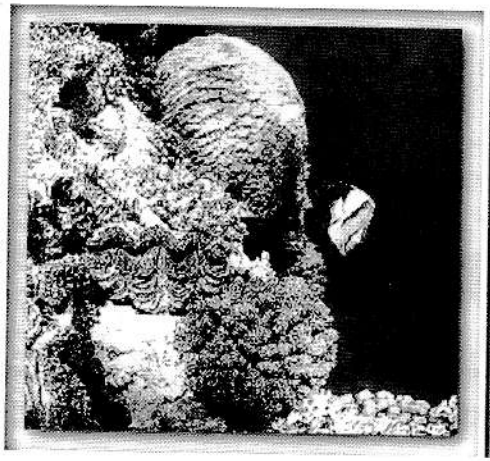

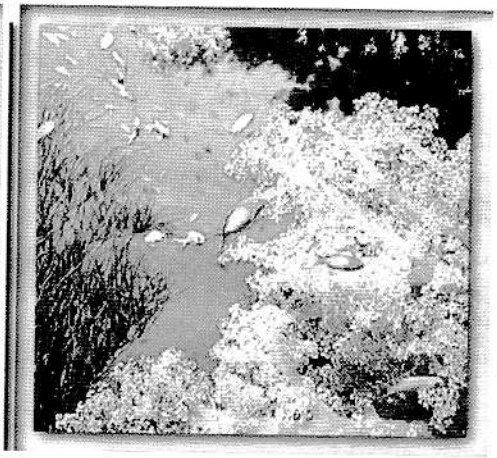

খুকুর শরীর ভালো যাচ্ছে না, ডাক্তার-কবিরাজ হন্যে হয়ে গেলেন। শেষে এলেন এক জ্যোতিষী। হাত দেখে, কোষ্ঠী বিচার করে বললেন : 'ওর এখন মঙ্গলের দশা চলছে, একটা প্রবাল ধারণ করলেই ঠিক হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে আনা হল একটি আংটি, ঈষৎ মেটে লালচে রঙের একটা চকচকে পাথর বসানো তাতে। বেশ দামি পাথরই মনে হয়। ঐ পাথরেরই নাম প্রবাল, চলতি কথায় 'পলা'। ইংরেজিতে ওকেই বলে কোরাল।

খুকুর অসুখ প্রবালধারণের পর সেরে গেল কিনা আমার ঠিক জানা নেই, তবে ঐ পাথরখানা কোথা থেকে এল তা জানবার জন্য তোমাদের মতো আমারও কৌতূহল হয়েছিল প্রচুর। প্রবাল বা কোরালরা তো সমুদ্রের জীব বলেই শুনেছি, তবে পাথর হল কী করে?

শুধু মূল্যবান পাথরই নয়, পাথরের ফুলের মতো চেহারার প্রবালও আমরা অনেক দেখেছি। সমুদ্রের তলা থেকে ডুবুরিরা সেগুলো তুলে আনে, অনেক সময় জেলেদের জালেও উঠে আসে। ঘর সাজাবার জন্যে এই পাথরের ফুল সংগ্রহ করে অনেকেই তা টেবিলে, আলমারিতে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু পাথরের জীব? কথাটা যেন কেমন-কেমন লাগছে না?

সেকালের লোকেরা মনে করত প্রবাল বুঝি একরকম সামুদ্রিক ফুল। কিন্তু ফুল যদি হয় তবে পাথরের মতো এত শক্ত হবে কেন। কেউ কেউ বলত—পানির তলায় ওরা নরমই থাকে, ডাঙায়

তুললে হাওয়া লেগে শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই উত্তরে খুশি হওয়া যায় কি? তখন একজন বিজ্ঞানী ঠিক করলেন তিনি জলের তলায় নেমে হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখবেন। সত্যি একদিন ডুবুরির পোশাক পরে জলের নিচে নেমে গেলেন তিনি। গিয়ে দেখেন, এ কী! জলের নিচেও তো ওগুলো পাথরের মতোই শক্ত! এ নিয়ে তখন সোরগোল উঠল, আরও পরীক্ষা—আরও গবেষণা চলল। শেষে একদিন সকল রহস্যের সমাধান হল।

কী সমাধান? না—জানা গেল, প্রবাল একরকম সামুদ্রিক প্রাণী—পোকাও বলতে পার, আর বলাও হয় তাই। তবে পোকা না-বলে মিষ্টি করে আমরা বলি 'প্রবালকীট'। এই প্রবালকীটেরা যখন জন্মায় তখন নরমই থাকে—একেবারে কাদার মতোই নরম বলতে পার। কিন্তু এদের আছে এক অদ্ভুত ক্ষমতা। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল থেকে এরা খাবার সংগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের থাকবার জন্য একরকম আশ্চর্য খোলাও তৈরি করে যায়। খড়িমাটি বা চক যা দিয়ে তৈরি, এই খোলাগুলোও তাই, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এই খোলাই হচ্ছে প্রবালকীটের বাসা, আর সে-বাসা ওদের শরীরের সঙ্গেই জোড়া থাকে। আমরা প্রবাল বলে এই বাসাগুলোকেই ডাঙায় তুলে আনি, তাই সেগুলোকে পাথরের মতো শক্ত মনে হয়। এই প্রবাল-পাথর অনেক সময় রঙিনও হয়। লালচে মেটে রঙিন প্রবাল-পাথর কেটে নিয়েই তৈরি হয় মূল্যবান পলা—যা খুকুকে দিয়ে ধারণ করানো হয়েছিল জ্যোতিষীর পরামর্শে।

প্রবালকীটেরা কিন্তু কখনও একা থাকে না, দল বেঁধে বাস করাই এদের স্বভাব। আর সে কি ছোটখাটো দল? একসঙ্গে কোটি কোটি প্রবাল একত্র হয়ে এই বাসা তৈরির কাজে লেগে যায়, তারপর একের বাসা অপরের বাসার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সমস্তটা একাকার করে ফেলে। একেই বলা হয় প্রবাল উপনিবেশ।

তারপর? তারপর আর কী, কেউ তো চিরজীবী নয়—প্রবালকীটেরাও নয়। যথাসময়ে সেগুলো মরে যায়, ওদের শরীরের নরম অংশগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু খোলাটা রয়ে যায়। খোলাটা রয়ে যায় যেমন-কে-তেমনই। ক্রমে সেটা জমে জমে হয়ে যায় একেবারে জমাট পাথরের মতো শক্ত। কখনও থাকে জলের নিচে, কখনও-বা নদীর চরের মতো সমুদ্রের জলের উপর মাথা বার করে জেগে ওঠে। মাইলের-পর-মাইল এই শুকনো ডাঙার মতো চরকে তখন আর চর বলা হয় না—বলা হয় প্রবালদ্বীপ (কোরাল আইল্যান্ড)। অস্ট্রেলিয়ার কাছে এই রকম একটা প্রবাল দ্বীপ আছে, সেটা প্রায় হাজার মাইল লম্বা।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বছরের-পর-বছর এইভাবে কেটে যায়। সমুদ্রের জলে বিচিত্র পোকামাকড়ের অভাব নেই, তেমনি অভাব নেই নানারকম জীবাণু বা ব্যাকটিরিয়ার। এরা এসে প্রবালদ্বীপের এখানে-সেখানে গর্ত করে গাঁথুনি ঢিলে করে দেয়। তার ওপর আছে ঢেউয়ের তোড়। ফলে ভাঙা গাঁথুনি খসে পড়ে—শক্ত পাথর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শেষপর্যন্ত মাটিতে পরিণত হয়। ইতোমধ্যে হয়তো কোনো সামুদ্রিক পাখি উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মুখে করে আনা কোনো গাছের ফল বা বীজ ওর উপর ফেলে গেল, সমুদ্রের ঢেউও হয়তো ভাসিয়ে আনল কিছু। তাছাড়া আশপাশের কোনো বড় দ্বীপ থেকে ভাঙা গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, গাছ থেকে খসে-পড়া নারকেল বা অন্য ফল ভেসে আসাও কিছু অসম্ভব নয়। দেখতে দেখতে দ্বীপের নরম মাটিতে গজিয়ে ওঠে গাছপালা। সঙ্গে সঙ্গে আসে পোড়ামাকড়, টিকটিকি, পাখি। তারপর হয়তো নৌকা করে যেতে-যেতে একদল মানুষ এসে দেখল—আরে, এ যে ফলে-ফুলে ভরা চমৎকার একটা দ্বীপ! তারা হয়তো সেখানেই নেমে পড়ল—ঘরবাড়ি বেঁধে বাস করতে শুরু করে দিল। এমনিভাবেই ছোট্ট

একদল সামুদ্রিক পোকা গড়ে তুলল পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন দেশ—যা কোনো যুগে কোনো মানুষ নিজেরা গড়বার কল্পনাও করতে পারত না। এইরকম এক প্রবালদ্বীপ সম্বন্ধেই কবি লিখেছিলেন :

'নীলের কোলে শ্যামল সে-দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নদনদী,
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি।'

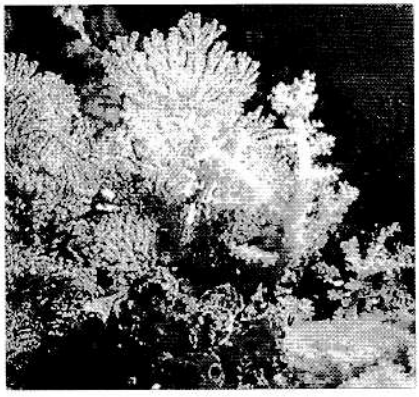

হাস্যকৌতুক

১.

বাগানের মালিক : তুমি কি বাগানে আজকে জল দিয়েছ?

মালি : না আজ দিইনি।

বাগানের মালিক : দাওনি কেন? কারণ কী?

মালি : বাবু আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

বাগানের মালিক : কিন্তু তুমি কি এতই বোকা? বাড়িতে ছাতা ছিল না? ছাতা নিয়ে তুমি বাগানে জল দিতে পারতে।

২.

ভদ্রলোক : আচ্ছা বলুনতো কোন ট্রেনটি ধরা সহজ নয়?

রেল কর্মচারী : কেন, যেগুলো আপনি স্টেশনে পৌঁছার আগেই ছেড়ে যায়।

জ্যাক লন্ডন

এক টুকরো মাংস

পাউরুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে প্লেট থেকে ময়দার তরকারির অবশিষ্টটুকু চেঁচেপুঁছে তুলে নিল টম কিং। টুকরোটাকে মুখে পুরে ধীরে সুস্থে চিন্তামগ্নভাবে চিবোতে শুরু করল। খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে ওঠার পরেও মনে হচ্ছে খিদেটা মেটেনি। তবু তো বাড়ির মধ্যে ও একাই আজ খেয়েছে। ছেলে দুটোকে আগেভাগে ঘুম পাড়িয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ওরা খেতে পায়নি বলে চেঁচামেচি না-করে। টমের বউ মুখে কিছু ঠেকায়নি। চেয়ারে বসে মায়াভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শ্রমিক ঘরের মেয়ে টমের বৌ। শুকনো রোগা চেহারা হলেও মুখ থেকে লাবণ্যটুকু এখনো পুরো মুছে যায়নি। তরকারির জন্যে ময়দাটা সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছিল। শেষ পুঁজি দুটো আধ পেনি খরচ হয়েছে পাউরুটি কিনতে।

জানালার পাশে রাখা একটা অতি রুগ্ন চেয়ারের উপর বসামাত্র চেয়ারটা টমের ভারের প্রতিবাদে কঁকিয়ে উঠল। মেশিনের মতো অভ্যাসবশত পাইপটা মুখে গুঁজে কোটের পাশ-পকেটে হাত পুরে দিল টম। পকেটে তামাক না-পেয়ে তার হুঁশ ফিরল। নিজের ভুলোমনের কথা ভেবে ভুরু কুঁচকে পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে নিল। ওর নড়াচড়ার ব্যাপারটাই কেমন মন্থর। যেন নিজের পেশির ভারে নিজেই কাবু। পাথরের চাঁইয়ের মতো বিশাল দেহের অধিকারী টম কিং। সস্তা কাপড়ের ঢিলেঢালা প্যান্ট-শার্টগুলো বহুদিনের পুরনো। জুতোর তলায় অনেকদিন আগেই সুকতলা মারা হয়েছে, উপরের চামড়াও ছিঁড়ব ছিঁড়ব করছে। দু শিলিং দামের সুতির শার্টের কলারটা ফাটা। সারা জামায় রঙের দাগ। কাচলেও উঠবে না।

কিন্তু এ সবই গৌণ। টম কিং-এর সত্যিকার পরিচয় পেতে হলে ওর মুখের দিকে তাকাতে হবে। তাহলেই নিঃসন্দেহে বলা যাবে ও একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। চারচৌকো দড়ি-বাঁধা রিঙের মধ্যে জীবনের বেশ কিছু বছর সে পার করেছে আর তারই দৌলতে তার মুখখানা আজ যোদ্ধা পশুর মতোই চিহ্নিত। সত্যি, মুখখানা দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। তার ওপর আবার পরিষ্কার করে দাড়ি কামানোর জন্যে মুখের প্রতিটি রেখা যেন আরো কুৎসিতভাবে আত্মপ্রচার করছে। মুখের মধ্যে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো কদাকার ঠোঁট দুটো থেকে যেন মাত্রাতিরিক্ত রুক্ষতা ঝরে পড়ছে। ভারী ভারী চোয়াল দুটোয় পাশবিক একটা আক্রোশ জমে আছে। লোমশ ভুরুর তলায় অলস মন্থর ভাবাবেগহীন দুটো চোখ। নিছক পশু হিসেবে শনাক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক ওর অনুভূতিশূন্য চোখ দুটো। নিদ্রাতুর চোখ দুটো যেন সিংহের মতো—শিকারি জন্তুর যেমন হয়। কপালের দিকটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে। কদমছাঁট চুলের তলায় এবড়ো-থেবড়ো মাথাটা পাক্কা বদমাইশের মতো দেখায়। নাকটা দুবার ভেঙেছে আর অসংখ্য আঘাতে যথেচ্ছ একটা আকার নিয়েছে। কান দুটো আকারে দ্বিগুণ হয়ে ঠিক ফুলকপির মতো ফুলে আছে। এত অলঙ্কারের পর আবার সদ্যকামানো মুখে দাড়ির আভাস একটা নীলচে কালো ছোপ ফেলেছে।

মোটের ওপর অন্ধকার গলিতে বা নির্জন জায়গায় হঠাৎ ওর মুখোমুখি হলে যে কেউ ভয় পেতে পারে। কিন্তু তবু টম কিং অপরাধী নয়। আজ অবধি কোনো অপরাধই সে করেনি। দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত মামুলি ঝগড়াঝাটির কথা বাদ দিলে কারোর কোনো অনিষ্ট করেনি। গায়ে-পড়ে ঝগড়া করা অবধি তার স্বভাবে নেই। ও পেশাদার বক্সার। কাজেই ওর চরিত্রের পাশবিক অংশটুকু পেশাদার লড়াইয়ের মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রিঙের বাইরে টম কিং সাদাসিধে মানুষ, কারোর সাতেপাঁচে নেই। অল্পবয়সে যখন প্রচুর রোজগার করেছে, নিজের ভালোমন্দ বিচার না-করেই পাঁচজনের জন্যে অঢেল করেছে। কারোর ওপর ওর যেমন কোনো বিদ্বেষ নেই, তেমনি ওর কোনো শত্রু নেই বললেই চলে। লড়াইটা ওর কাছে একটা ব্যবসা। রিঙের মধ্যে ও আঘাত হানে যখন, ধ্বংস করবার জন্যেই হানে। বাকরুদ্ধ করবার জন্যেই হানে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কাজ করে না। এটা সাদাসিধে লেনদেনের ব্যাপার। লোকে যে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখতে হাজির হয় সে তো একজন আরেকজনকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিচ্ছে দেখবার জন্যেই। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে টম লড়তে নেমেছিল উলুজুলু গজারের বিরুদ্ধে। তার মাত্র চার মাস আগে নিউ ক্যাসেলের লড়াইয়ে গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। সব জেনেশুনেই টম ওর ভাঙা চোয়ালটাকেই তার আক্রমণের লক্ষ্য করে নবম রাউন্ডে আবার গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে গজারের ওপর তার বিশেষ কোনো রাগ ছিল। লড়াইয়ে জেতবার এইটাই ছিল সহজ উপায়। না জিতলে টাকা আসবে কোত্থেকে! গজারও এরজন্যে টমের ওপর আদৌ বিরূপ হয়নি। এইটাই তো খেলা আর খেলতে যখন ওরা নামে তখন নিয়ম জেনেই নামে।

টম কিং কোনোদিনই বেশি কথার মানুষ নয়। জানলার ধারে বসে বিষণ্ন দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে ছিল হাত দুটোর দিকে। হাতের উলটো পিঠে শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে আছে। আঙুলের গাঁটগুলো বারবার চোট খেয়ে থেঁতলে যে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে তার থেকেই বোঝা যায় এগুলোকে কোন কাজে লাগানো হয়েছে। শিরা-উপশিরার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কথা টম কিং জানে না, কিন্তু কেন ওগুলো অমন ফুলে উঠেছে সেটা জানে। ওর হৃৎপিণ্ড বারংবার উচ্চ-চাপে এবং অত্যধিক মাত্রায় রক্ত সরবরাহ করেছে শিরাগুলোয়। দীর্ঘদিন এই ঘটনা ঘটতে থাকায় শিরাগুলো এখন আর কোনো সময়েই সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে না। শিরার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট

হবার সঙ্গে সঙ্গে টমের সহ্যক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। এখন ও অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন ও আর আগের মতো কুড়ি রাউন্ডের লড়াই চালাতে পারে না। এক রাউন্ডের পর আর এক রাউন্ড, ঢঙ ঢঙ ঘণ্টাধ্বনি, ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড লড়াই, লড়াই আর লড়াই, মারের বদলা মার, দড়ির উপর আছড়ে পড়া ও প্রতিপক্ষকে আছড়ে ফেলা, আর ওস্তাদের শেষ মার দিতে শেষ রাউন্ডে দর্শকদের কানফাটা চিৎকারের মধ্যে বারবার ছুটে যাওয়া, বারবার ঘুষির বন্যা বওয়ানো, বারবার মাথা নুইয়ে আঘাত বাঁচানো। কিন্তু এরজন্য তখন তার বিশ্বস্ত হৃৎপিণ্ড সবল ধমনি দিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাজা রক্তের বন্যা বওয়াত। সেই মুহূর্তে স্ফীত হয়ে উঠত প্রতিটি ধমনি। আবার প্রয়োজন ফুরোলে আগের আকার ধারণ করত। পুরোপুরি আগের আকার ফিরে পেত বলা ভুল, কারণ যত সামান্যই হোক, দৃষ্টিতে ধরা না-পড়ুক, শিরাগুলো কিন্তু প্রতিবারই একটু একটু করে আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিরা ফোলা থেঁতলানো হাতের দিকে চেয়ে টমের মনে পড়ে যায় তার তরুণ বয়সের সাফল্যের কথা। ওয়েলশের আতঙ্ক নামে পরিচিত বেনি জোনসের মাথায় ঘুষি চালিয়ে সেই প্রথম ওর আঙুলের গাঁট থেঁতলে গিয়েছিল।

খিদেটা আবার মাথা চাগাড় দেয়।

'ব্লিমি, এক টুকরো মাংসের ব্যবস্থা করা যায় না?' হাতের বিরাট মুঠোটা পাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল টম। তারপর চাপা গলায় একটা অশালীন মন্তব্য করল।

'বার্ক আর সলির ওখানে দুজায়গাতেই চেষ্টা করেছি।' প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বলল ব্লিমি।

'দিল না?'

'আধ পেনিও না। বার্ক বলল—' ব্লিমির কথা আটকে যায়।

'থামলে কেন, বল কী বলেছে?' প্রায় হুমকি দেয় টম।

'বলছিল স্যান্ডেলের সঙ্গে আজ রাত্তিরে তোমার লড়াইয়ের কথা জানে, কিন্তু...তাছাড়া ইতোমধ্যেই অনেক বাকি পড়ে গেছে।'

টমের মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক ধ্বনি ছাড়া আর কোনো কথা শোনা যায় না। মনে পড়ে যায়, পোষা বুলটেরিয়ার কুকুরটাকে একদিন ও বেহিসাবে মাংস খাইয়েছে। বার্কও তখন ধার দিতে বিন্দুমাত্র গররাজি হত না। কিন্তু সময় বদলে গেছে। টম কিং-এর এখন বয়স হয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাব আয়োজিত মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নেমে কোনো প্রৌঢ় মুষ্টিযোদ্ধা কখনো দোকানির কাছ থেকে বেশি ধার আশা করতে পারে না।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে ওঠা অবধি একটু মাংস খাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে রয়েছে। আজকের লড়াইয়ের জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিঙের সুযোগ পায়নি টম। অনাবৃষ্টির দরুন এ-বছর অস্ট্রেলিয়ায় যে-কোনো ধরনের একটা সাময়িক কাজ জোগাড় করাও শক্ত হয়ে পড়েছে। প্র্যাকটিস করার মতো সহকারী অবধি নেই টমের। ভালো খাবার তো দূরের কথা, সবসময় পেট ভরা খাবারও জোটেনি। যখন যেমন সুযোগ পেয়েছে দু-একদিন করে মাটি কাটার কাজ করেছে আর প্রতিদিন ভোরবেলা নিয়ম করে দৌড়েছে যাতে পায়ের জোর না-হারায়। তবু দুটো নাবালক সন্তান আর স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার পর একা একা সঙ্গী ছাড়া প্র্যাকটিস করা এক দুরূহ কাজ। স্যান্ডেলের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা হবার পরেও দোকানিদের কাছে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়নি। শুধু 'গেইটি' ক্লাবের সেক্রেটারি তাকে তিন পাউন্ড দিয়েছিলেন। লড়াইয়ে হারলেও এই তিন পাউন্ড তার পাবার কথা। সেই জন্যেই তিন পাউন্ডের বেশি ধার হিসেবে দিতে সেক্রেটারি রাজি হননি। পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে মাঝেসাঝে দু-চার শিলিঙ চেয়েচিন্তে এনেছে, এ-বছর খরা না হলে তারা

নিশ্চয় আরো বেশি দিতে পারত। স্বীকার না-করে উপায় নেই যে সত্যিই ওর ঠিকমতো ট্রেনিঙ হয়নি। আরো ভালো খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন ছিল, সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সে একজনকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে হলে যে কষ্ট পোয়াতে হয়, বিশ বছরের তরুণকে নিশ্চয় তা হয় না।

'কটা বাজল লিজি?' টম জিজ্ঞেস করল।

লিজি উঠে গিয়ে পাশের বাড়ি থেকে সময় জেনে এল। 'আটটা বাজতে পনের।'

'আর দু-চার মিনিটের মধ্যেই প্রথম খেলাটা শুরু হবে। তবে ওটা শুধু যাচাই করে দেখার জন্যে। এরপর হবে ডিলার ওয়েলশ আর গ্রিডলি'র চার রাউন্ডের খেলা। তারপর স্টারলাইট আর একটা নাবিকের মধ্যে দশ রাউন্ড। কাজেই ঘণ্টাখানেকের আগে আমার ডাক পড়বে না।'

আরো মিনিট দশেক মুখ বুজিয়ে কাটিয়ে দিয়ে টম উঠে দাঁড়াল।

'আসলে কী জানো লিজি, আমি একেবারেই প্র্যাকটিসের সুযোগ পাইনি।'

টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় টম। লিজিকে চুমু খাবার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ পায় না। এটা টমের চিরকালের স্বভাব। বেরোবার মুখে কোনোদিন চুমু খায় না। আজ লিজি কিন্তু দুহাতে টমের গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় জোর করে ওর মাথা নুইয়ে চুমু খেল। বিশাল চেহারার টমের পাশে লিজিকে যেন পুতুলের মতো দেখায়।

'গুড লাক টম। জিততে হবেই কিন্তু—' লিজি বলল।

'হ্যাঁ, জিততে হবেই।' ফের একই কথা বলে টম। 'এটাই এখন একমাত্র কাজ— জেতা— জিততে হবেই।'

টম হেসে ওঠে। খুশি হবার ভাব দেখাতে চায়। লিজি ওকে আরো জড়িয়ে ধরে। লিজির কাঁধের

উপর দিয়ে তাকায় টম। আসবাবহীন ফাঁকা একটা ঘর। টমের নিজের বলতে আছে এই ঘরখানা, লিজি আর তার দুই সন্তান। তা-ও বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে। সঙ্গিনী আর ছানাদের খাদ্যসংস্থানের জন্যে এই আস্তানা ছেড়ে নিশুতি রাতে অভিযানে বেরোতে হচ্ছে টমকে। বর্তমান যুগের কলকারখানার মজুররাও যন্ত্রের মধ্যে নিজেদের পেষাই করে খাদ্য সংস্থানের জন্যে। কিন্তু টমের পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই প্রাচীন আদিম রাজকীয় ভঙ্গিতে বন্যপশুর মতো লড়াই করে সংগ্রহ করছে ও খাদ্য।

'হারাতেই হবে—হারাতেই হবে।' —টম মরিয়া হয়ে উঠেছে বোঝা যায়। 'জিততে পারলেই তিরিশ ডলার। সব ধার শোধ হয়েও কিছু থেকে যাবে। হারলে একটি কানাকড়িও পাব না। ট্রামে চড়ার পয়সা অবধি না। হেঁটে ফিরতে হবে। চলি তা হলে—জিততে যদি পারি সোজা ফিরে আসব বাড়িতে।'

'আমি জেগে থাকব—' টমের পেছন থেকে গলা জড়িয়ে বলল লিজি। পুরো দুমাইল হেঁটে গেইটিতে পৌঁছতে হবে। টমের মনে পড়ে যায়, একদিন সে নিউ সাউথ ওয়েলশের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিল। তখন ট্যাক্সি ছাড়া লড়াইয়ের আসরে যাবার কথা ভাবাই যেত না। তাছাড়া টম জিতবে বলে যারা জব্বর বাজি ধরত তাদের মধ্যে কেউ না-কেউ সঙ্গেই থাকত। টমি বার্নস ছিল—ইয়াঙ্কি জ্যাক জনসন ছিল—ওরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসত। টম হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। সবাই জানে বক্সিঙের আগে দুমাইল পথ হাঁটা কোনো কাজের কথা নয়। টমের বয়স হয়ে গেছে আর বয়স্ক লোকের ওপর পৃথিবী বড়ই বিরূপ। এখন মাটি কাটার কাজ ছাড়া ওর আর কিছুই মানায় না, কিন্তু সেখানেও ওর এই ভাঙা নাক আর স্ফীতকায় কান দুটো প্রতিবন্ধক। টম ভাবে কী কুক্ষণেই না সে কোনো হাতের কাজ শেখেনি। শিখত যদি শেষপর্যন্ত কাজেই লাগত। কিন্তু সে-কথা কেউ তাকে বলেনি। অবশ্য বললেও সে উপদেশ কানে নিত না টম। তখন জীবনের পুরো ছবিটাই ছিল রঙিন। সহজলভ্য অর্থ—তীব্র গৌরবময় লড়াই—দুই লড়াইয়ের মাঝে অফুরন্ত অবসর—উন্মাদ সমর্থকদের ভিড়—পিঠ চাপড়ানি—করমর্দন—পাঁচমিনিট কথা বলার জন্যে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ—লড়াইয়ের আসরের হর্ষধ্বনি—লড়াইয়ের অন্তিমে ঝড়ের মতো আঘাত হানা আর রেফারির ঘোষণা—'কিং-এর জিত!' পরেরদিন সকালে খবরের কাগজের খেলার পাতায় নাম!

সেসব দিনের কথাই ছিল আলাদা! এখন কিন্তু টম ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে যে সে শুধু পুরনোদেরই সেদিন বাতিল করে দিয়েছে। উঠতি যৌবন হিসেবে প্রবীণদের তলায় টেনে নামিয়ে দিয়েছে। কাজেই অবাক হবার কিছু নেই যে কাজ হাসিল করতে তাকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। তাদের সকলেরই ছিল স্ফীতকায় হাতের শিরা, থেঁতলানো আঙুলের গাঁট আর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহ—বৃদ্ধ যোদ্ধা। রাশে কাটারস বে'র লড়াইয়ে অষ্টাদশ রাউন্ডে প্রবীণ স্টাউশার বিলকে হারাবার কথা মনে পড়ে যায় টমের। লড়াইয়ের পর ড্রেসিংরুমে বসে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বিল। হয়তো বিলেরও বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়েছিল। হয়তো বাড়িতে ছিল বৌ আর ছেলেমেয়ে। হয়তো সেদিন লড়াইয়ের আগে বিলও এক টুকরো মাংস খাবার জন্যে আকুল হয়েছিল। আজ টম বুঝতে পারছে যে কুড়ি বছর আগে সেই দিনটিতে বিল তার চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লড়াইয়ের আসরে নেমেছিল। টমের মতো সে শুধু খ্যাতি আর সহজলভ্য অর্থ কুড়োতে আসেনি। তাই হেরে যাবার পর বিলের কান্নাটাও খুব স্বাভাবিক।

একটা মানুষের লড়াইয়ের ক্ষমতা সীমিত। এর কোনো ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। কেউ একশোটা লড়াইয়ের পর ফুরিয়ে যায়। আবার কেউ মাত্র কুড়িটার পরই শেষ। সবটাই নির্ভর করে মানুষটার দৈহিক গঠনের ওপর, তার পেশির তন্ত্রীগুলোর উৎকর্ষের ওপর। নির্ধারিত সংখ্যক

লড়াইয়ের পর তাই কারোর পক্ষেই আর কিছু করা সম্ভব নয়। বড় কঠোর এই প্রাকৃতিক বিধান। আর পাঁচজনের চেয়ে টমের ক্ষমতা বেশিই ছিল বলতে হবে। সেই ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে লড়াইয়ে পর লড়াইয়ে। জান-প্রাণ উজাড় করে লড়াই—হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস ফাটিয়ে—ধমনিকে স্ফীত করে। এজন্যেই যৌবনের নমনীয় মাংসপেশিগুলো দড়ির মতো গাঁট পাকিয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে স্নায়বিক দুর্বলতা। সহ্যশক্তি কমে এসেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ঝিমিয়ে পড়েছে দেহ-মন। হ্যাঁ, আর পাঁচজনের তুলনায় টম অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। তার পুরনো মুষ্টিযোদ্ধা বন্ধুদের কেউই আর টিকে নেই। এক-এক করে সবাই বিদায় নিয়েছে আর তাদের সেই বিদায়ের আয়োজনে টমও অনেকসময় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রবীণদের বিরুদ্ধে তাকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর টমও এক-এক করে সবাইকে অপসারিত করে গেছে। স্টাউশার বিলের মতো কেউ যখন ড্রেসিংরুমে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, ও তখন হেসেছে। এখন টম নিজে প্রবীণদের দলভুক্ত। তার বিরুদ্ধে তাই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে নবীনদের। আজকের এই স্যান্ডেল ছোকরাটা এসেছে নিউজিল্যান্ড থেকে। সেখানে নাকি নামও কিনেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কেউ তার সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই টমের সঙ্গে এই বক্সিঙের আয়োজন। স্যান্ডেল যদি আজ তাগদ দেখাতে পারে তাহলে আরো নামকরা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার, আরো বেশি অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাবে। কাজেই স্যান্ডেল আজ জেতবার জন্যে চেষ্টার কসুর করবে না। অর্থ, খ্যাতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছানি দিচ্ছে স্যান্ডেলকে। সৌভাগ্য আর স্যান্ডেলের মাঝে বাধা বলতে এখন শুধু আছে পুরনো ঘাঘু টম কিং। যে টমের পাওনা খুব বেশি হলে তিরিশটা মাত্র ডলার। বাড়িওয়ালা আর দোকানির ধার শোধ করতেই যা খরচ হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতেই একসময় টমের চোখের সামনে তারুণ্য যেন রক্তমাংসের রূপ ধারণ করে। তারুণ্য—মহান তারুণ্য—অজেয় আর উৎফুল্ল—উজ্জীবিত পেশি ও গায়ের রেশম-কোমল চামড়া—অক্লান্ত অবিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস। যে তারুণ্য শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব দেখলেই ফেটে পড়ে হাসিতে। তারুণ্যই বিধ্বংসের দেবতা। পুরনোকে সে ধ্বংস করে আর তার সঙ্গে নিজেকেও তিল তিল করে খুইয়ে ফেলে। ক্রমশ তারও ধমনি আকারে বৃদ্ধি পায়, আঙুলের গাঁটগুলো যায় থেঁতলে। আর একদিন সে-ও পড়ে যায় পুরনো বাতিলদের দলে। কারণ তরুণ যা তা চির-তরুণই থাকে, শুধু যুগটাই যা পাল্টে যায়।

ক্যাসেলরিগ স্ট্রিটে পা দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল টম। তিনটি বাড়ির পরেই গেইটি। এক দঙ্গল ছোকরা প্রবেশপথের মুখেই ভিড় জমিয়ে ছিল। ওকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। টম শুনতে পেল ওরা বলাবলি করছে, 'টম কিং! এই তো টম কিং!'

ড্রেসিংরুমে ঢোকবার আগেই ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা। যুবকটির চোখে-মুখে ধূর্ততার ছাপ। করমর্দন করে বলল, 'কেমন লাগছে বলুন?'

'চমৎকার! পুরোপুরি ফিট।' টম জেনেশুনে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলল। পয়সা থাকলে এখুনি ও একটু মাংস খাবার ব্যবস্থা করত। ড্রেসিংরুম ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে হলঘরের মাঝে চৌকো রিঙের কাছে এসে দাঁড়াতেই অপেক্ষারত জনতা হর্ষধ্বনি করে অভিবাদন জানাল। একবার ডানদিকে আর একবার বাঁদিকে ফিরে টমও অভিবাদনে সাড়া দিল। বলতে গেলে সবাই অচেনা মুখ। বেশিরভাগই কিশোর। টম যখন প্রথম নাম করেছে তখন তাদের অনেকেই বোধহয় জন্মায়ওনি। উঁচু মঞ্চটার উপর একলাফে উঠে এল টম। ঘাড় নুইয়ে দড়ির তলা দিয়ে ঢুকে এককোণে নিজের জায়গায় চলে এল। ফোল্ডিং টুলের উপর বসল। রেফারি জ্যাক বল এগিয়ে এসে করমর্দন করল। বলও এককালের

পেশাদার বক্সার। অবশ্য দশবছর আগেই সে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে। বলকে রেফারি দেখে কিং খুশি হয়। পুরনোদিনের লোক বল, স্যান্ডেলকে একটু বেআইনিভাবে মারধোর করলেও বল সেদিকে নজর দেবে না।

এক এক করে ভারী হেভিওয়েট বক্সাররা রিঙে উঠছে আর রেফারি তাদের পরিচয় পেশ করছে। তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই বাজি ধরছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।

বল ঘোষণা করল, 'নর্থ সিডনির বক্সার প্রন্টো আজকের লড়াইয়ের বিজয়ীকে পঞ্চাশ পাউন্ড বাজি ধরে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।'

স্যান্ডেল রিঙের মধ্যে লাফিয়ে উঠতেই দর্শকরা বারবার হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। নিজেই জায়গায় গিয়ে বসল স্যান্ডেল। রিঙের বিপরীত কোণ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল টম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা দুজনে নির্দয় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে। বিপক্ষকে আঘাতে আঘাতে অচৈতন্য আর ধরাশায়ী করার জন্যে ওরা প্রত্যেকেই তাদের দেহের শেষবিন্দু শক্তিকেও উজাড় করে দেবে। কিন্তু স্যান্ডেলও টমের মতো রিঙ কস্টিউমের উপর সোয়েটার আর ট্রাউজার চড়িয়ে রেখেছে, তাই দেখে বিশেষ কিছু বুঝবার উপায় নেই। সুদর্শন মুখশ্রী—মাথাভর্তি কোঁকড়া ঘন হলদেরঙা চুল। সুপুষ্ট পেশিবহুল ঘাড়টাই তার শক্তিমত্তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তরুণ প্রন্টো রিঙের দুপ্রান্তে গিয়ে স্যান্ডেল আর টমের সঙ্গে করমর্দন সেরে নেমে গেল। একের পর এক তরুণ মুষ্টিযোদ্ধারা উঠে আসছে আর তাদের লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এই মুখগুলো সবারই অপরিচিত কিন্তু যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তারা সরব—দুনিয়ার মানুষের সামনে তাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ—শক্তি আর নিপুণতার জোরে তারা আজকের বিজয়ী-যোদ্ধাকে আগামীদিনে পরাস্ত করবেই করবে। আগে হলে টম কিং মজা পেত, হয়তো বিরক্তিও বোধ করত। লড়াইয়ের আগে এইসব অনুষ্ঠান দেখে এখন কিন্তু আগ্রহই বোধ করছে সে। অজেয় যৌবনকে প্রত্যক্ষ করছে। যৌবন চিরকালই ঠিক এইভাবে দড়ি গলে লাফিয়ে উঠেছে রিঙের ভেতর, উপেক্ষাভরে ছুঁড়ে দিয়েছে উদ্ধত চ্যালেঞ্জ আর বার্ধক্যও চিরকাল নত-মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে হার। বৃদ্ধ যোদ্ধাদের মাড়িয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় তরুণরা।

অতৃপ্ত অপ্রতিরোধ্য তরুণের স্রোত বৃদ্ধদের দেয় ভাসিয়ে। তারপর ওই তরুণরাও একদিন বৃদ্ধ হয়, তারাও আবার সেই একই পতনের পথের পথিক হয়। চিরজয়ী শাশ্বত তারুণ্য।

প্রেসবক্সের দিকে তাকিয়ে টম কিং 'স্পোর্টসম্যান' কাগজের মরগ্যান, আর 'রেফরি' কাগজের করবেটকে দেখতে পেয়ে ঘাড় নাড়ল। টম এবার দুহাত উঁচু করে ধরতেই তার সহকারী সিড সুলিভার ও চার্লি বেটস গ্লাভস পরিয়ে দিয়ে শক্ত করে ফিতে বেঁধে দিল। স্যান্ডেলের একজন সহকারী কাছেই দাঁড়িয়ে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরখ করছে টমের আঙুলের গাঁটের উপরকার ছোট ছোট ব্যান্ডেজগুলো। ওদিকে টমের একজন সহকারী স্যান্ডেলের কাছে দাঁড়িয়ে একইভাবে নজর রাখছে। স্যান্ডেলের প্যান্টটা টেনে খুলে নিতেই সে উঠে দাঁড়াল। এবার সোয়েটারটা টেনে তুলে নেওয়া হল মাথা গলিয়ে। টম দেখে তারুণ্য মানুষের রূপ ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুস্থ সবল দেহের গায়ের চামড়ার নিচে মাংসপেশিগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো খেলা করছে। সারা শরীর জুড়ে শুধু চঞ্চল প্রাণের স্বাক্ষর। টম জানে ওর এই সতেজ প্রাণের নির্যাসের একবিন্দুও এখনো অসংখ্য আঘাতজনিত ক্ষতমুখ দিয়ে ঝরে পড়েনি। লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে তার তারুণ্য এখনো খেসারত দিতে শুরু করেনি।

ওরা দুজন এবার এগিয়ে আসে মঞ্চের মাঝখানে। ঘণ্টা পড়তেই সহকারীরা ভাঁজ করা চেয়ার

দুটো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। স্যান্ডেল আর টম করমর্দন সারামাত্র ওদের দেহদুটো যোদ্ধার ভঙ্গি গ্রহণ করল। সূক্ষ্ম কেশের বাঁধন ছিঁড়ে ইস্পাত আর স্প্রিঙে গড়া যন্ত্রের মতো ছটফট করে উঠল স্যান্ডেল। একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে বাঁহাতে ঘুষি মারল চোখে, ডানহাতের ঘুষি পাঁজরে, তারপর প্রত্যাঘাত এড়িয়ে লঘুপায়ে নেচে পিছিয়ে এসেও ফের এগিয়ে এল হিংস্র হয়ে। স্যান্ডেল অত্যন্ত তৎপর আর চতুর। চোখ-ধাঁধানো প্রদর্শনী। দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। টমের কিন্তু ঠাণ্ডা মাথা। অভিজ্ঞ যোদ্ধা টম এমন ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে কতবার যে লড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্যান্ডেলের ঘুষিগুলোর সঠিক মূল্য তার জানা। এই ত্বরিত আক্রমণ মারাত্মক নয়। জানা কথা স্যান্ডেল প্রথম থেকেই হুটোপাটি করবে। এটা যৌবনের ধর্ম। বিদ্রোহে উন্মাদ। অফুরন্ত ক্ষমতা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে যৌবনের দর্পে ফেটে পড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দেয় প্রতিপক্ষকে।

স্যান্ডেল একবার এগোচ্ছে একবার পেছাচ্ছে। একবার এখানে একবার ওখানে। উদ্দীপনা যেন চঞ্চল পায়ে চষে ফেলছে সারা মঞ্চটা। শাদা চামড়া আর মাংসপেশির আশ্চর্য মহিমা! দেহটা যেন মাকুর মতো উঠছে, লাফাচ্ছে, পিছলে বেরিয়ে আসছে আর রচনা করছে আক্রমণের এক চোখ-ধাঁধানো জাল। আক্রমণের পর আক্রমণ—হাজারো আক্রমণ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই। টম কিংকে ধ্বংস করা। টম কিং যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যান্ডেল আর তার সাফল্যের মাঝখানে। টম অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় আঘাতগুলো। সে তার করণীয় সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। টম যৌবন পার করে এসেছে তাই যৌবনকে চিনতে আর তার বাকি নেই। যতক্ষণ-না স্যান্ডেলের খানিকটা দম বেরোচ্ছে কিছু করবার নেই। টম ইচ্ছে করে মাথা নুয়েই একটা ঘুষি খেল মাথায়। দাঁতে দাঁত টিপে হাসে টম। শয়তানি করেছে ঠিকই কিন্তু খেলার নিয়ম ভেঙে করেনি। নিজের হাতের আঙুলের গাঁট বাঁচাবার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের। তারপরেও কেউ যদি কারোর মাথার উপর ঘুষি কষাতে চায়, নিজের ক্ষতি করে—কেউ বাধা দেবে না। টম ইচ্ছে করে মাথাটা আরেকটু

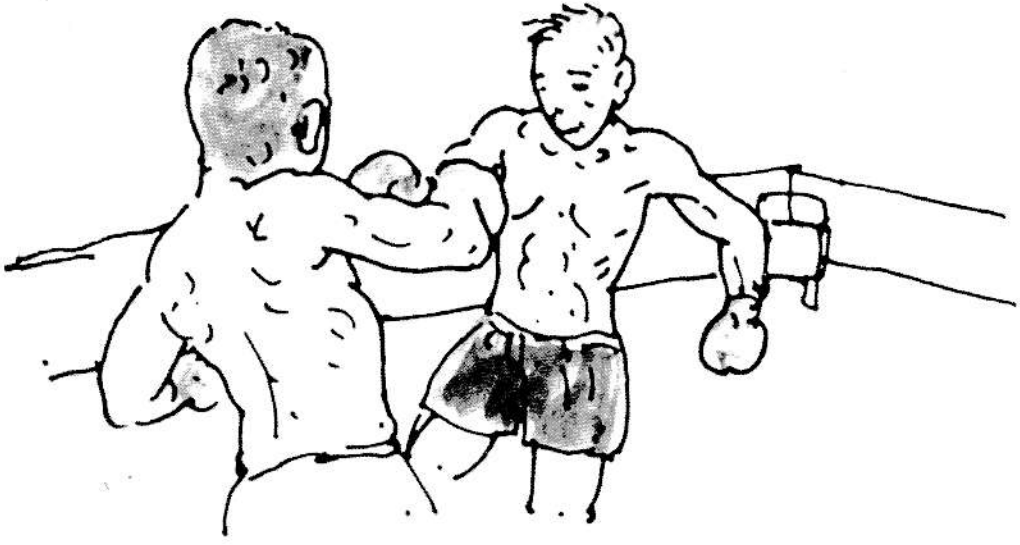

নিচু করতে পারত, তাহলেই ঘুষিটা ফস্কে যেত। টম তা করেনি। কারণ তার মনে পড়ে গিয়েছিল 'ওয়েলসের আতঙ্ক'-এর মাথায় সেই প্রথম আঙুলের গাঁট থেঁতলে যাবার কথা। মাথাটা পুরোপুরি নিচু না-করার জন্যে স্যান্ডেলেরও আঙুলের একটা গাঁট খতম হয়ে গেছে। অবশ্য এই নিয়ে স্যান্ডেল এখন মাথাও ঘামাবে না। কোনো ভ্রুক্ষেপ না-করেই সে এমনি বীরদর্পে আঘাতের পর আঘাত হেনে যাবে লড়াইয়ের শেষমুহূর্ত অবধি। কিন্তু একদিন আসবেই যখন একের পর এক লড়াইয়ে নামার ফল ফলতে শুরু করবে।

থেঁতলানো গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে তখন অনুশোচনা হবে। মনে পড়ে যাবে টম কিং-এর মাথায় ঘুষি মেরে প্রথম আঘাত পাবার কথা।

প্রথম রাউন্ডের পুরো সাফল্যটুকু একা কেড়ে নেয় স্যান্ডেল। ঘুর্ণিঝড়ের মতো তার ক্ষিপ্র আক্রমণ উল্লসিত করে প্রতিটি দর্শককে। ঘুষির বন্যা টমকে দিশাহারা করে দেয়। টম কিছুই করছে না। একবারও পাল্টা ঘুষি চালায়নি। শুধু আঘাত বাঁচাতে নিজেকে আড়াল করেছে, বাধা দিয়েছে, মাথা নামিয়ে নিয়েছে। সরাসরি আঘাত পেয়ে কখনো আবার ভান করেছে যেন মাথা ঘুরে গেছে। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শ্লথ ভঙ্গিতে সরে এসেছে। একবারও লাফায়নি বা ঝাঁপিয়ে পড়েনি। শরীরের একবিন্দু শক্তিও অপচয় করেনি। স্যান্ডেলের ফেনিল যৌবন সম্পূর্ণভাবে উপচে না পড়া পর্যন্ত বিচক্ষণ প্রবীণ প্রতিশোধ নিতে সাহস পায় না। টমের প্রতিটি গতিবিধি মন্থর হলেও সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল। ওর ক্লান্ত অলস চোখের দৃষ্টি ভ্রম সৃষ্টি করে—মনে হয় ও বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। আসলে কিন্তু কিছুই ওই দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। কুড়ি বছরেরও বেশি দড়ি-ঘেরা মঞ্চের ভিতর কাটানোর সুবাদে তার চোখের নজর তৈরি হয়ে গেছে। আসন্ন আঘাতের আশঙ্কায় চোখের পাতা কাঁপে না বা পড়ে না। শীতল চোখ দুটো শুধু চেয়ে থাকে আর দূরত্বের মাপ নেয়।

প্রথম রাউন্ডের পর রিঙের কোণে বসে নির্ধারিত এক মিনিটকাল বিশ্রাম উপভোগ করছিল টম। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে—হাতদুটোর ভর রেখেছে পিছনের দড়ির উপর। সহকারীরা তোয়ালে নেড়ে বাতাস করছে আর বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে টম। পেট আর বুক ঘনঘন ওঠানামা করছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে টম। কানে আসছে দর্শকদের নানা প্রশ্ন, 'লড়ছ-না যে টম?' —'তুমি ওকে ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'সব পেশি আড়ষ্ট হয়ে গেছে।' সামনের আসন থেকে একজনকে মন্তব্য করতে শুনল। 'এরচেয়ে তাড়াতাড়ি নড়তে পারে না। স্যান্ডেলের ওপর নগদ বাজি ধরছি—টু টু ওয়ান।'

ঘণ্টা পড়তেই দুজনে নিজেদের জায়গা ছেড়ে সামনে এগিয়ে এল। টম যত-না এগোয় স্যান্ডেল তিনগুণ। স্বভাবতই স্যান্ডেল ব্যগ্র। টম কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট। এটা তার হিসেবি মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। টমের ট্রেনিঙ জোটেনি, ভালো করে খাওয়াও হয়নি, কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পাক্কা দু-মাইল হেঁটে এসেছে। ঠিক প্রথম রাউন্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবারেও। ঘূর্ণিঝড়ের মতো স্যান্ডেলের আক্রমণ আর নিষ্ক্রিয় টম কিং। ক্ষুব্ধ দর্শকরা বারবার জানতে চাইছে টম কেন লড়ছে না, টম শুধুই ভান করছে। যাও-বা দু-একটা ঘুষি মেরেছে তার পিছনে না-ছিল গতি না-কোনো শক্তি। নিজেকে আড়াল করা আর সরিয়ে নেওয়া ছাড়া কিছুই করেনি। স্যান্ডেল চাইছে লড়াইয়ের মধ্যে ক্ষিপ্রতা আনতে, কিন্তু অভিজ্ঞতার জোরে টম তাকে সে সুযোগ দিচ্ছে না একেবারে। ব্যথাভরা অদ্ভুত এক ধরনের চাপা-হাসির আভাস ফুটে উঠেছে টমের আঘাত-জর্জরিত ভাঙাচোরা মুখটায়। এমন ব্যাকুলভাবে নিজের ক্ষমতাকে কয়েদ করে রাখার সামর্থ্য শুধু বয়সের সঙ্গেই আসে। স্যান্ডেল মানেই যৌবন আর যৌবন নিজের শক্তিসামর্থ্যকে

এমনি অবহেলা ভরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়। রিঙের অধিনায়ক কিন্তু টম। একের পর এক তিক্ত সুদীর্ঘ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুবাদে সে অর্জন করেছে তার বিচক্ষণতা। স্থিরদৃষ্টিতে ঠাণ্ডা মাথায় নজর রাখছে টম। মন্থর পদক্ষেপ। স্যান্ডেলের সফেন যৌবন উপচে না-পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষাই করবে। অধিকাংশ দর্শকই ভাবে যে স্যান্ডেলের সঙ্গে টমের কোনো তুলনাই চলতে পারে না। বাজির হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় তিনে এক। এরই মধ্যে কিন্তু কিছু বিজ্ঞ লোকও আছে। এরা আগে টমের লড়াই দেখেছে। তারা টমের ওপরেই বাজি ধরে নিশ্চিন্ত মনে।

যথারীতি তৃতীয় রাউন্ডের শুরু থেকেই স্যান্ডেলের একতরফা আক্রমণ শুরু হয়। তিরিশ সেকেন্ড পেরোবার পর স্যান্ডেলেরই অসাবধানতায় একটা সুযোগ পেয়ে যায় টম। তার চোখ ঝলসে ওঠে আর তারই সঙ্গে তড়িৎ-গতিতে এগিয়ে আসে ডানহাত। এই তার প্রথম মার—পেঁচানো ডানবাহুর কঠিনতা আর আধ-ঘুরন্ত দেহের পুরো ভারসমেত হুক করেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা সিংহ যেন আচমকা বাজ পড়ার মতো থাবা বসিয়ে দিয়েছে। আঘাতটা চোয়ালের ধারে লাগা মাত্র গলা-কাটা গরুর মতো লুটিয়ে পড়ল স্যান্ডেল। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে সভয়ে বাহ্বা জানাল। লোকটা তাহলে একেবারে অচল নয়, ঘুষিটা যা ঝেড়েছে কামারশালার হাতুড়ির মতো।

স্যান্ডেল হতভম্ব হয়ে গেছে। মেঝের উপর একপাক গড়িয়ে উঠে বসতে যায় কিন্তু তার সহকারীরা চিৎকার করে বারণ করে দেয় উঠতে। রেফারির সময় গণনা শেষ না-হওয়া অবধি বিশ্রাম নেবার জন্যে উপদেশ দেয়। একটা হাঁটু মুড়ে তার ওপর দেহের ভার রেখে বসে স্যান্ডেল, যাতে যে-কোনো মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে পারে। রেফারি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এক-দুই-তিন করে জোরে জোরে গুণে চলে প্রতিটি সেকেন্ড। নয় গোনা হতেই যোদ্ধার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডেল। টমের আপসোসের অন্ত নেই। ঘুষিটা যদি আর একইঞ্চি উপরে চোয়ালের ঠিক ভাঁজটায় পড়ত, পুরো নকআউট হয়ে যেত স্যান্ডেল। তিরিশটা ডলার পকেটে পুরে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে পারত। বৌ আর বাচ্চারা ওরই পথ চেয়ে বসে আছে।

পুরো তিনমিনিট পার করে রাউন্ড শেষ হবে। স্যান্ডেল এবার তার প্রতিপক্ষকে সমীহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। টমের কিন্তু সেই আগের মতোই মন্থরগতি, ঘুম-জড়ানো দৃষ্টি। রিঙের পিছনে সহকারীদের অপেক্ষা করতে দেখেই টম বুঝতে পারে রাউন্ড শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় সে। লড়াইটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে যাতে ক্রমশ সে তার নিজের দিকের কোণটার কাছে এগিয়ে আসতে পারে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে টম তার টুলটার উপর বসে পড়ে। স্যান্ডেলকে কিন্তু কোনাকুনিভাবে হেঁটে পুরো মঞ্চটা পার হয়ে নিজের জায়গায় পৌছতে হয়। ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু এইরকম অনেকগুলো সামান্য ব্যাপার যখন একসঙ্গে দানা বাঁধে তখন আর তা সামান্য থাকে না। ওই কয়-পা বেশি হাঁটতে বাধ্য হয়েছে স্যান্ডেল, ওইটুকু শক্তি বেশি খরচ করেছে, বিশ্রামের অত্যন্ত মহার্ঘ একমিনিট সময়ের থেকেও কয়েক সেকেন্ড বেশি করে হাঁটিয়েছে। আবার প্রতিটি রাউন্ডের সমাপ্তির সময় দেখা গেছে চতুর টম ঠিক স্বস্থানে ফিরে এসেছে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে নিজের টুলে।

আরো দু-রাউন্ড খেলা হয়ে গেছে। টম তার শক্তি-ব্যয়ে যতটা কৃপণ, স্যান্ডেল ঠিক ততটাই বেহিসেবি। স্যান্ডেল খেলার গতি বাড়াবার জন্যে সচেষ্ট হলে টম অস্বস্তিতে পড়ে। স্যান্ডেলের অসংখ্য আঘাতের মধ্যে বেশকিছু লক্ষ্যভেদ করেছে। তবু টম তার শ্লথভঙ্গি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। মাথাগরম ছোকরারা ওদিকে চেঁচিয়ে আসর মাত করছে—টমকে লড়তে বলছে। ষষ্ঠ রাউন্ডে স্যান্ডেল আবার অসতর্ক হতেই ডানহাতের ভয়াবহ ঘুষি এসে পড়ে তার চোয়ালে। আবার রেফারি নয় গোনা অবধি

পড়ে থাকে সে। সপ্তম রাউন্ডেই স্যান্ডেলের অতি উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। বুঝতে পারে এটা তার জীবনের কঠিনতম লড়াই। টম কিং বুড়ো হতে পারে কিন্তু এ-অবধি সে টমের মতো যোদ্ধার সম্মুখীন হয় নি। বুড়ো টম কক্ষনো মাথা গরম করে না, তার আত্মরক্ষার কৌশল নিখুঁত, তার ঘুষির আঘাত যেন মুগুরের ঘা। তাছাড়া তার ডান-বাঁ দুহাতেই নকআউট। তাহলেও টম কিন্তু বারবার আঘাত হানতে সাহস পায় না। আঙুলের ভাঙা গাঁটগুলোর কথা সে ভোলেনি। শেষপর্যন্ত লড়তে হলে খুব বুঝেসুঝে প্রতিটি আঘাত হানা প্রয়োজন। টুলে বসে ওপ্রান্তে স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে টমের মনে হল ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্যান্ডেলের যৌবনকে যদি যুক্ত করা যেত, সেটা নিশ্চিতভাবে বিশ্বহেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নের জন্ম দিত। কিন্তু মুশকিল এই যে স্যান্ডেল কোনোদিনই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবে না। তার সে বিচক্ষণতা নেই। একমাত্র তার যৌবনকে বিকিয়েই সে তার অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারে। তারপর একদিন সে বিচক্ষণতা অর্জন করবে ঠিকই, কিন্তু ততদিনে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে।

যতরকমভাবে সম্ভব টম সুযোগ নিতে কসুর করে না। সুবিধে পেলেই সে আঁকড়ে ধরছে বিপক্ষকে। আর আঁকড়ে ধরার মুহূর্তে বলতে গেলে প্রতিবারই তার কাঁধটা স্যান্ডেলের পাঁজরে আঘাত করছে। মুষ্টিযুদ্ধের হিসেবে ঘুষির মতোই কার্যকর কাঁধটা। তাছাড়া এতে শক্তির অপচয়ও হয় অপেক্ষাকৃত কম। একবার আঁকড়ে ধরতে পারলে টম তার পুরো দেহের ওজনটা ছেড়ে দেয় বিপক্ষের ওপর। দুজনকে ছাড়িয়ে দেয়ার জন্যে তখন রেফারির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। টম যখনই কাঁধ দিয়ে স্যান্ডেলের পাঁজরে গোঁত্তা মেরে ওকে জাপটে ধরে, ওর মাথাটা থাকে স্যান্ডেলের বাঁহাতের তলায়। স্যান্ডেল এইরকম সময় তার পিঠের দিক দিয়ে ডানহাত চালিয়ে টমের মুখে আঘাত করে। স্যান্ডেলের এই মারের চাতুর্য দর্শকদের সহর্ষ তারিফ পায় কিন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শক্তির অহেতুক অপচয়। স্যান্ডেলের কিন্তু ক্লান্তি নেই, কোনো বিকার নেই। টম মুচকি মুচকি হাসে আর সহ্য করে যায় মারগুলো।

স্যান্ডেল এবার ডানহাতে পরপর ক'বার জোরালো ঘুষি চালায়। দেখে মনে হয় টম দারুণ মার খাচ্ছে। প্রাচীন মুষ্টিযোদ্ধারা কিন্তু তারিফ দেয় টমকেই। স্যান্ডেল যেই ঘুষি চালাতে যাচ্ছে টমের বাঁহাতের গ্লাভসটা নিপুণভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে স্যান্ডেলের ডানহাতের গুলি। ঘুষিগুলো টমের গায়ে এসে লাগছে ঠিকই কিন্তু তার শক্তি হরণ করে নিচ্ছে টমের ওই সামান্য স্পর্শটুকু। নবম রাউন্ডে স্যান্ডেলের অত ভারী দেহখানা লুটিয়ে পড়ল। প্রতিবারই নয় গোনা অবধি পুরো সময়টার সদ্ব্যবহার করে তারপর স্যান্ডেল উঠে দাঁড়িয়েছে। আঘাতে আঘাতে বিহ্বল দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু ক্ষমতা হারায়নি। স্যান্ডেলের আর সেই ক্ষিপ্রতা নেই। আগের মতো আর বেহিসেবি শক্তিক্ষয়ও করছে না। দাঁতে দাঁত টিপে লড়ে যাচ্ছে। তার প্রধান সম্পদ যৌবনের ভাঁড়ার থেকে যথেচ্ছ ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। টমের প্রধান সম্পদ কিন্তু অভিজ্ঞতা। তেজ আর প্রাণশক্তিতে ভাটা পড়ার সঙ্গে সযত্নে সুদীর্ঘ যোদ্ধা-জীবনের অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে ঘাটতিটুকু পূরণ করে নিয়েছে চাতুর্য। নিজের দৈহিক শক্তির অপব্যয় রোধ করার জন্য একটিও বাড়তি অঙ্গসঞ্চালন তো নয়ই উপরন্তু প্রতিপক্ষকে সেই একই ভুল করতে বাধ্য করার কৌশল জানে টম। হাত-পা আর দেহের ছলনাময় ভঙ্গিতে বারবার সে প্রলুব্ধ করছে স্যান্ডেলকে। অহেতুক স্যান্ডেল লাফিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, ঘাড় নোয়াচ্ছে বা আক্রান্ত হবার ভয়ে প্রতিরোধমূলক ভঙ্গি গ্রহণ করছে। টম ঠিক সুযোগ করে অবসর নিচ্ছে লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে, কিন্তু স্যান্ডেলকে এক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট থাকতে দিচ্ছে না। এটা পরিণত বয়সের নীতি।

দশম রাউন্ডের শুরুতেই টম বিপক্ষের আক্রমণ রোধ করতে সোজা স্যান্ডেলের মুখের উপর বাঁহাতের ঘুষি ঝেড়ে গেল পরপর কবার। স্যান্ডেল শেষপর্যন্ত পাল্টা-কৌশল হিসেবে টমের বাঁহাতের

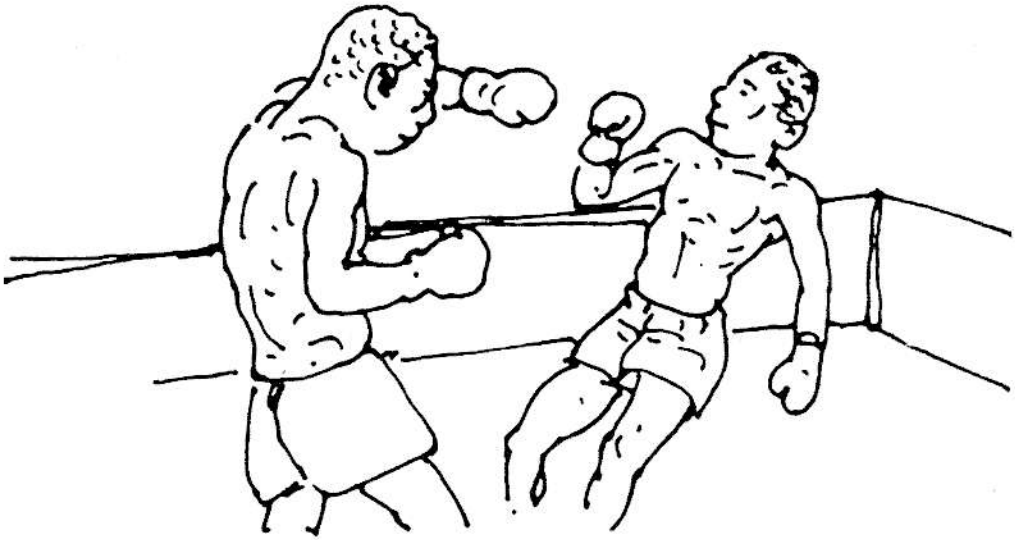

ঘুষিগুলো মাথা নুইয়ে এড়িয়ে গিয়ে ডানহাতের হুক ঝাড়তে শুরু করল টমের মাথায়। আঘাতগুলো ঠিক জায়গামতো না-লাগায় কার্যকর হয়নি। কিন্তু প্রথম আঘাতটা লাগার পর অচেতনতার সেই সুপরিচিত কালো পর্দাটা নেমে এসেছিল টমের দুচোখে, সেই মুহূর্তটিতে বা সেই মুহূর্তের এক-ভগ্নাংশখানেক সময় টম হারিয়ে গিয়েছিল। আঘাত পাবার আগের মুহূর্তেও দেখেছিল স্যান্ডেল তার মার এড়াতে দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাচ্ছে—দেখেছিল অগণিত দর্শকের মুখগুলো ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। তারপরই অন্ধকার। আবার দৃষ্টি ফিরে পেতেই সেই দর্শকদের মুখ আর স্যান্ডেলকে দেখতে পেল টম। এতক্ষণ ঘুমোবার পর এই যেন চোখ খুলল। তবে সংজ্ঞাহীন মুহূর্তটি তিলমাত্র স্থায়ী হয়েছিল বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বারও সময় পায়নি টম। দর্শকরা দেখে টম টলমল করছে, হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেলেছে। পরক্ষণেই অবশ্য বাঁ-কাঁধের আশ্রয়ে থুতনি গুঁজে নিজেকে সামলে নেয় টম।

পর পর ক'বার একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে যায় স্যান্ডেল। টম শেষপর্যন্ত বিহ্বলতা কাটিয়ে আত্মরক্ষার এবং পাল্টা আক্রমণের উপায় বের করে। বাঁহাতে ঘুষি মারবার ভণিতা করে আধ-পা পিছনে সরে এসে সম্পূর্ণ শরীরের ওজনটুকু কাজে লাগায়, ডানহাতের আপারকাট মারে। সময়ের নির্ভুল বিচারে আঘাতটা সোজা গিয়ে পড়ে স্যান্ডেলের মুখের উপর। আঘাতের প্রচণ্ডতা স্যান্ডেলকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলে। তার মাথা আর কাঁধে চোট লাগে। পরপর দুবার একইভাবে ধরাশায়ী করে তারপর দড়ির উপর ফেলে ঘুষির বন্যা বওয়ায়। স্যান্ডেলকে একমুহূর্ত অবসর দেয় না সামলে ওঠার—মুহুর্মুহু আঘাতে জর্জরিত করে দেয়। উত্তেজনায় সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিটি দর্শক। অবিরাম হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ চঞ্চল। কিন্তু অসামান্য শক্তি আর সহ্যক্ষমতা স্যান্ডেলের। এখনো পায়ের ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। স্যান্ডেলের নক-আউট হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এই বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পুলিশের এক ক্যাপ্টেন রিঙের ধারে উঠে আসে লড়াই থামিয়ে

দেবার জন্যে। ঠিক এমনি সময় ঘণ্টাধ্বনি রাউন্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করে। টলমল করে নিজের জায়গায় ফিরে আসে স্যান্ডেল। পুলিশের ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিবাদ জানায় লড়াই বন্ধ করার চেষ্টা করছে বলে। লড়বার শক্তি আর সামর্থ্য দুটোই তার অটুট আছে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সে দুবার লাফিয়ে উঠে সরে আসে পিছনে। পুলিশের ক্যাপ্টেন আর হস্তক্ষেপ না-করে ফিরে যায়।

পিঠে ঠেস দিয়ে টুলের উপর হতাশভাবে বসে আছে দমছুট টম। লড়াইটা বন্ধ হয়ে গেলে রেফারি বাধ্য হত টমকে জয়ী ঘোষণা করতে—কড়কড়ে ডলারগুলো চলে আসত পকেটে। টম তো আর স্যান্ডেলের মতো যশ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে লড়ছে না, ওর লড়াই শুধু তিরিশটা ডলারের জন্যে। আবার একমিনিট অবসর পেয়ে গেল স্যান্ডেল, এরমধ্যেই খানিকটি সামলে উঠবে নিশ্চয়।

তরুণের জয় সুনিশ্চিত—কে যেন টমের কানের কাছে গুণগুণ করে উঠল। টমের মনে পড়ে গেল স্টাউশার বিলকে হারাবার পর সে রাতে ও কার মুখে যেন এই একই কথা শুনেছিল। টমের এক অনুরাগী সমর্থক সেদিন ওকে ড্রিঙ্কের আহ্বান জানিয়েছিল। সেই বলেছিল কথাগুলো। সে রাতে টমই ছিল তরুণ আর আজ তারুণ্যের প্রতিমূর্তি বসে আছে তার বিপরীতদিকে। আধঘণ্টা হয়ে গেল লড়ছে টম এবং টমের বয়সটা কম নয়। স্যান্ডেলের মতো লড়লে পনের মিনিটের বেশি সে টিকতে পারত না। আসল কথা, দুই রাউন্ডের মধ্যবর্তী ওই সামান্য অবসরে ওর স্ফীত শিরা আর আহত ক্লান্ত হৃৎপিণ্ড হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হচ্ছে না। তাছাড়া দুর্বল শরীর নিয়েই সে শুরু করেছে। দুমাইল পথ হেঁটে আসা ঠিক হয়নি একেবারে। তাছাড়া সেই সকাল থেকে তার মাংস খাবার দুর্নিবার বাসনাটাও মেটেনি। কসাইরা ওকে ধারে দিতে রাজি হয়নি মনে পড়তেই একরাশ ঘৃণা উথলে ওঠে। একজন বয়স্ক মানুষের পক্ষে এমন আধপেটা খেয়ে লড়াইয়ে নামা সত্যিই অসুবিধাজনক। এক টুকরো মাংস আর এমন কী ব্যাপার— কয়েক পেনি তো দাম। কিন্তু সেটুকু জুটলেও আজ হয়তো তিরিশটা ডলার উপার্জন করতে পারত টম।

একাদশ রাউন্ডের ঘণ্টা পড়তেই স্যান্ডেল তেড়ে এল। হাবভাবে যতই চাঙা দেখাতে চাক-না কেন আসলে কিন্তু তা নয়। টম জানে পুরোটাই ধাপ্পা। মুষ্টিযুদ্ধে মান্ধাতার আমল থেকেই এই ধাপ্পা চালু। স্যান্ডেলের আক্রমণের প্রথম দমকটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে টম ওকে প্রথম আঁকড়ে ধরেছিল। তারপর রেফারি বাঁধন আলগা করে মুক্ত করে দিল স্যান্ডেলকে। টম যা চেয়েছিল তাই ঘটল। বাঁ-হাতের ঘুষি মারার ভঙ্গি করতেই স্যান্ডেল এক পাশে কাত হয়ে হাত ঝাঁকিয়ে ঘুষি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আধ-পা পেছনে সরে মোক্ষম একটি ডানহাতের আপার-কাটে স্যান্ডেলকে ধরাশায়ী করে ফেলল টম। তারপর একমুহূর্তের অবসর নয়—মারের পর মার, হুক ও ড্রাইভ, হরেক রকমের মার চুরচুর করে দেয় স্যান্ডেলকে। নিজেও আঘাত পাচ্ছে কিন্তু তার বহুগুণ বেশি আঘাত দিচ্ছে। স্যান্ডেল জড়িয়ে ধরলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, জড়িয়ে ধরার প্রয়াস পেলেই আঘাত হানছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হলে নিজেই একহাতে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য হাতের ঘুষির আঘাতে দড়ির গায়ে ঠেলে দিচ্ছে। দড়ির উপর ফেলে দিতে পারলে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারবে না—আরো আঘাত করার সুযোগ মিলবে।

ইতোমধ্যে প্রেক্ষাগৃহ উন্মত্ত। প্রতিটি দর্শক টমের হয়ে চেঁচাচ্ছে, 'শেষ করে দাও! শেষ করে দাও! ওকে শেষ করে ফেল টম!' লড়াইয়ের অন্তিম পরিণতি আসবে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট নিয়ে, এই তো চায় বক্সিঙের আসরের দর্শক। আধঘণ্টা ধরে শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে টম এই মুহূর্তটির অপেক্ষায়। অকৃপণভাবেই সেই শক্তিকে এখন সে কাজে লাগাচ্ছে। এই তার একমাত্র সুযোগ—পারে তো এখনই পারবে। খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে টমের শক্তির সঞ্চয়। পুরোপুরি ক্ষমতা হারাবার আগেই স্যান্ডেলকে

একেবারে ধরাশায়ী করতে পারবে বলে আশা রাখে টম। টম আঘাত হেনে চলে। প্রতিটি আঘাত ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করা। কতটা শক্তি ব্যয় হচ্ছে আর কতটা ক্ষতি করতে পারছে, তারই চুলচেরা বিচার। স্যান্ডেলের মতো একজনকে নকআউট করা যে কী কঠিন তা সে উপলব্ধি করছে এখন। অসামান্য সহ্যশক্তি তার। এ হিম্মত শুধু তাজা যৌবনেরই থাকে। স্যান্ডেল মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে নাম করবেই। এইরকম কঠিন পেশিতন্তু দিয়ে তৈরি হয় সার্থক যোদ্ধাদের দেহ।

স্যান্ডেল টলমল করে কিন্তু টমের পায়ে খিঁচ ধরছে, হাতের গাঁটগুলো বিদ্রোহ করছে। তবু নিজেকে শক্ত করে টম। ভয়ঙ্করভাবে ঘুষি চালায়। প্রতিবার আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে তার জীর্ণ আহত হাতদুটো অশেষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। নিজে কোনো আঘাত পাচ্ছে না তবু স্যান্ডেলের মতোই প্রতিমুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। ঘুষিগুলো ঠিক জায়গাতেই পড়েছে কিন্তু ঘুষিতে আর সেই জোর নেই। ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির ফসলমাত্র। টম এখন পা ঘষড়ে ঘষড়ে নড়াচড়া করছে। দুর্বলতার লক্ষণটা চোখে পড়া মাত্র স্যান্ডেলের সমর্থকরা চিৎকার করে উৎসাহিত করতে চায় তাকে।

আবার প্রচণ্ড রূপ ধরে টম। পরপর দুটো ঘুষি চালায়—বাঁহাতের মারটা লাগে একটু উঁচুতে, সোলার প্লেক্সাসে। ডান-হাতেরটা এসে পড়ে চোয়ালের উপর। মারে তেমন জোর ছিল না। কিন্তু স্যান্ডেল এত দুর্বল, এতই বিহ্বল যে সঙ্গে সঙ্গে সে কাটা ছাগলের মতো লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে শুরু করে দিল। রেফারি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সময় গণনা শুরু করে দিল। দশ সেকেন্ড হাঁকার মধ্যে উঠে দাঁড়াতে না-পারলেই হার। পুরো প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে উদগ্রীব নীরবতা। কম্পিত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে টম। মৃত্যুকালীন আচ্ছন্নতা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। সমবেত দর্শকদের মুখগুলো সমুদ্রের মতো দোল খাচ্ছে, কাছে আসছে, দূরে সরে যাচ্ছে, আর বহুদূর থেকে যেন কানে ভেসে আসছে রেফারির সময় গণনা—এক—দুই—

এরপরেও যৌবনই একমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। স্যান্ডেলও উঠে দাঁড়াল। চার গোনা হতেই সে গড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে শুল। অন্ধের মতো দড়িটা ধরার জন্যে ছটফট করতে লাগল। সপ্তম সেকেন্ডে কোনোক্রমে ঘষড়ে ঘষড়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল। মাতালের মতো কাঁধের উপর মাথাটা এলোমেলো দুলছে। রেফারি 'নয়' হাঁকা মাত্র সিধে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডেল। আত্মরক্ষার সঠিক ভঙ্গিতে বাঁ-হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, ডানহাতে ঢেকেছে পেট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি সুরক্ষিত করে বেতালা পা ফেলে টমের দিকে এগিয়ে এল স্যান্ডেল। আশা করছে টমকে জাপটে ধরে আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্যান্ডেল উঠে দাঁড়ানো মাত্র দুবার ঘুষি চালায় টম। দুবারই কিন্তু তার আঘাত গিয়ে পড়ে স্যান্ডেলের ভাঁজ করা হাতের বর্মের উপর। পরমুহূর্তেই স্যান্ডেল মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে টমকে। দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় হাত লাগায় রেফারি। টমও চেষ্টা করে মুক্তি পাবার। টম জানে যুবকরা কত তাড়াতাড়ি সামলে ওঠে। স্যান্ডেল যদি সামলে ওঠার সময় না-পায় টমের জয় সুনিশ্চিত। একটা সোজা আঘাতই যথেষ্ট। স্যান্ডেলকে সে যে-প্যাঁচে ফেলেছে জয় তার অবধারিত। মুষ্টিযুদ্ধের রীতিনীতি ও কৌশল—সবদিক দিয়েই সে পরাস্ত করেছে স্যান্ডেলকে। জট খুলে যাওয়ায় স্যান্ডেল এবার দূরে সরে গেছে। টিকে থাকা-না-থাকার এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান স্যান্ডেল। একটি উত্তম মার এখুনি ওকে লুটিয়ে ফেলে খেলার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে। মাংস খেতে না-পাবার কথাটা আবার খেয়াল হতেই তিক্ততায় ভরে ওঠে সমস্ত মনটা। মাংসটুকু পেলে হয়তো এই মুহূর্তে তার ঘুষিটা ঠিক প্রয়োজনমতো জোরালো হতে পারত। সমস্ত স্নায়ুর শক্তি একত্রিত করে টম ঘুষি মারল কিন্তু তাতে না-আছে জোর না-আছে গতি। স্যান্ডেল টলে গেল কিন্তু পড়ল না।

কোনোরকমে সরে এসে দড়ি ধরে দাঁড়াল। টমও বেসামাল পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষের শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার ঘুষি চালাল। কিন্তু ওর দেহের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আছে শুধু লড়াকু মনোভাব—তা-ও ম্লান ঝাপসা হয়ে এসেছে ক্লান্তিতে। যে আঘাতটা চোয়ালের উপর পড়ার কথা সেটা কাঁধের উপর এল। আরো উঁচুতে ঘুষিটা চালাতে চেয়েছিল টম কিন্তু ক্লান্ত মাংসপেশি তার সেই আদেশ পালন করতে পারেনি। উল্টো আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেই টলমল করে ওঠে, আরেকটু হলেই পড়ে যেত। আবার চেষ্টা করে টম। এবার পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট। অপরিসীম ক্লান্তিতে স্যান্ডেলের গায়ের উপর আছড়ে পড়ে। স্যান্ডেলকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে নিজের পতন রোধ করে।

টম নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না। আর তার করার কিছু নেই। টম ফুরিয়ে গেছে। জয়লাভ করেছে যৌবন। আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকার সময়েই টম অনুভব করে স্যান্ডেল শক্তি ফিরে পাচ্ছে। রেফারি ওদের ছাড়িয়ে দেবার পর টম দেখে সাক্ষাৎ যৌবন কেমন বলীয়ান হয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে। প্রথমদিকে স্যান্ডেলের ঘুষিতে কোনো জোর ছিল না, আদৌ কার্যকর হয়নি। কিন্তু ক্রমেই জোরালো আর নির্ভুল হয়ে উঠছে তার মারগুলো। ঝাপসা চোখে টম দেখে গ্লাভস-পরা একটা হাত তার চোয়াল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে হাত তুলে আঘাত বাঁচাতে চায় টম। কিন্তু মন চাইলেও দেহ পারে না। হাত তো নয় যেন কয়েক মণ সিসে। এমনিতে উঠতে চায় না হাতটা, তাই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাকে ঠেলে তুলতে চায় টম। গ্লাভস পরা হাতটা এসে পড়ল টমের চোয়ালে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার মতো একটা শুধু ঝলক—সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের ওড়না এসে ঢেকে দিল টমকে।

টম চোখ খুলে দেখল সে রিঙের ধারে নিজের জায়গায় বসে আছে। বন্ডির সমুদ্র উপকূলে ঢেউয়ের গর্জনের মতো ভেসে আসছে দর্শকদের চিৎকার। স্পঞ্জে করে তার ঘাড়ে জল দেওয়া হচ্ছে। মুখ আর বুকের উপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে সিড সুলিভান তাকে চাঙ্গা করতে চাইছে। হাতের গ্লাভ্স দুটো আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে। স্যান্ডেল ওর উপর ঝুঁকে পড়ে করমর্দন করছে। টমকে আজ হারিয়ে দিয়েছে স্যান্ডেল কিন্তু তারজন্যে ওর প্রতি একটুও বিরূপ বোধ করে না টম। উৎফুল্লভাবেই করমর্দন করে। আঙুলের চাপে ভাঙা গাঁটগুলো অত্যন্ত পীড়া দেয়। স্যান্ডেল এবার মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তরুণ যোদ্ধা প্রন্টোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে আর বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে একশো ডলার করে দেয়। ম্রিয়মাণভাবে তাকিয়ে থাকে টম। সহকারীরা ওর মুখ থেকে জল মুছে মঞ্চ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হঠাৎ ক্ষুধার্ত বোধ করে টম। খিদের জ্বালা নয়—একটা অবশ ভাব, জঠরের অভ্যন্তরে একটা দপদপানি যেটা সারা শরীরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। টমের মনে পড়ে যায় লড়াইয়ের সেই বিশেষ মুহূর্তটার কথা। স্যান্ডেলের তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত বেসামাল অবস্থা। পরাজয়ের গহ্বরে তাকে তলিয়ে দিতে পারত টম অতি সহজেই। মাংসটুকু যদি খেতে পেত—ওই বাড়তি ক্ষমতাটুকু নিশ্চয় থাকত তার। শেষ আঘাতের পেছনে সামান্য একটু ক্ষমতার অভাবই টমের পরাজয় ডেকে এনেছে। শুধু মাংসটুকু খেতে না-পাবার জন্যেই হেরে গেল টম।

দড়ির ফাঁক গলে বেরোবার সময় টমকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সহকারীরা। তাদের সরিয়ে দিয়ে টম নিজেই মাথা নিচু করে দড়ি পেরিয়ে ভারী পায়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল। সহকর্মীরা ভিড় সরাতে লাগল আর টম তাদের পিছু পিছু চলল। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে হলঘরটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে যাবে, পিছন থেকে কয়েকজন ছোকরা বলে উঠল, 'অমন সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে কেন?'

'বেশ করেছি!' এককথায় উত্তর সেরে সিঁড়ি কটা টপকে রাস্তায় এসে নামল টম।

মোড়ের মাথায় পাবলিক হাউসের সুইং-ডোরটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। টম দেখল ভিতরে ঝলমল করছে আলো, হাসিমুখে মহিলারা ড্রিংক পরিবেশনে ব্যস্ত, আজকের লড়াই নিয়ে আলোচনা চলছে, বারের উপর প্রচুর মুদ্রার ঝনঝনানি। কে যেন চেঁচিয়ে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ জানাল। একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল টম তারপর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে চলল।

পকেটে একটা আধলা নেই। দুমাইল হেঁটে ফেরা সোজা কথা নয়। সত্যিই বয়স হয়ে যাচ্ছে টমের। ডোমেন পেরিয়ে হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল টম। ভাবতেই মনটা দমে যাচ্ছে যে লড়াইয়ের ফলাফল জানবার জন্যে ওরই পথ চেয়ে ওর বৌ হাঁ করে বসে আছে বাড়িতে। লড়াইয়ে নকআউট হওয়ার চেয়েও ঢের ভয়াবহ এখন ওর সম্মুখীন হওয়া। কী করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে পায় না টম।

অত্যন্ত দুর্বল লাগে। সারা শরীর যেন জ্বলছে। হাতের ভাঙা গাঁটগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় মাটি কাটার কাজ পেলেও এক সপ্তাহের আগে কোদাল বা বেলচা চালাতে পারবে না। খিদেটা যেন আগুন হয়ে জ্বলছে পেটের মধ্যে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে। নিজের অসহায় অবসন্ন অবস্থা দেখে ভেঙে পড়ে টম। অবাঞ্ছিতভাবে ভিজে ওঠে দুচোখ। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বহুদিন আগে স্টাউশার বিলকে হারাবার রাতটার কথা। বেচারা স্টাউশার! এতদিনে টম বুঝতে পারে স্টাউশার কেন সেদিন ড্রেসিংরুমে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছিলেন। কম্পার্টমেন্টে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন এক ইংরেজ। শুরু থেকেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে অবহেলার চোখে দেখতে লাগলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন পা হতে চটি খুলে বসলেন তখন ইংরেজ চটিজোড়া ধরে জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন। ইংরেজ যখন কোট খুলে শুতে গেলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোটটা জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন। ইংরেজ তাঁকে কোট ফেলে দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ঝাঁঝের সাথে। 'তোমার কোট আমার চটিজোড়া খুঁজে আনতে গেছে', ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিকার জবাব।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

ভালো খাবার

ধনপতি পাল, তিনি জমিদার মস্ত;
সূর্য রাজ্যে তাঁর যায় নাকো অস্ত,
তার ওপর ফুলে উঠে কারখানা ব্যাঙ্কে
আয়তনে হারালেন মোটা কোলাব্যাঙকে।
সবার 'হুজুর' তিনি, সকলের কর্তা,
হাজার সেলাম পান দিনে গড়পড়তা।
সদাই পাহারা দেয় বাইরে সেপাই তাঁর,
কাজ নেই, তাই শুধু 'খাই খাই' বাই তাঁর,
এটা খান, সেটা খান, সব লাগে বিদঘুটে,
টান মেরে ফেলে দেন একটু খাবার খুঁটে;
খাদ্যে অরুচি তাঁর, সব লাগে তিক্ত,
খাওয়া ফেলে ধমকান শেষে অতিরিক্ত।

দিনরাত চিৎকার: আরও বেশি টাকা চাই,
আরও কিছু তহবিলে জমা হয়ে থাকা চাই।
সব ভয়ে জড়ো-সড়ো, রোগ বড় প্যাঁচানো।
খাওয়া ফেলে দিন-রাত টাকা বলে চ্যাঁচানো।
ডাক্তার, কবিরাজ ফিরে গেল বাড়িতে
চিন্তা পাকালো জট নায়েবের দাড়িতে!
নায়েব অনেক ভেবে বলে হুজুরের প্রতি:
কী খাদ্য চাই? কী সে খেতে উত্তম অতি?
নায়েবের অনুরোধে ধনপতি চারিদিক
দেখে নিয়ে বার-কয় হাসলেন ফিকফিক,
তারপর বললেন: বলা ভারি শক্ত,
সবচেয়ে ভালো খেতে গরিবের রক্ত॥

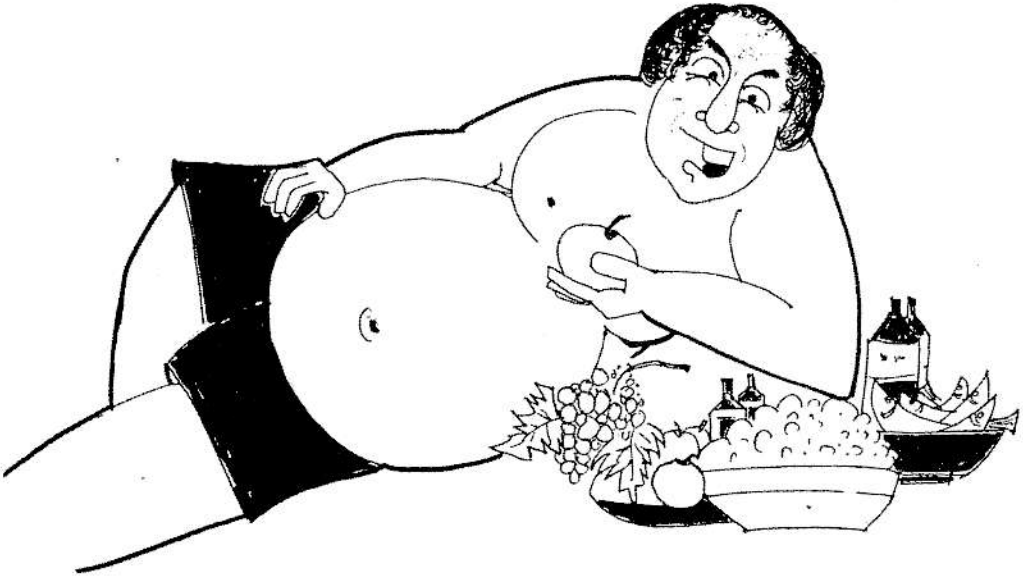

যেখানে প্রাণের স্পন্দন নেই

ডেথ সি ও ডেথ ভ্যালি

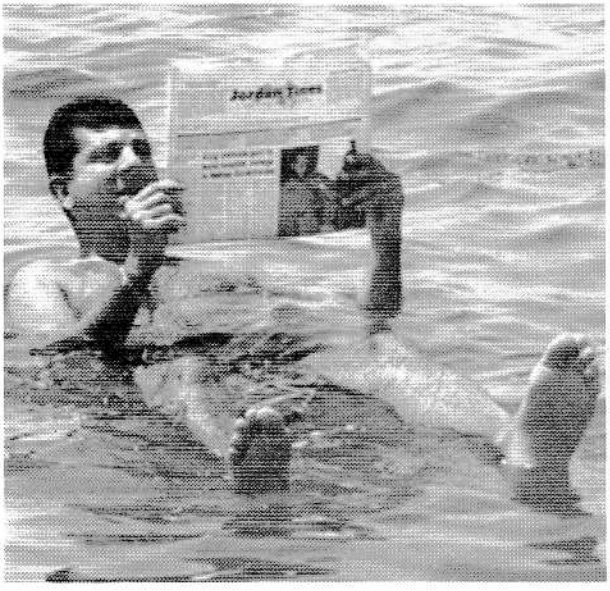

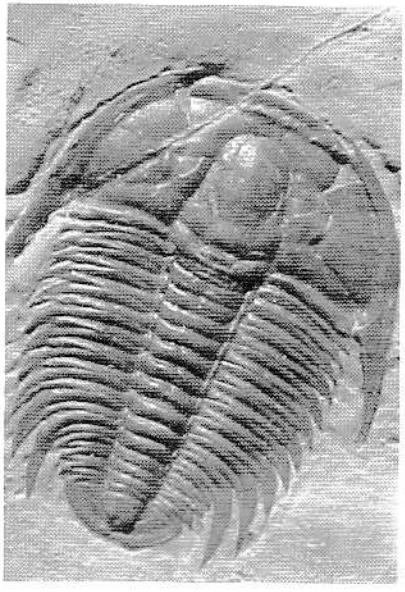

আমাদের এই সৌরজগতে এমনকি এই সমগ্র মহাবিশ্বে একমাত্র পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতেই প্রাণের সাড়া পাওয়া গেছে। বহুবছর আগে এ ধরায় প্রাণের আবির্ভাব ঘটা সম্ভব হয়েছে। কারণ এই পৃথিবীতেই আছে প্রাণ সৃষ্টির ও জীবনধারণের সমস্ত উপাদান ও অনুকূল পরিবেশ। কিন্তু পৃথিবীর বুকে আবার কিছু স্থান আছে যেখানে প্রতিকূলতার জন্য প্রাণের স্পন্দন নেই। এরকমই দুটি স্থান হচ্ছে ডেথ সি ও ডেথ ভ্যালি। ডেথ সি কোনো সমুদ্র নয়, এটি একটি বিশাল হ্রদ। এটি হিব্রুদের কাছে Yam Chammelah, আরবদের কাছে Bahret Lut ও রোমকদের কাছে Lacus Asphalites নামে পরিচিত। এর আরেক নাম অ্যাসফাস্ট সমুদ্র। দক্ষিণ ফিলিস্তিন অঞ্চলের ইসরাইল ও জর্দানের মাঝে ডেথ সি-র অবস্থান। উত্তরে জর্দানের উপত্যকা, দক্ষিণে আরাবাহু মরুভূমি, পশ্চিমে জুড়িয়া পর্বতমালা ও পূর্বে মোয়াবাইট সমতল মিলিয়ে হ্রদের তীরভূমি খুবই মনোমুগ্ধকর। ৯৩৩ বর্গকিলোমিটার ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট এই হ্রদের গড় গভীরতা ৩২৯ মিটার। জর্দান নদী প্রতিদিন এই হ্রদে ৬ মিলিয়ন টন পানি বয়ে আনে। এই অঞ্চলে বছরে ৫ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টিপাত হয় না, অথচ এই হ্রদে পানিতে অনবরত বাষ্পীভবন ঘটছে। ফলে এই হ্রদের লবণাক্ততাও অতিমাত্রায় বেশি। সাধারণ সামুদ্রিক পানিতে যেভাবে ৪%-৬% লবণ থাকে সেখানে ডেথ সি-র পানিতে ২৩%-৩৫% লবণ বিদ্যমান। হ্রদের তলদেশে ক্লোরিন, ক্লোসিন, সালফেট, কার্বনেট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি লবণ বিদ্যমান। হ্রদের এই অতিরিক্ত লবণাক্ততার জন্য এখানে

কোনো মাছ বা জলজ জীব বাঁচতে পারে না। এমনকি জর্দান নদীর প্রবাহে ভেসে আসা মাছও এই হ্রদে এসে মারা যায়। তাই এই সমুদ্রটি ডেথ সি নামে পরিচিত।

ডেথ ভ্যালি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা সীমান্তের কাছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের ২২৫ কিলোমিটার লম্বা ও ৮.২৪ কিলোমিটার চওড়া একটি উপত্যকা। এটি উত্তর-আমেরিকার সবচেয়ে উষ্ণ জায়গা। পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে শুকনো স্থানও এটি। এই উপত্যকাটি সমুদ্র সমতল থেকে ৮৬ মি. নিচে অবস্থিত। কখনো কখনো এখানকার তাপমাত্রা ৪৯ ডিগ্রিতে উঠে যায়। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৫ সেন্টিমিটার। ডেথ ভ্যালি অঞ্চলের কোথাও কোথাও যে ছোটখাটো জলাশয় সৃষ্টি হয় তা-ও ভীষণ লবণাক্ত। প্রচণ্ড তাপমাত্রার জন্য এখানে সামান্য তৃণও জন্মাতে পারে না। সমগ্র উপত্যকাটি মরুময় ও বালুতে পরিপূর্ণ। রূঢ় ও নীরস প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য জায়গাটি জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল নয়। আমেরিকার নব-আবিষ্কৃত স্বর্ণখনি অঞ্চলে যেতে হলে স্বর্ণসন্ধানীদের এই উপত্যকাটি পার হয়ে যেতে হত। কিন্তু প্রতিকূলতার জন্য এই স্বল্পসময়ের যাতায়াত কালেও মানুষ ক্লান্তি ও তৃষ্ণায় মারা যেত। তাই এই উপত্যকাটি মৃত্যু উপত্যকা বা ডেথ ভ্যালি নামে পরিচিত।

মানমন্দির

মানমন্দির এমন একটি ভবন, যেখান থেকে জ্যোতির্বিদগণ সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করেন। মূলত বিজ্ঞানীরা ঊর্ধ্ববায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন রকমের রশ্মি, আলোকরশ্মি, বিকিরণ, রঞ্জনরশ্মি ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যই মানমন্দির ব্যবহার করে থাকেন। জ্যোতির্বিদগণ বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যে উচ্চ তাপমাত্রায় পরমাণুর আচরণ সম্পর্কেও পরীক্ষা করে জানতে পারেন।

দুই ধরনের মানমন্দির আছে। একটিকে বলা হয় অপটিক্যাল মানমন্দির, যার দ্বারা আলোকরশ্মি পর্যবেক্ষণ করা হয়। অপটিক্যাল মানমন্দিরের অপটিক্যাল টেলিস্কোপে আয়না, লেন্স ইত্যাদি ব্যবহার করে দূরের বিষয়বস্তুর বর্ধিত ছবি দেখা যায়। অন্যটি রেডিও মানমন্দির—যেখানে বিভিন্ন রশ্মি ও বিকিরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। রেডিও মানমন্দিরের টেলিস্কোপে বৃহদাকার অ্যান্টেনা ব্যবহার করে মহাশূন্যের বিভিন্ন রশ্মি ও বিকিরণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়।

মানমন্দির বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত রাখা হয়, যাতে করে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ ও রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে সংগৃহীত তথ্যাবলির রেকর্ড রাখা সম্ভব হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার করে দূরবিনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যাবলির বিশ্লেষণ করা হয়। মানমন্দির এমন নিরাপদ জায়গায় তৈরি করা হয় যে-স্থান বায়ুমণ্ডলের তাপ ও চাপের হেরফের, দূষিত পরিবেশ এবং উজ্জ্বল আলোকরশ্মি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। বেশিরভাগ অপটিক্যাল মানমন্দির পর্বতের উপর যেখানে আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে সেখানে স্থাপন করা হয়। বেশিরভাগ রেডিও মানমন্দির দুই পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায় স্থাপন করা হয়, যাতে করে কোনো সাধারণ বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও জনবহুল এলাকার পরিবেশ এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না-পারে।

১৬০৯ সালে গ্যালিলিও তাঁর হাতে তৈরি দূরবিন দিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন। ১৬৭২ সালে প্যারিস মানমন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ হয়। রয়েল গ্রিনিচ মানমন্দির ১৬৭৬ সাল থেকে কাজ আরম্ভ করে।

নাবিক না-হয়েও জাহাজের বহু সমস্যার সমাধান করেছেন লর্ড কেলভিন

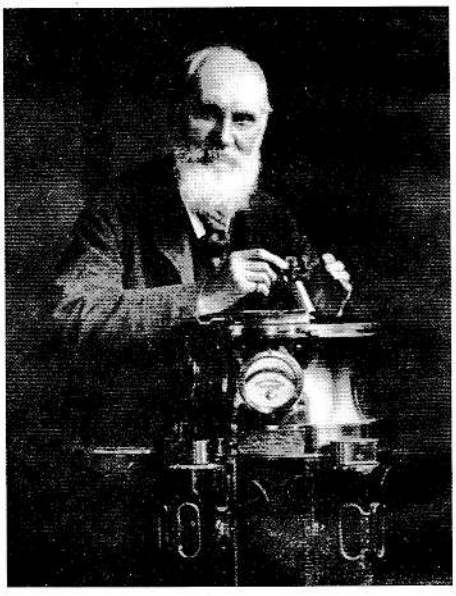

সারা শরীরে পিয়ানোর তার জড়িয়ে বসে ছিলেন তিনি। 'কী হবে এই তার দিয়ে', এক পরিচিত ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর এল, 'সাউন্ডিং।' প্রশ্ন, 'কোন স্বরের'? উত্তর, 'গভীর সমুদ্রের।'

গোটা ব্যাপারটাই হেঁয়ালি মনে হচ্ছে? আপাত-হেঁয়ালিভরা এই কথাবার্তা চলছিল দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে। তার মধ্যে একজন, পিয়ানোর তার নিয়ে যিনি পরীক্ষা করছিলেন, পরে বিশ্ববিখ্যাত হন। তাঁর নাম উইলিয়াম টমসন, বিজ্ঞানজগতে যিনি লর্ড কেলভিন নামে পরিচিত। একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও উদ্ভাবক হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তিনি। প্রায় ৭০টি উদ্ভাবনার ওপর পেটেন্ট নিয়েছেন কেলভিন।

ফ্যারাডের সমসাময়িক এই বিজ্ঞানীর জন্ম স্কটল্যান্ডের বেলফ্যাস্টে, ১৮২৪ সালের ২০ জুন। তাঁর বাবা ছিলেন স্কটল্যান্ডের একজন নামী বিজ্ঞানী, গ্লাসগো বিশ্বদ্যিালয়ে গণিত পড়াতেন। তিনি চেয়েছিলেন ছেলেও বিজ্ঞানী হোক। তাই পড়তে-লিখতে শেখার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উইলিয়ামের

বিজ্ঞানশিক্ষা শুরু হয়ে যায়।

উইলিয়াম যখন নেহাতই শিশু, সাতটি ছেলেমেয়ে রেখে তাঁর মা মারা যান। বাবার স্নেহ এবং কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে সাত ভাই-বোন মানুষ হতে থাকে। ভাইবোনদের মধ্যে উইলিয়াম ও তাঁর বড়ভাই জেমস সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন। স্কুলের পরীক্ষায় উইলিয়াম প্রথম ও জেমস দ্বিতীয় হতেন।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি স্কুল থেকে উইলিয়াম ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন মাত্র ১০ বছর বয়সে। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। পাঠক্রমে ছিল গ্রিক এবং লাতিন ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, তর্কবিজ্ঞান, গণিত এবং রসায়ন। নিউটনের গণিতও কিছুটা পড়ানো হত।

উইলিয়াম কেমব্রিজ বিশ্বদ্যিালয়ের সেন্ট পিটার্স কলেজে ভর্তি হন ১৭ বছর বয়সে। সেখানেও উজ্জ্বলতম ছাত্র তিনি। গভীর পড়াশোনা করেন, কিন্তু তাই বলে বইয়ের পোকাও নন তিনি। সাঁতার, নৌকো চালানো, হাঁটা ইত্যাদির পেছনেও বহু সময় দেন। সঙ্গীত ভালোবাসেন, নিজেও গানবাজনার চর্চা করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক্যাল সোসাইটি অর্থাৎ সঙ্গীতসভার তিনি সভাপতিও হয়েছেন।

কেমব্রিজে গণিতের পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীকে 'সিনিয়ার র‍্যাংলার' খেতাব দেওয়া হয়। র‍্যাংলার হয়ে উইলিয়াম গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। এরকমই ইচ্ছে ছিল তাঁর বাবার। কিন্তু গণিতের পরীক্ষা যথেষ্ট ভালো হলেও, তাঁর চেয়ে কয়েক নম্বর বেশি পেয়ে প্রথম হয়ে গেলেন আর-এক ছাত্র। তবে উইলিয়ামের উত্তরপত্র দেখে পরীক্ষকরা এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়, যা প্রায় র‍্যাংলারের সমতুল্য। এদিকে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও উজ্জ্বল মেধাবী তরুণটিকে হাতছাড়া করতে চাইলেন না। একটি পদ খালি হওয়া মাত্র তাঁকে অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। উইলিয়ামের বয়স তখন মাত্র ২২।

গ্লাসগোর অধ্যাপনার পাশাপাশি উইলিয়াম টমসন বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং বিদ্যুৎপ্রবাহের ওপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও করেন। অগ্রজ প্রবীণ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। সেই সাক্ষাতের ফলেই তরুণবিজ্ঞানী টমসন বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্জের ঐতিহাসিক পরীক্ষার পর উইলিয়াম টমসনই প্রথম বিনা-তারে টেলি-বার্তা পাঠানোর সম্ভাবনার কথা বললেন। তারের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ অর্থাৎ টেলিগ্রাফি অবশ্য তার অনেক আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে। উইলিয়াম কুক, চার্লস হুইটস্টোন এবং স্যামুয়েল মোর্স—এই তিন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফসল টেলিগ্রাফি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে সফল হয় ১৮৩৭ সালে, উইলিয়াম টমসন তখন ১৩ বছরের কিশোর।

টেলিগ্রাফিতে টমসনের দুটি উদ্ভাবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর একটি হল 'মিরর গ্যালভানোমিটার', অন্যটি 'সাইফন রেকর্ডার'। টেলিগ্রাফি উদ্ভাবনার পর একেবারে গোড়ার দিকে একটি সুচি-চুম্বকের (ম্যাগনেটিক নিডল) ডানে-বাঁয়ে নড়াচড়ার ভিত্তিতে টেলিগ্রামের সাঙ্কেতিক বার্তা গ্রহণ করা হত। বিদ্যুৎ দিলে সুচিটি চৌম্বকধর্ম পায় এবং বিক্ষিপ্ত হয়, বিদ্যুৎ বন্ধ করলে তার চৌম্বকত্ব চলে যায়, সেটি স্বস্থানে ফিরে আসে। তার-পথে অনেকদূর যেতে-যেতে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা স্বভাবতই কমে যায়, ফলে সুচি-চুম্বকের বিক্ষেপ দুর্বল হয়ে পড়ায় বার্তা গ্রহণে প্রায়ই অসুবিধে হত। টমসন করলেন কী, সুচি-চুম্বকের সঙ্গে একটি আয়না আটকে দিলেন। আয়নার উপর আলোকরশ্মি বিক্ষেপ ধরা পড়ে এবং রশ্মিটি একটি স্কেলের উপর আপতিত হয়ে দেখিয়ে দেয় আগত-বার্তার

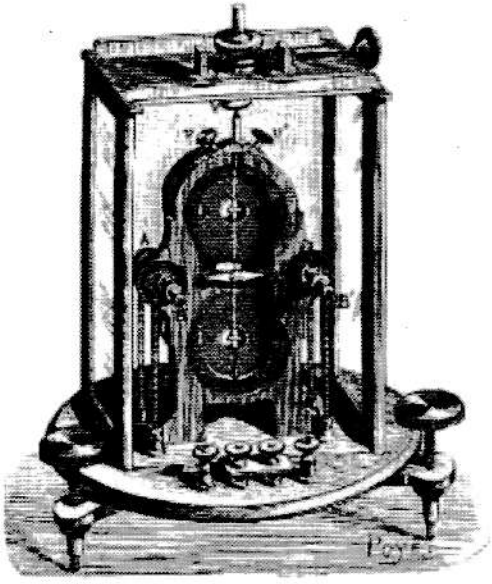

গ্যালভানোমিটার

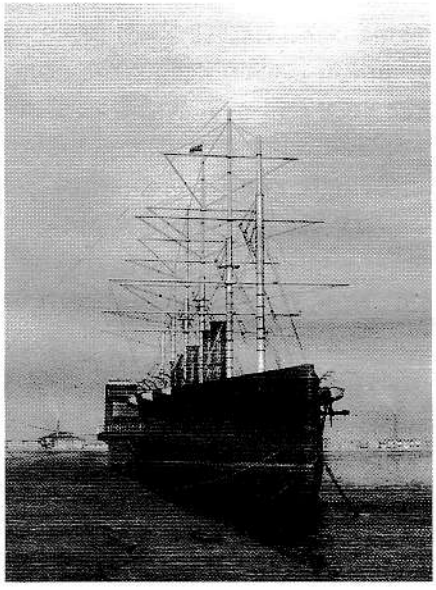

গ্রেট ইস্টার্ন জাহাজ

সঙ্কেতচিহ্নগুলো।

আয়না-গ্যালভানোমিটারের ব্যবহার অবশ্য টেলিগ্রাফিতে বেশিদিন চলেনি। তবে গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষায় বিদ্যুৎ-মাত্রা মাপতে বহুদিন এর প্রচলন ছিল। টমসন-উদ্ভাবিত সাইফন-রেকর্ডার হল বহুগুণে উন্নত। এই যন্ত্রের সাহায্যে টেলি-বার্তা সরাসরি লেখা সম্ভব হয়, অক্ষরের চেহারায় নয়, ছোট এবং লম্বা 'ড্যাশ'-এর আকারে। ড্যাশের ধরন দেখে উদ্ধার করা হত প্রকৃত বার্তাটি। সাইফন-রেকর্ডারে টমসন ব্যবহার করলেন একটি ছোট এবং সরু কাচের টিউব, যার মধ্যে কালি ভরা রয়েছে। চৌম্বক বিক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে টিউবের সামনে-পেছনে নড়াচড়ায় কালি বেরিয়ে একটি চলমান কাগজের ফিতের উপর এঁকে দেয় বিভিন্ন মাপের ড্যাশ। সে-সময় এই উদ্ভাবনের গুরুত্ব ছিল অসীম।

অতলান্তিক সমুদ্রের তলায় টেলি-সংযোগের কেব্‌ল (Cable) পাতায় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ হিসেবে মুখ্য ভূমিকা নিলেন উইলিয়াম টমসন। ওই কেবলের মাধ্যমে প্রথম ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে টেলি-বার্তা আদানপ্রদান সম্ভব হয়। ১৮৬৫ সালে 'গ্রেট ইস্টার্ন' নামে একটি জাহাজ বিশেষভাবে নির্মিত হয় ওই কেব্‌ল পাতার জন্যই। অধ্যাপক টমসন সেই প্রকল্পের 'ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার' নিযুক্ত হন। কেব্‌ল কীভাবে তৈরি হবে, কী কী উপাদান ব্যবহার করলে সমুদ্রজগতের বিপুল চাপ ও লবণাক্ত পরিবেশে বছরের পর বছর তা অক্ষত থাকবে ইত্যাদি পরিকল্পনা তিনিই করলেন। ১৮৬৫ সালে প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও পরের বছরেই ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মধ্যে প্রথম টেলি-সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ইংল্যান্ডের রানি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুভেচ্ছাবার্তা বিনিময় করে তার

উদ্বোধন করেন। এই কৃতিত্বের জন্য অধ্যাপক টমসন রানির কাছ থেকে 'নাইট' উপাধি পান।

অনেক পরে ১৮৯২ সালে তাঁকে নেদারল-এর ব্যারন করা হয়। তখন থেকেই তিনি লর্ড কেলভিন নামে পরিচিত। কেলভিন আসলে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি ছোট নদীর নাম—যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে টমসন অধ্যাপনা করেছেন টানা ৫০ বছর।

একসময় নাবিকরা কেলভিনকে তাঁদের পরিত্রাতা বলে মনে করতেন। তিনি নিজে কিন্তু নাবিক ছিলেন না। জাহাজ চালনার ব্যাপারে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করে নাবিকদের কূলে জাহাজ-ভেড়ানোর কাজ অনেক সহজ আর নিরাপদ করে দেন তিনি। কোনো অজানা এবং বিপজ্জনক কূলের দিকে এগোনোর সময় জাহাজ থেকে দড়িতে বাঁধা একটি ভার, যার নাম 'সিঙ্ক', নামিয়ে বারবার জলের গভীরতা মেপে দেখা হত, যাতে জাহাজের তলা হঠাৎ অগভীর জলে মাটি বা পাথরে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনায় না-পড়ে। একে বলা হয় 'সাউন্ডিং'। কেলভিন সাউন্ডিং-এর জন্য দড়ির বদলে কয়েক-পাকে-জড়ানো তার ব্যবহার করলেন। পরীক্ষার জন্য তিনি প্রথম ব্যবহার করলেন পিয়ানোর তার। ওই তার একটি হ্যান্ডেলযুক্ত সিলিন্ডারে জড়ানো থাকে। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে তার নামিয়ে দেওয়া হয় জলে, তারের মাথায় সিঙ্ক হিসেবে একটি কাচের লম্বা নল জুড়ে দেওয়া হয়। নলের ভেতরে মাখানো বিশেষ রাসায়নিক লবণাক্ত জলের প্রভাবে বর্ণহীন হয়ে পড়ে। কতদূর পর্যন্ত নল বর্ণহীন হল তা থেকে মাপা হয় জলের গভীরতা। অভিনব এই যন্ত্র ব্যবহার করতে দুজনের বেশি লোকের দরকার হয় না। কাজটাও পুরনো পদ্ধতির তুলনায় অনেক সহজ। এই যন্ত্রের প্রচলনে কূলে-ভেড়ার পথে জাহাজের দুর্ঘটনাও অনেক কমে যায়।

ছোট, হালকা এবং সহজে ব্যবহার করা যায় এমন একটি জাহাজি কম্পাসও তৈরি করেন কেলভিন। তার আগে নাবিকরা যে-কম্পাস ব্যবহার করতেন তা ছিল আকারে অনেক বড় এবং জবড়জং। খাদ্যসংরক্ষণে কৃত্রিম উপায়ে শৈত্য সৃষ্টি অর্থাৎ 'রেফ্রিজারেশন'-এর গুরুত্ব যাঁরা প্রথম বুঝেছিলেন, কেলভিন তাঁদের অন্যতম। তিনি তাপমাত্রার 'কেলভিন স্কেল'-এর জনক, যার 'জিরো' বা শূন্য ডিগ্রি হল ২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সমান। একে বলা হয় 'অ্যাবসলিউট জিরো' বা পরম শূন্য। এ এমন এক তাপমাত্রা, যেখানে পৌঁছলে যে-কোনো গ্যাসের অণুগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আসলে ওই তাপাঙ্কে পৌঁছনোর আগেই তা আর গ্যাস থাকে না, তরল বা কঠিনে রূপান্তরিত হয়। তবে কৃত্রিমভাবে পরম শূন্য তাপমাত্রা সৃষ্টি করা এখনও সম্ভব হয়নি, যদিও তার খুব কাছাকাছি পৌঁছুনো গেছে।

একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগকুশলী বিজ্ঞানী ছিলেন লর্ড কেলভিন। বাস্তব সমস্যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত বলেই সে-সময় বিজ্ঞানীমহলে তিনি ছিলেন সম্মানিত। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হয়েছেন। ফ্রান্স তাঁকে দিয়েছে 'লিজিয়ন অব অনার'। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপনার ৫০ বছর পূর্তিতে সে-কালের বড় বড় বিজ্ঞানীরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁকে সম্মান জানাতে। লর্ড কেলভিন ১৯০৭ সালে ৮৩ বছর বয়সে মারা গেলে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে, নিউটনের সমাধির পাশেই। সে-ও এক দুর্লভ সম্মান।

একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও উদ্ভাবক হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তিনি। প্রায় ৭০টি উদ্ভাবনার ওপর পেটেন্ট নিয়েছেন কেলভিন।

অদ্ভুত পাখি

কিউই পাখি

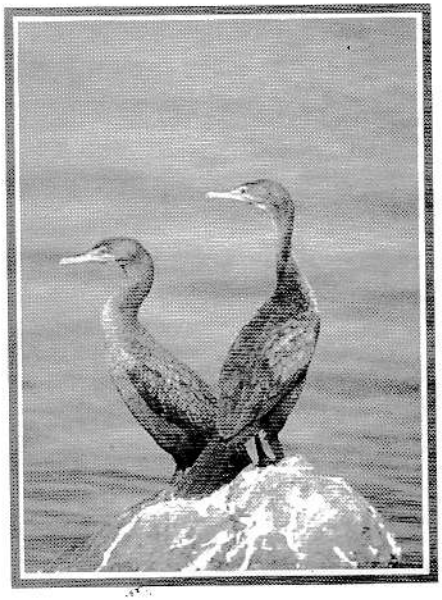

কর্মোরান্ট

এই পৃথিবীতে কতগুলো অদ্ভুত পাখি দেখা যায়। তারা অভিনব উপায়ে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে। মিশরদেশে নীলনদীর ধারে একরকম পাখি দেখা যায়, তাদের 'কুমির-পাখি' বলে। এরা নদী জলাভূমির কাছে বাস করে, এসব জায়গায় কুমিররা রোদ পোহায়। এরা করে কী, ঠোঁট দিয়ে কুমিরের দাঁতগুলো পরিষ্কার করে দেয় আর দাঁতের মধ্যে যে-খাবারের টুকরা থাকে তা খায়। কুমিরও এই পাখিদের খুব আদরযত্ন করে। কুমির মুখ খুলে হাঁ করে থাকে আর পাখিটা মুখের মধ্যে ঢুকে তার কাজ করে যায়। এই পাখি কুমিরের আর-একটা উপকার করে। যদি সে বুঝতে পারে, কুমিরের কোনো শত্রু তাকে আক্রমণ করতে আসছে তখন সে চিৎকার করে ওঠে।

নিউজিল্যান্ডে একরকম পাখি আছে তাদের 'কিউই পাখি' বলে। তাদের ব্রাউন রঙের পালকগুলো ঠিক চুলের মতো। এদের লেজ নেই, কেবল নামে মাত্র ডানা আছে। সেজন্য এ-পাখিরা উড়তে পারে না। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারে। এরা দিনের বেলায় বাসায় বিশ্রাম করে, আর রাতে খাবার খুঁজতে বার হয়। এদের প্রধান খাদ্য হল কেঁচো। এদের ঠোঁট খুব লম্বা ও অগ্রভাগ সূঁচালো আর নাকের গর্তও ঠিক ঐ জায়গায়। গন্ধ শুঁকে এরা খাবার সংগ্রহ করে। এরা সমস্তক্ষণ মাটিতে ঠোঁট ঠকাঠক লাগিয়ে শুঁকতে শুঁকতে যায়, তারপরে কেঁচোর গন্ধ পেলে মাটি খুঁড়ে তাকে বের করে খায়। পাখিরা দেখতে মুরগির চেয়ে বড় নয়, কিন্তু এদের ডিমের ওজন আধসের। স্ত্রী-কিউই পুরুষ-

কিউইয়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। অনেকে বলেন যে অস্ট্রিচের চেয়ে দ্বিগুণ বড় মোয়া-পাখির এরা বংশধর। মোয়া-পাখিরও ডানা ছিল না।

আফ্রিকায় আর-একরকম পাখি আছে তাদের 'মধু পাখি' বলা হয়। এরা মধু খেতে ভালোবাসে, কিন্তু মানুষের সাহায্য না-পেলে এরা মধু খেতে পারে না। যখন দেখে যে মৌমাছিরা কোনো গাছের উপর বসছে তখন এরা বুঝতে পারে সেখানে মধু আছে। তখন এরা মানুষকে জানাবার জন্য ডাকতে থাকে। সেই ডাক শুনে লোকেরা বুঝতে পারে যে এই পাখি মধুর সন্ধান পেয়েছে। তারাও সেই মধুর ভাগ পাবার জন্য পাখির পিছনে যেতে থাকে। পাখিটাও এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে যায়। তারপর সে ঠিক মধুর গাছটার উপরে গিয়ে যখন বসে তখন তারা সেই গাছটা কেটে ফেলে। লোকেরাও যেমন সে গাছ থেকে মধু নেয়, পাখিরাও পেট ভরে মধু পান করে।

চীনারা কর্মোরান্ট পাখিকে মাছ ধরতে শেখায় আর পাখিও মাছ খায়। তারা নৌকা করে সেই পাখিকে নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার সময় পাখির গলায় একটা গোল চাকতি পরিয়ে দেয়। তারপরে একে বেঁধে জলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছোট ছোট মাছ সে খেয়ে ফেলে আর বড়মাছগুলো সেই চাকতিতে আটকা পড়ে যায়। তারপরে ওকে নৌকার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় আর বড়মাছ যা আটকা পড়ে তা তারা তুলে নেয়। এক ঘণ্টায় এই পাখি একশোর বেশি মাছ ধরতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ায় একরকম অদ্ভুত পাখি আছে তাদের 'কুকাবুরা' বলে। সূর্য উদয়ের ও সূর্যাস্তের সময় এরা অনেকে মিলে একজায়গায় প্রাণভরে হাসতে থাকে। সেই হাসি অনেকদূর থেকে শোনা যায়। তারা পাগলের মতো হাসতেই থাকে। ভারি মজা। আর কোনো পাখি এরকম হাসতে পারে না। আবার ঠিক সময়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় এরা ডাকে। এদের ডাক শুনে সময় বোঝা যায়।

অস্ট্রেলিয়ায় আর-একরকমের পাখি আছে তাদের লায়ার পাখি (Lyre bird) বলে। এই পাখির গায়ের রং ব্রাউন। এর লেজে ষোলোটি খাড়া পালক আছে। এই পালকগুলি লায়ার (বেহালার)-এর আকারের। দুটি বাইরের পালক বেঁকে ঠিক লায়ারের তারের মতো দেখায়। এই পাখি অনুকরণ করতে খুব সক্ষম। বনের যত পাখির ডাক ডাকে এই পাখি। এমনকি কুকুর, গরু, মুরগিসহ অন্যান্য জন্তুর ডাকও ডাকে। ছোটছেলের কান্নাও এরা নকল করে।

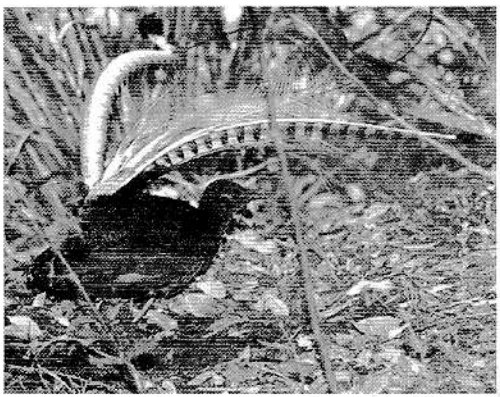

লায়ার

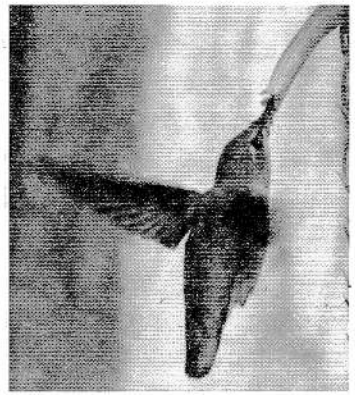

আফ্রিকার মধু পাখি

সানোয়ার জাহান

প্রেমপুষ্প নার্সিসাস

পৃথিবীর সব দেশেই সুন্দর সুন্দর উপকথা বা পুরাণের গল্প আছে। কিন্তু গ্রিসদেশের উপকথার মতো এমন সুন্দর উপকথা হয়তো আর কোথাও নেই। গ্রিক-পুরাণের এই গল্পগুলো থেকে একটি গল্প তোমাদের জন্য তুলে দিচ্ছি।

'সে ভালোবেসেছিল, যা তার নিজের মধ্যথেকে বেরিয়ে নিজেরই মধ্যে প্রত্যাবৃত হয়।'
—রাইনের মারিয়া রিলকে

নার্সিসাস নামে এক সুদর্শন তরুণ ছিল প্রাচীন গ্রিসে। সে ছিল নদী-দেবতা সিফিসাসের খুবই আদরের সন্তান। চোখ-ধাঁধানো রূপ ছিল নার্সিসাসের। ছেলেমানুষ এত সুন্দর হতে পারে, না-দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। ট্রয়ের রানী হেলেন কিংবা সুদর্শন দেবতা জিউসের রূপসুষমাও নার্সিসাসের রূপের কাছে ম্লান হয়ে যেত।

সেই বাল্যকাল থেকে নার্সিসাস তার রূপের প্রশংসা শুনে আসছে। যে-কোনো আসরে যাওয়ার সাথে সাথে নার্সিসাস বনে যায় সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তার উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে যে-কোনো খুশির-জলসা। ঘোর অমানিশায় নার্সিসাসকে মনে হয় পূর্ণচন্দ্রের মতো বিভাময়। নার্সিসাসের এই অপরূপ রূপের জন্য দেবতারা পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। নার্সিসাসের চোখ-ধাঁধানো

রূপের জন্য তার মা লিরিউপির চোখে ঘুম নেই। কী আছে নার্সিসাসের ভাগ্যে? কেমন হবে তার ভবিষ্যৎ-জীবন? কতদিনই-বা বাঁচবে তাদের চোখের মণি একমাত্র সন্তান নার্সিসাস? এইসব সাতপাঁচ ভেবে নার্সিসাসকে মা লিরিউপি নিয়ে গেলেন ভবিষ্যদ্বক্তা টাইরেসিয়াসের কাছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টাইরেসিয়াস লিরিউপিকে বললেন, 'সুদীর্ঘ পরমায়ুর অধিকারী হবে এই রূপবান তরুণ; কিন্তু যদি কোনো কারণে সে নিজের রূপের মোহে পড়ে তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। সব রমণীই বিমোহিত হবে এই অপূর্ব সুন্দর তরুণের রূপে। কিন্তু যেদিন এই বালক নিজেকে চিনতে পারবে, যেদিন সে বুঝতে পারবে আশ্চর্য সুন্দর অনিন্দ্যতায় ভরপুর তার রূপ, সেদিন তার জীবনে নেমে আসবে ঘোর অমানিশা। তেড়ে আসবে জীবনের অন্তিমকাল। প্রচণ্ড দুঃখ আর যন্ত্রণাময় হবে সেই মৃত্যু। এক হৃদয়বিদারক কাহিনী রচিত হবে তার মৃত্যুতে।' এই ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর মা লিরিউপি সবসময় আগলে রাখেন প্রিয় পুত্রকে। স্নেহমমতার এক কঠিন শেকলে আবদ্ধ রাখেন নার্সিসাসকে। মানুষের, বিশেষত কোনো নারীর সান্নিধ্যে আসতে দেন না তাকে। পাছে কোনো ছেলে অথবা মেয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলে সে-ভয়ে লিরিউপি ছেলেকে কারো সাথে মিশতে দেননি। কীভাবে নারীর প্রতি অনাসক্ত থাকা যায়, কীভাবে ঘৃণাভরে প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়, কীভাবে সুন্দরী তন্বী তরুণী তনয়াদের এড়িয়ে চলতে হয়, তিল-তিল করে লিরিউপি এসবের তালিম দিয়েছেন নার্সিসাসকে। জন্ম থেকেই সে মায়ের কাছে শিখেছে, কেমন করে দূরে থাকা যায় প্রেম-প্রীতির স্নিগ্ধ পরশ থেকে। এসব শেখার কারণে নার্সিসাস ভাবতে লাগল—সব মানুষই তার চেয়ে নীচ, নিকৃষ্ট।

নার্সিসাস ধীরে ধীরে ভরযৌবনে উপনীত হল। সাথে সাথে তার রূপসুষমাও যেন কানায় কানায় ভরে উঠল। বন্ধুমহলে আত্মীয়মহলে যেখানেই নার্সিসাস যাচ্ছে সেখানেই তার রূপের প্রশংসা। নিজের রূপের এত প্রশংসা শুনে তার মনে অহংকারের বীজ উপ্ত হয়। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সে সুন্দর ভাবতে পারে না।

একা একা বেড়ানোই নার্সিসাসের স্বভাব। একদিন নার্সিসাস বনের মধ্যে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে তার সাথে দেখা হয়ে যায় অরণ্যদেবী ইকো-র। ইকো তো বিস্ময়ে হতবাক—পুরুষ এত সুন্দর হতে পারে! এত রূপ নিয়ে এ তরুণ কেন এই বিজন বনে! এ যেন বিধাতার নিজহাতে তৈরি করা এক অনুপম মূর্তি। তার চোখ-মুখ-চুল ও দেহসৌষ্ঠব সবই যেন রূপের এক আশ্চর্য লাবণ্যে দীপ্তিমান। ইকো তো নার্সিসাসের রূপে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এমন অপরূপ রূপবান পুরুষ সে এর আগে চোখে দেখেনি। তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল নার্সিসাসের জন্য; সে পাগলের মতো তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল। যেভাবে হোক, নার্সিসাসকে তার চাই-ই।

নার্সিসাস কিন্তু অন্যরকম; এ-ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইকো হোক কিংবা প্রেমের দেবী আফ্রোদিতিই হোক, কারো প্রেমে তার কিছু যায়-আসে না। সে শুধু বিশ্বাস করে—এমন এক অপরূপ সুন্দর যুবক সে, যাকে ভালোবাসতে পারে তেমন যোগ্য নারী এ মর্তের মাটিতে নেই। আত্মপ্রেমের এক জ্বলন্ত আগুন তার বুকে, সে কেবল আপনাতেই বিভোর।

এদিকে নার্সিসাসের প্রেমে অরণ্যদেবী ইকো প্রায় উন্মাদিনী। নার্সিসাসের পিছু পিছু সে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনবনানী উপত্যকায়। নার্সিসের প্রেমে বনপরী ইকো যে এতই বিভোর হয়ে পড়েছে এর খবর কিন্তু নার্সিসাসের কাছে পৌঁছেনি। নার্সিসাস বুঝতেই পারছে না, কেন এমন এক সুন্দরী তন্বী তনয়া তার প্রেমে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে তার পিছু নিয়েছে। ইকোর প্রেমের ব্যাপারটা নার্সিসাস বুঝতে পারেনি, কারণ ইকো এমন এক নারী যার রূপ-যৌবন সবই আছে, নেই শুধু বাকশক্তি; তার মুখে ফুটত-না কথার ফুলঝুরি। সে ছিল বোবা। তার বাচালতায় বিরক্ত হয়ে দেবতারা একসময়

অভিশাপ দেয় আর তার বাকশক্তি ওভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়। সে শুধু প্রতিধ্বনির মাধ্যমে উচ্চারিত কথার শেষ অংশ ফিরিয়ে দিতে পারত। ইকো তাই তার প্রেমের বার্তা নার্সিসাসের কাছে পৌঁছে দিতে পারল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে নার্সিসাসকে অনুসরণ করতে থাকল। একবার বিশ্রাম নেয়ার জন্য নার্সিসাস এক গাছের নিচে বসেছে। এমন সময় কাছাকাছি কোথাও সে ঝরাপাতার উপর মচমচ শব্দ শুনতে পেল। নার্সিসাস প্রশ্ন করল—

: ওখানে কে?

ধ্বনির পিছে প্রতিধ্বনির মতো ইকো-র কণ্ঠ থেকে উত্তর ফিরে এল।

: কে? কে?? কে???

বিস্মিত নার্সিসাস পেছনে ফিরে তাকাল কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পেল না। সে আবার প্রশ্ন করল—

: এখানে কি কেউ আছ?

আবারো বিদ্রূপধ্বনির মতো ইকো-র কণ্ঠ প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠল।

: আছ? আছ?? আছ???

নার্সিসাস এবার ডানে-বামে পরখ করে দেখল কিন্তু কাউকে তার চোখে পড়ল না। এদিকে অদূরে এক ঝোপের আড়ালে থেকে ইকো সবকিছু মজার সাথে উপভোগ করছিল। চোখে না-দেখলেও নার্সিসাসের কিন্তু মনে হল এক নারীকণ্ঠ তার ধ্বনিত কথাকে প্রতিধ্বনিত করছে। নার্সিসাস অধৈর্য হয়ে এবার বলল—

: অনামিকা, তুমি যে-ই হও, আমার সামনে এস।

ইকো এবারও প্রতিধ্বনিত দুষ্টু আবহ তৈরি করল।

: সামনে এস, এস...এস।

'সামনে এস, এস' প্রতিধ্বনি করতে করতে ইকো এবার সত্যি সত্যি নার্সিসাসের সামনে এসে দাঁড়াল। নার্সিসাস দেখল এক অপূর্ব সুন্দর দেবকুমারী তার সামনে আবির্ভূত। এ যেন অনিন্দ্যসুন্দরেরই সাক্ষাৎ প্রতিমা। পরস্পর একমুহূর্ত চেয়ে থাকা। পরক্ষণেই নার্সিসাসের সম্বিত ফিরে এল : 'না! আমিই তো রূপশ্রেষ্ঠ। আমার চেয়ে সুন্দর কোনো মানুষ হতে পারে না। আমি নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসি না, ভালোবাসি না। মর্তের কোনো নারীই আমার ভালোবাসার উপযুক্ত নয়।' এদিকে ইকো শুধু বোবা অভিব্যক্তি বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে ফ্যালফ্যাল করে নার্সিসাসের দিকে তাকিয়ে থাকল। নার্সিসাসের প্রতি তার গভীর প্রেমের আর্তি বোবা ইকো উচ্চারণ করতে পারল না। এক অস্থির প্রেমাবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠল ইকো। কিন্তু তার তো কোনো ভাষা নেই, কথা বলার শক্তি নেই। ইকো নানা ভঙ্গিমায়, আকারে ইঙ্গিতে নার্সিসাসের প্রতি তার ভালোবাসার আকুলতা প্রকাশ করার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো ইঙ্গিত থেকেই আত্মপ্রেমিক নার্সিসাস ইকোর গভীর প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করতে পারল না।

অনেক ভেবেচিন্তে দ্বিধায় থরথর হাতে অবশেষে এই নির্জন উপত্যকায় ইকো নার্সিসাসকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনের মাধ্যমে তার প্রেমাসক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করল। কিন্তু নার্সিসাস অত্যন্ত ঘৃণাভরে ইকোর এই প্রেমালিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করল। প্রবল তাচ্ছিল্যের সাথে নার্সিসাস ইকোর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। অরণ্যদেবী ইকো এতে ভীষণ অপমানিত হল। লজ্জায় তার সুন্দর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠল। প্রত্যাখ্যানের এই দুঃখে সে পুড়তে থাকল ভীষণভাবে। অরণ্য উপত্যকা ছেড়ে সে আশ্রয় নিল গভীর বনে এক নিভৃত গুহায়। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ইকোর হৃদয়

থেকে বেরিয়ে এল এক বেদনার্ত আর্তি: 'প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি, নার্সিসাস যেন ব্যর্থ-প্রেমের যন্ত্রণা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। তুমি তাকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দাও।' ব্যর্থপ্রেমিকা ইকোর অস্ফুট বেদনার সকরুণ আর্তি প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির কাছে নিমেষেই পৌঁছে গেল। একজন সুন্দরী নারীর নিষ্পাপ প্রেমের অমর্যাদা করার অপরাধে দেবী আফ্রোদিতি নার্সিসাসের ওপর নিক্ষেপ করলেন অভিশাপের এক জ্বলন্ত অগ্নিবাণ। ফলে নার্সিসাসের ভেতর লুকিয়ে-থাকা প্রেমের সর্বগ্রাসী আগুন জ্বলে উঠল নিমেষে। এক অভিনব কায়দায় নার্সিসাসের ওপর নেমে এল শাস্তির যজ্ঞ। আফ্রোদিতির অভিশাপে নার্সিসাস পাহাড় উপত্যকা বন বনানী পেরিয়ে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে অবশেষে এক স্বচ্ছ ঝরনার ধারে এসে উপনীত হল। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নার্সিসাস বসল স্বচ্ছ ঝরনার পাড়ে। দুই হাতে আঁজলা ভরে যেই পানি তুলতে গেল, নার্সিসাস দেখল তার সুদর্শন অপরূপ চেহারা ঝরনার পানিতে চমৎকারভাবে বিম্বিত হচ্ছে। নার্সিসাস অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল নিজের প্রতিকৃতি। এত সুন্দর আমি! এত রূপ আমার!! নার্সিসাস বিভোর হয়ে পড়ল নিজের প্রতিকৃতি দেখে। নাওয়া-খাওয়া সে গেল ভুলে। মনের ভুলে যেই পানিতে হাত দিতে যাবে অমনি ভেঙে খানখান হয়ে গেল ঝরনায় বিম্বিত নার্সিসাসের সৌম্য প্রতিকৃতি। নিজের প্রতিকৃতির প্রতি এই অসম্ভব মোহনীয়তায় সে পানি পান করা থেকে বিরত থাকল।

দিন নেই রাত নেই নার্সিসাস এক অবাক দৃষ্টিতে ঝরনার পানিতে তাকিয়ে থাকল নিজের অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে। সূর্যের আলোতে দিনে এবং চাঁদের জোছনায় রাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সে মগ্ন থাকল নিজের অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবির প্রতি। এ এক অবিশ্বাস্য আত্মপ্রেম; সর্বনাশা স্বানুরক্তি। ঝরনার শান্ত জলে প্রতিফলিত নিজের ছবির দিকে দিনরাত তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে জীর্ণশীর্ণ হয়ে এল নার্সিসাস।

একসময় ওভাবেই মৃত্যু হল তার। নির্জন নিভৃত এই উপত্যকা দিয়ে বয়ে-যাওয়া ঝরনার পানিতে লুটিয়ে পড়ল নার্সিসাসের শীর্ণ দেহ। তার এই করুণ মৃত্যুতে কেউ ফেলল না চোখের জল; কেউ জানাল না সমবেদনা। শুধুমাত্র ইকোর হৃদয়ের ব্যর্থ হাহাকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মিশে গেল নির্জন বনানীর নিভৃত প্রান্তরে।

এদিকে নার্সিসাসের মরদেহ মিশে গেল কাদা-জলে। যে কাদায় মিশেছিল নার্সিসাসের মৃতদেহ সেখান থেকে প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি উদ্‌গত করলেন একটি সবুজ গুল্ম। আর তাতে ফুটল তীব্র সুবাসিত সুন্দর একটি ফুল। প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি এ ফুলের নাম দিলেন—'নার্সিসাস'।

খিদে পেলে টিনের কৌটো, রবারের টায়ারও গিলে ফেলে হাঙর

খুদে রাক্ষুসে মাছ হচ্ছে পিরানহা। আর বিরাট আকারের খুনি মাছ?...হাঙর। শুনলেই মনের মধ্যে আতঙ্ক জেগে ওঠে। ১২-১৪ বছর আগেকার সেই বুক-কাঁপানো ছায়াছবি 'দ্য জস' যারা দেখেছে তারা ভুলতে পারে না এদের কথা। সে কী দৃশ্য! আক্রান্ত মানুষের দেহ খণ্ডিত হয়ে মুহূর্তেই নীলসমুদ্রে লাল রক্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ভয়ানক তীক্ষ্ণ দাঁত আর প্রচণ্ড জোরালো চোয়াল দিয়ে যেন নিখুঁত অস্ত্রোপচার করে ফেলে হাঙর। 'ডিপ ব্লু সি' ছবিতেও হাঙরের ভয়ঙ্কর কার্যকলাপ দেখানো হয়েছে।

হাঙর হচ্ছে সবচেয়ে বড় আকার ও ওজনের মাছ। এরা লম্বায় ১৮ মিটার আর ওজনে ১৮ মেট্রিক টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রায় সব হাঙরই সমুদ্রের নোনাজলে বাস করে। বড় মাপের হাঙর থাকে সমুদ্রের কাছাকাছি। তবে কেউ এক জায়গায় থাকে না। খাবারের খোঁজে মাইলের-পর-মাইল ঘুরে বেড়ায়। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ২৫০ শ্রেণীর হাঙর আছে। এদের মধ্যে মাত্র ২৭ শ্রেণীর হাঙর হিংস্র ও আক্রমণকারী। অন্য শ্রেণীর হাঙর নিজেরা আক্রান্ত না-হলে মারাত্মক কিছু করে না। তবে কোনো হাঙরই খাদ্য হিসেবে মানুষ শিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে চলে না। তাদের নিয়মিত খাদ্য হচ্ছে হরেকরকম মাছ, চিংড়ি, কচ্ছপ, জলজপ্রাণী স্কুইড থেকে ডলফিন পর্যন্ত। এছাড়া তারা অন্য শ্রেণীর ছোট হাঙরও খেয়ে থাকে।

নিরাপদশ্রেণীর হাঙর বলতে তিমি-হাঙর (হোয়েল শার্ক), রোদ-পোহানো হাঙর (বাস্কিং শার্ক) ইত্যাদি। এরা বিশাল সাইজের হয়, অথচ এদের দাঁত ছোট ছোট, আর গলা রীতিমতো সরু—ইচ্ছে করলেও মানুষ ধরে গিলে ফেলার মতো নয়। সেজন্য ছোট ছোট মাছ আর জলজপ্রাণীই এদের খাদ্য। এই ধরনের হাঙরকে খাবারের আশায় জাহাজের পাশ ধরে সাঁতার কাটতে পর্যন্ত দেখা যায়। খুনি হাঙরদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র হল শাদা হাঙর (হোয়াইট শার্ক), বাঘ-হাঙর (টাইগার শার্ক), হাতুড়ি-মাথা হাঙর (হ্যামারহেড শার্ক) ইত্যাদি। মানুষ বা পশু এদের কবলে পড়লে নিঃসন্দেহে তাদের জন্য বীভৎস মৃত্যু বরাদ্দ থাকে। এই প্রাণীটি এমন নিঃশব্দে এবং অতর্কিতে হানা দেয় যে, এদের নীলসমুদ্রের গুপ্তঘাতকও বলা চলে। এরা গন্ধে শিকারের অস্তিত্ব টের পায়। এদের খিদে যত বাড়ে, নাক তত সংবেদী (সেনসিটিভ) হয়ে ওঠে। ভোজনপর্বে হাঙরদের মধ্যে এক অদ্ভুত উন্মত্ততা দেখা দেয়। ওরা তখন কাঠের টুকরো, টিনের কৌটো, রবারের টায়ার সবই কামড়াতে থাকে, এমনকি গিলেও ফেলে।

সবশেষে, হাঙর থেকে আমাদের প্রাপ্তির বিষয়টাও উল্লেখ করতে হয়। রোগাক্রান্ত বা মৃত জীবজন্তুর দেহ ভক্ষণ করে এই প্রাণী জলদূষণের সম্ভাবনা রোধ করে। হাঙর থেকে মানুষ বহুরকম প্রয়োজন মেটায়। বিশেষ করে, হাঙরের লিভার থেকে নিষ্কাশিত তেল চিকিৎসার কাজে লাগে।

ইতিহাস-বিখ্যাত চুরি

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির অমর-সৃষ্টি 'মোনালিসা'র কথা কে না-জানে? অদ্ভুত সুন্দরী মোনালিসার প্রতিকৃতিটি বিখ্যাত হয়ে আছে কেবল তার অধরে মুচকি হাসির কারণে। তাছাড়া এ ছবিতে আশ্চর্যজনক আরও কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। লিওনার্দো ছবিটি এঁকেছিলেন ফ্লোরেন্সে ১৫০৩ থেকে ১৫০৬ সালের মধ্যে। তাঁর মডেল জানোবি দেল জিওকোন্দার দ্বিতীয় স্ত্রী লা জিওকোন্দা। এ ছবিটি এঁকে লিওনার্দো জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু এ ছবিটি চুরি হয়ে গিয়েছিল এক সময়। এখন ছবিটি সংরক্ষিত আছে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে। লিওনার্দো যখন ফ্রান্সে ইমিগ্রান্ট হন তখন সঙ্গে নিয়ে আসেন ছবিটি। এখানে এটি বিক্রি হয়ে যায় ৪০০০ সোনার মুদ্রার বিনিময়ে। এটি তখন টাঙানো হয়েছিল ভার্সাই রাজপ্রাসাদে। সম্ভবত টুইলিরাইসে নেপোলিয়নের বেডরুমেও এটি টাঙানো ছিল। ১৮০৪ সালে ছবিটি প্যারিসের ল্যুভর গ্যালারিতে উপহার দেয়া হয়। ১৯১১ সালে একদিন ল্যুভর মিউজিয়ামে প্রতিদিনের মতো পাহারায় থাকা এক রক্ষী জানান যে, মোনালিসা দেয়ালের যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। তিনি সম্ভবত আরেকজন রক্ষীর সাথে মজা করছিলেন। তারা আসলে এ-ধরনের কিছু আশা করেনি। কিন্তু সত্যি সেটা পরদিন সেখানে টাঙানো ছিল না। তারা ভেবেছিল, হয়তো এটা ফটোগ্রাফের জন্য কিংবা কপি পেইন্টিংয়ের জন্য সরানো হয়েছে। পরদিন সকালে ল্যুভরের গার্ড ব্রিগেডিয়ার পাওয়ারবিন অফিসিয়ালি রিপোর্ট করে, তার চিন্তাটি আগের মতোই থেকে

যায়। সকাল ৯টার দিকে চিত্রকর লুই বেরাউড এলেন, তিনি কপি করছিলেন মোনালিসা ছবিটি। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন—ছবিটি কোথায়? ব্রিগেডিয়ার বলল, ফটোগ্রাফার এটি নিয়ে গেছে কপি করার জন্য। কিন্তু দুপুরের মধ্যেও যখন ছবিটি এল না তখন সে ব্রিগেডিয়ারকে প্রভাবিত করল অনুসন্ধান করার জন্য। অবশেষে লাল গার্ডরাও খবর নিয়ে এল—ছবিটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুঃখজনক সংবাদটি যেই দুপুরবেলা পৌঁছাল সংবাদপত্র অফিসে, হেডলাইনে লেখা বেরুল এক 'অভাবনীয়' শিরোনাম। সাধারণ জনগণ এই মূল্যবান শিল্পসম্পদটিকে ভালোবাসত মনপ্রাণ দিয়ে। তারা প্রথমে বিশ্বাস করেনি এই সংবাদটি সত্য। তারা ভাবল, সংবাদপত্রগুলো কেবল নিজেদের সার্কুলেশন বাড়াবার জন্য এ সংবাদ ছেপেছে। পুলিশ গোপনভাবে অনুসন্ধান শুরু করল এবং অন্যান্য ছবি বুলেটপ্রুফ কাচের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। ছবিটি খুঁজে দেয়ার জন্যে 'এক ইলাস্ট্রেশন' বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যে এই ছবিটি এনে দেবে তাকে ৪০,০০০ ফ্রাংক কোনোরকম প্রশ্ন ছাড়াই দেয়া হবে। 'প্যারিস জার্নাল' ঘোষণা করে ৫০,০০০ ফ্রাংক। পুলিশ আরও সক্রিয় হয়ে উঠল এই ক্রাইমের উৎস সম্পর্কে। চোর সম্পর্কে ধারণা করা হল, তারা সারারাতব্যাপী কাজটি করেছে এবং সম্ভবত এর সাথে যে জড়িত ছিল সে আগে থেকেই ছবির বাঁধানো আংটা আলগা করে রেখেছিল, যাতে চোর ছবিটির পেছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। সব লোক যখন চলে গিয়েছে, তখন চোরটি নিরাপদে গার্ডের সহায়তায় করিডোর দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এই ছবিটি চুরি হবার পর সারা পৃথিবীর মানুষ বিশেষত চিত্রকলা-প্রেমিকরা বিক্ষোভ প্রকাশ করে। প্যারিসের অলিগলিতে এই বিষয়ে নানারকম গুজব ছড়াতে থাকল। জনগণের বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদের কারণে ল্যুভর মিউজিয়ামের তৎকালীন কিউরেটর থিওপেলি হোমোলিকে বরখাস্ত করা হল এবং ল্যুভরে কড়া নিরাপত্তা আরোপ করা হল। এ নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোর একটি ঘটনা রয়েছে। এক কবি গিয়োম অ্যাপিলিনেয়ার পিকাসোকে গোপনে বলেন, তাঁর কাছে মোনালিসার ছবিটি রয়েছে এবং সেটা বিক্রি করা হবে। পিকাসো যথারীতি ছবিটি কিনে নেন। কিন্তু তিনি পুলিশে খবর দিলে পুলিশ কবি গিয়োমকে গ্রেফতার করে। মজার ব্যাপার, সেটা আসল মোনালিসা ছিল না। এটা প্রমাণিত হবার পর পুলিশ কবিকে ছেড়ে দেয়। ১৯১৩ সালে, দু-বছর পর ঘটনা অন্যরকম মোড় নেয়। নভেম্বরের এক সকালে আলফ্রোডা গ্যারি মোনালিসা কেনার একটা প্রস্তাব পান। তিনি ইতালিয়ান আর্ট ডিলার। তিনি তার বন্ধু 'উফিজি গ্যালারি'র কিউরেটর গিওভানি পোগিকে কথাটা জানালেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন প্যারিসের পত্রলেখকের সাথে দেখা করবেন। পত্রলেখকের নাম ভিনসেনজো পেরুগুয়ে। তিনি তাদেরকে খাটের নিচে মোনালিসার মূল ছবিটি দেখান এবং ৫ লক্ষ লিও দাবি করেন। তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ছবিটি লুকিয়ে রাখতে রাখতে। ছবিটি দেখার পর গ্যারি ল্যুভর মিউজিয়ামে ঘটনাটি জানান। ১৫ দিনের মধ্যে ভিনসিনজো পেরুগুয়ে ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। মামলা চলতে থাকে। অবশেষে সাতমাস পর চোরটি জেল থেকে মুক্তি পায়। ইতালির সকল শহরে ছবিটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরে আবার ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ছবিটি ফেরত নিয়ে যায় এবং ছবিটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ছবিটি যেভাবেই চুরি হয়ে থাক-না কেন, এর মূল্য অপরিসীম।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস এক সম্পাদকীয়তে লিখেছে: ১৯০৬ সালে এর ৩ শতাংশ সুদ বেড়ে এর দাম হয় ১,৬২৯,৫২৮,০৬২ ডলার। প্রতিমিনিটে এর সুদের পরিমাণ ৯৪.৩০ ডলার। বর্তমান সময়ে সমস্ত প্যারিস শহরকে বেচে দিলেও মোনালিসার দাম শোধ করা যাবে না।

স্মরণীয় উক্তি

- জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনাবশ্যক সবকিছু ছেঁটে ফেলাই শ্রেয়। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- একবার পথ হারানোর চেয়ে দুবার অনুসন্ধান করে নেওয়া ভালো। —ডেনিশ প্রবাদ
- ছাত্রানং অধ্যয়নং তপোঃ —উপনিষদ
- ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। —আল কোরআন
- নিয়মকে অনিয়ম দিয়েই ভাঙতে হয়। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- যে-কোনো প্রশ্নের উত্তরই মৃত্যুর মতো। —জন ফলেস
- সময় হল অনন্তের প্রতিবিম্ব। —ল্যারটিয়াস
- যা অনিশ্চিত, অজ্ঞাত তার পিছনে দৌড়ানো বোকাদের কাজ। —ক্যানিং
- কুসংস্কার মানুষকে বোকা বানায় আর সন্দেহ তাকে করে পাগল। —টমাস ফুলার
- অজ্ঞ হওয়া যত-না লজ্জার বিষয়, তারচেয়ে বেশি লজ্জার বিষয় হচ্ছে শিখতে না-চাওয়া। —বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন
- সৎলোক হতে হবে নতুবা সৎলোকের অনুকরণ করতে হবে। —ডেমোক্রিটাস
- অন্যায় করে লজ্জিত না-হওয়া আরেক অন্যায়। —সক্রেটিস

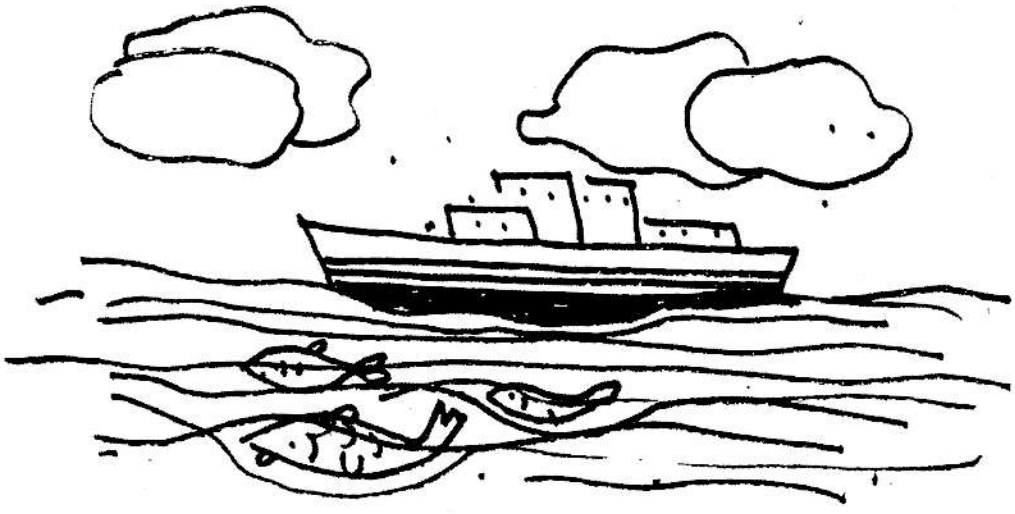

হুমায়ূন আহমেদ

লোকটি

ঐ কৃপণ লোকের গল্প কি তোমরা শুনেছ? যে চিনির কৌটার পিঁপড়া ফেলে দিত না, অন্য একটা কৌটায় জমা করে রাখত? চিনি শেষ হয়ে গেলে ঐসব পিঁপড়া দিয়ে চা বানিয়ে খেত। এগুলো গল্পকথা। বাস্তবজীবনে এরকম ভয়ঙ্কর কৃপণ থাকে না। তবে একেবারেই যে থাকে না, তা-ও না। আজহার উদ্দিন খাঁ এরকম একজন কৃপণ। ভদ্রলোকের বয়স তিপ্পান্ন। নারায়ণগঞ্জে তাঁর দুটি গেঞ্জির কারখানা আছে। কারখানা থেকে তাঁর মাসে সত্তর হাজার টাকা আয় হয়। ঢাকা শহরে তাঁর তিনটি বাড়ি আছে। সবকটা ভাড়া দিয়ে তিনি মালিবাগে তিন কামরার একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকেন। এত বড় বাড়ি তাঁর প্রয়োজন নেই বলে এখন দু-কামরার ফ্ল্যাট খুঁজছেন। যাকে পান তাকেই বলেন, এত বড় বাড়ি দিয়ে আমি করবটা কী—একা মানুষ। আমার একটা রুম হলেই চলে যায়। সারাদিন কাজকর্মে থাকি,— রাত্রে এসে ঘুমিয়ে থাকি। তার জন্য তিনটা ঘরের দরকার কী? ঘর বেশি হলেই তো ঘুম ভালো হবে না।

কেউ যদি বলে, আপনি একা মানুষ, টাকা দিয়েই-বা আপনি করবেন কী? তখন তিনি এমন দৃষ্টিতে তাকান যে মনে হয় এত অদ্ভুত কথা তিনি তাঁর জীবনে শোনেননি, প্রথম শুনলেন। এক বর্ষাকালের কথা। রাত নটার মতো বাজে। নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি সবে ফিরেছেন। ফেরার পথে একটা ডিম এবং দুটো কলা নিয়ে এসেছেন। তাঁর রাতের খাবার। ডিম সিদ্ধ এবং কলা। টিনের

কৌটায় টোস্ট বিস্কিট আছে। একটা টোস্ট বিস্কিট। তিনি মনে করেন জীবনরক্ষার জন্য যতটুকু খাওয়া প্রয়োজন তার বেশি খাওয়া অপরাধের মতো। তিনি কেরোসিনের চুলায় ডিম সিদ্ধ বসিয়ে বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে গিয়েছেন, তখন কলিংবেলের শব্দ হল। হাত-মুখ ধোয়া বন্ধ রেখে তিনি দরজা খোলার জন্য গেলেন। দেরি করলে ঐ লোক কলিংবেল টিপতেই থাকবে। বেহুদা খরচ হবে। কী দরকার?

দরজা খুলতেই দেখেন চাদর গায়ে ২২/২৩ বছরের একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। আজহার খাঁ কড়া গলায় বললেন, 'কাকে চান?'

'আপনাকে চাচ্ছি। আপনার নাম তো আজহার উদ্দিন খাঁ?'

'কিন্তু কী দরকার আমার সঙ্গে?'

যুবকটি হাসিমুখে বলল, 'আমি আপনার কাছে একটা জিনিস বিক্রি করতে এসেছি।' আজহার উদ্দিন খাঁ বিরক্ত গলায় বললেন, 'আমার কোনো জিনিসের দরকার নাই।' 'আমি যে জিনিস বিক্রি করতে এসেছি, তার সত্যি আপনার কোনো দরকার নেই। তবে আপনি ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসায়ী মানুষ লাভ-লোকসান ভালো বোঝে। আমার জিনিসটা যদি আপনি কিনে রাখেন তাহলে লাখ-পঞ্চাশেক টাকা লাভ করতে পারবেন।'

আজহার উদ্দিন খাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। বোঝাই যাচ্ছে লোকটা ঠকবাজ। তিনি ঠকবাজের সাহস দেখে চমৎকৃত হলেন। তাঁর মতো ঘাগু লোককে 'ঠক' খাওয়াতে এসেছে। সে জানে না তিনি তাকে সাতঘাটের পানি খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারেন।

'কী বিক্রি করতে চান?'

'আমার কাছে একটা হীরা আছে—পায়রার ডিমের চেয়ে খানিকটা বড়। এটা বিক্রি করব।'

আজহার সাহেব মনে মনে হাসলেন। ঠকবাজদের ঘোল খাইয়ে দেওয়াতেও আনন্দ আছে। তিনি এই আনন্দের লোভ সামলাতে পারলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার কাছে পায়রার ডিমের মতো সাইজের হীরা বিক্রি করতে এসেছেন?'

'জ্বি, স্যার।'

'এটা কি কোহিনূর হীরা না-কি?'

'জ্বি-না স্যার। কোহিনূর না। কোহিনূর আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। কোহিনূরের পরের হীরার নাম 'দি হোপ'। এটা আছে নিউইয়র্কে।'

আজহার সাহেব আবার মনে মনে হাসলেন। ঠকবাজের লক্ষণ হচ্ছে ভারী ভারী কথা বলে খদ্দেরকে হকচকিয়ে দেয়া। ব্যাটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। লোকটি বলল, 'আপনি বোধহয় আমার হীরার ব্যাপারটি ঠিক বিশ্বাস করছেন না।'

'কেন করব না! অবশ্যই করছি।'

'আমার এই হীরার ওজন একশো সাতাশ ক্যারেট। পারিবারিক সূত্রে আমি পেয়েছি।'

'বিক্রি করে দিতে চাচ্ছেন কেন?'

'বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি, কারণ হীরা কোনো কাজে আসে না। চোরের ভয়ে সারাক্ষণ লুকিয়ে রাখতে হয়। এর চেয়ে বিক্রি করলে টাকাটা কাজে লাগে।' আজহার সাহেব বললেন, 'টাকা আবার কী কাজে লাগবে? টাকাও তো সেই ব্যাংকেই রেখে দিতে হয়।'

'আমি অবশ্যি টাকা ব্যাংকে রাখার জন্য হীরা বিক্রি করছি না। আমি ঐ টাকায় কিছু সৎকাজ করতে চাই।'

'সৎকাজ করতে চান মানে?'

'আমি একটা অনাথ আশ্রম করতে চাই। বড় ধরনের অনাথ আশ্রম। যে-আশ্রমে ছেলেমেয়েরা নিজের বাড়ির মতো থাকবে। লেখাপড়া শিখবে।'

'তাতে আপনার লাভ কী?'

'আমার লাভ কিছুই না। বাচ্চাগুলোর লাভ। আমি একটা হাসপাতাল করতে চাই।'

'কী বলছেন। এ তো বহু টাকার ব্যাপার!'

'হীরাটার দাম তো স্যার অনেক। এককোটি টাকা।'

'ফাজলামি করছেন নাকি? এককোটি টাকা দামের হীরা আপনি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আমার সঙ্গে মামদোবাজি করতে চাচ্ছেন? আমি আপনার মতো দশটা মামদোকে এক ঢোক পানি দিয়ে গিলে ফেলতে পারি, তা জানেন?'

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, 'আমি স্যার হীরাটা রেখে যাচ্ছি। আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে যাচাই করুন। আমি সাতদিন পরে আসব।'

'কোনো দরকার নেই। আসল হীরা হলেও আমি কিনব না। এত টাকা আমার নেই।'

'না-কিনলেও জিনিসটা এক সপ্তাহ আপনার কাছে থাকুক। আপনার সন্দেহ দূর হোক।'

'এককোটি টাকা দামের জিনিস আপনি আমার কাছে রেখে যাবেন?'

'জ্বি। কারণ কৃপণ হলেও আপনি মানুষ হিসেবে সৎ। আমি খোঁজখবর নিয়েই এসেছি, স্যার।'

লোকটা পকেটে হাত দিয়ে কাঠের একটি ছোট্ট কালো বাক্স বের করে আজহার সাহেবের হাতের দিকে বাড়িয়ে দিল। আজহার সাহেব হাতে নিলেন। বাক্স খুলে জিনিসটা একবার দেখতে তো কোনো ক্ষতি নেই। দেখা যাক। 'স্যার, আমি তাহলে যাই।'

'যাবেন মানে? আপনার হীরা নিয়ে যান।'

'আমি আসব এক সপ্তাহ পরে।'

লোকটি আজহার সাহেবকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে অতিদ্রুত রাস্তায় নেমে পড়ল। 'আরে আরে, এ্যাই এ্যাই' বলে আজহার সাহেব পিছু পিছু গিয়েও লোকটির নাগাল পেলেন না।

তিনি বাক্স খুললেন। পায়রার ডিমের মতোই ঝকঝকে একটা কী যেন দেখাচ্ছে। খাঁজকাটা কাচের টুকরো, বলাই বাহুল্য। জার্মান ক্রিস্টাল হবে। তবে জিনিসটা বানিয়েছে সুন্দর।

তিনি টুকরাটা হাতে নিলেন। যদি হীরা হয় তাহলে এটা দিয়ে কাচ কাটা যাবে।

ঘরের আয়নায় একটা আঁচড় দিয়ে দেখবেন না-কি? কোনো মানে হয় না যদিও। তিনি আয়নায় একটা আঁচড় দিলেন।

আয়না নিমিষে দু-টুকরা হয়ে গেল। এ কী কাণ্ড! সত্যি কি হীরা? তা কী করে হয়? এতবড় একটা হীরা অচেনা-অজানা একজন মানুষ তাঁর হাতে দিয়ে উধাও হয়ে যাবেন। মানুষ এমন বোকা এখনো হয়নি। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো চালাকি আছে। চালাকিটা কী?

জিনিসটা বেশ ভারী। আলো পড়লে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ঝিকমিকিয়ে ওঠে। আসল হীরা কেমন হয় তিনি জানেন না। তিনি হীরা আগে কখনো দেখেননি। হীরা কি অন্ধকারেও জ্বলে? জ্বলার তো কথা। এত দামি একটা জিনিস। তিনি ঘরের বাতি নিভিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন। না তো, হীরা থেকে আলো বেরুচ্ছে না। একটা বাতি জ্বালাতেই হাতের জিনিসটা ঝকমক করে উঠল। সারারাত তাঁর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলেন। আজহার সাহেবের একজন ম্যানেজার

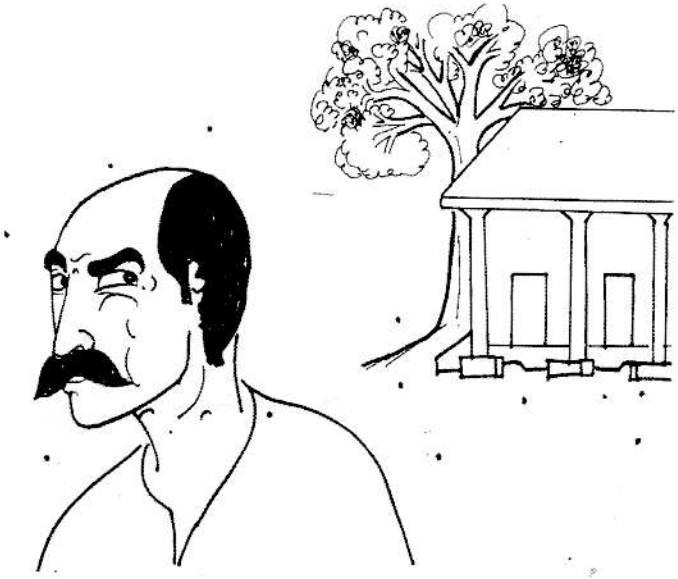

হচ্ছে মঈনুদ্দিন। লেখাপড়া-জানা ছেলে। ফিজিক্সে এম.এসসি.। কোথাও চাকরি না-পেয়ে আজহার সাহেবের গেঞ্জির কারখানায় ঢুকেছে। ভালো ছেলে, সৎ এবং কর্মঠ। আজহার সাহেব পরদিন তাকে ডেকে পাঠালেন। 'কেমন আছ, মঈনুদ্দিন?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'হীরা চেনায় উপায় কী বলতো?'

'হীরা দিয়ে কাচের উপর দাগ কাটা যায়, স্যার। খুব শক্ত তো, এই জন্যেই।'

'আরে, এটা তো সবাই জানে। তুমি এছাড়া আর কী জানো?'

'হীরার একটা বিশেষ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে। ঠিক কত মনে পড়ছে না। বই দেখে বলতে পারি।'

'বই দেখে বলার দরকার নেই। আর কিছু জানো কি-না বল। আচ্ছা শোনো, হীরা কি অন্ধকারে জ্বলে?'

'জ্বি-না স্যার। কোনো মণিমুক্তাই অন্ধকারে জ্বলে না। আলো পড়লেই ঝলমল করে ওঠে। এতসব জিজ্ঞেস করছেন কেন, স্যার?'

'ইচ্ছা হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করছি। এতে কি তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?'

'জ্বি-না স্যার?'

আজহার সাহেব খুবই বিমর্ষ হয়ে গেলেন। জিনিসটা কী কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারো কাছে নিয়ে যেতেও ভরসা হচ্ছে না। বাংলাদেশ হচ্ছে ঠকবাজদের জায়গা। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। একসপ্তাহ হতে চলল। আজহার সাহেব ক্রমে ক্রমেই বেশি পরিমাণে বিমর্ষ হতে শুরু করলেন। জিনিসটার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে। হাতছাড়া করতে খুব কষ্ট হবে। তিনি এখন রোজ রাতে

জিনিসটা হাতে নিয়ে খেলা করেন। বালিশের নিচে রেখে ঘুমুতে যান। এটা হাতছাড়া করলে মনে হচ্ছে তিনি বাঁচবেন না। কিন্তু উপায় কী? ঐ লোক আসবে। তাকে দিয়ে দিতে হবে।

লোকটা আসল না।

দু-সপ্তাহ পার হল। তিন সপ্তাহ গেল। এক মাস গেল। কারো কোনো খোঁজ নেই। দু-মাস পার হবার পর আজহার সাহেবের মতো কৃপণ মানুষও পত্রিকায় টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিলেন।

সন্ধানপ্রার্থী

জনৈক যুবক আমার নিকট একটি বস্তু বিক্রয় করিবার জন্য দিয়াছিলেন। এক সপ্তাহের ভিতর তাহার আসিবার কথা। তিনি আসেন নাই। অতি সত্বর তাহাকে যোগাযোগ করিতে বলা হইতেছে।

বিজ্ঞাপন বের হবার পরেও ছ-মাস কেটে গেল। কারো কোনো পাত্তা নেই। আজহার সাহেব ঠিক করলেন জিনিসটা হীরা হোক বা কাচই হোক, তিনি রেখে দেবেন। দাম যা চাচ্ছে তাই দেবেন। উপায় কী।

এক বছর কেটে গেল। আজহার সাহেবের মনে হল লোকটা বোধহয় শেষপর্যন্ত আসবে না। তিনি অন্যের একটা জিনিস রেখে দিতে পারেন না। কাজেই ঠিক করলেন 'হীরা' বিক্রির টাকায় ঐ লোক যা করতে চাচ্ছিল তাই করবেন। অনাথ আশ্রম, হাসপাতাল। যদিও এসব করার কোনো মানে হয় না। তিনি তাঁর ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। 'কেমন আছ, মঈনুদ্দিন?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'একটা বিশেষ কাজে তোমাকে ডাকলাম।'

'স্যার, বলুন।'

'একটা অনাথ আশ্রম করতে চাই।'

'কী বললেন, স্যার?'

'অনাথ আশ্রম। বেশ বড়। অনেক ছেলেপুলে যেখানে থাকবে। পড়াশোনা করবে।'

মঈনুদ্দিন উঠে এসে আজহার সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল। আজহার সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এসব কী?'

'আপনাকে খুব খারাপ মানুষ ভাবতাম, স্যার। আপনার ভেতরে যে এই জিনিস আছে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, স্যার। আপনি একজন মহাপুরুষ।'

'আজেবাজে কথা বন্ধ কর তো।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'কাজ শুরু কর।'

'আজ থেকেই কাজ শুরু করব, স্যার। কী যে ভালো লাগছে—আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

মঈনুদ্দিন চোখ মুছতে লাগল। আজহার সাহেব মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, 'কাঁদছ কেন? এখানে কান্নার কী হল?'

'আনন্দে কাঁদছি, স্যার। আমি আমার এই জীবনে এত আনন্দ পাইনি।'

অনাথ আশ্রম তৈরি হল। আজহার সাহেব আবার মঈনুদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন।

'কেমন আছ, মঈনুদ্দিন?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'একটা হাসপাতাল তৈরি করব বলে মনস্থ করেছি।'

মঈনুদ্দিনের চোখে আবারও পানি এসে গেল। সে আবার পা ছুঁয়ে সালাম করতে এগিয়ে এল। আজহার সাহেব মহাবিরক্ত হলেন।

'কাঁদছ কেন, মঈনুদ্দিন?'

'বড় আনন্দ হচ্ছে, স্যার। আনন্দে কাঁদছি।'

'এসব ফাজলামি আমার একেবারেই পছন্দ না।'

হাসপাতাল তৈরি হল গ্রামের দিকে। বহু টাকা চলে গেল। আজহার সাহেব প্রাণপণে ব্যয় কমানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। আগে দুবেলা খেতেন, এখন একবেলা খান। ভাড়াবাড়ি থেকে তিনি উঠে গেছেন দু-কামরার ফ্ল্যাটবাড়িতে। তবে তাঁর ব্যবসা ভালো চলছে। হাসপাতাল তৈরির পর কেমন যেন নেশা ধরে গেল। তিনি স্কুল বানালেন, রাস্তাঘাট বানালেন, দাতব্য চিকিৎসালয় করলেন। দশ বছর পর এক বর্ষার রাতে দরজায় কলিংবেল বাজল। আজহার সাহেব দরজা খুললেন। চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি বলল, 'স্যার, আমাকে চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, পারছি।'

'আমি স্যার আমার জিনিসটা নিতে এসেছি।'

'বুঝতে পারছি।'

'আপনার যদি পছন্দ হয় রেখে দিতে পারেন। জিনিসটার পুরো দাম আপনি দিয়েছেন। তবে আমাকে ফেরত দিলে আমি এটা আবার ব্যবহার করতে পারি। আপনার মতো মানুষ তো আরো আছে।'

'তা আছে। আপনি নিয়ে যান।'

আজহার সাহেব কালো বাক্সটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ। এই জিনিসটার কারণে এখন মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার একটা অর্থ খুঁজে পাচ্ছি।'

'আপনি আনন্দে আছেন তো স্যার?'

'হ্যাঁ, আনন্দে আছি। খুব আনন্দে আছি। তবে আমার আরো টাকা দরকার। প্রচুর টাকা—ঐ নিয়ে দুশ্চিন্তা। মাথার মধ্যে বিরাট একটা প্রজেক্ট আছে...। মেয়েদের জন্য কিছু করা। এই সমাজে মেয়েরা...।'

লোকটি অন্ধকারে মিশে গেল। আজহার সাহেব তাঁর প্রজেক্ট নিয়ে চিন্তা করতে বসলেন।

সুকুমার বড়ুয়া

চিন্তা নিয়ে ভাবনা

চোখেও দেখা, হাতেও ধরা যায় না কোনোদিন তা,
কেমন করে মাথায় ঢোকে এতরকম চিন্তা?
কোথায় তাদের চাষ হল বা কোথায় যে উৎপত্তি
খবরটুকু কেউ কোনোদিন পায়নিকো এক রত্তি।
মাথার ভেতর ঢুকেই সে-যে জড়িয়ে ধরে মনকে
মিথ্যা এবং ভুলের পথে নেয় সে কত জনকে।
চিন্তা কারুর মাথায় ঢুকে দেয় ফিরিয়ে ভাগ্য,
ঘর ছেড়ে কেউ বাইরে এসে লাভ করে বৈরাগ্য।

চিন্তা কারুর ভালোই করে কারুর করে মন্দ
কেউ হয়ে যায় পাগল—কারুর চক্ষু থেকেও অন্ধ।
মাথায় কারো টাক পড়ে আর কেশ যে অকালপক্ব,
হাট-বাজারে পথে-ঘাটে দেখবে কত লক্ষ।
এসব দেখে চিন্তাবিদে ভাবে হয়ে মত্ত—
চিন্তা করে লেখেন পুথি—শেখেন মনস্তত্ত্ব।
নানা যুগে জন্মে থাকে নানানরকম চিন্তা,
জোড়াতালি পড়ে পড়ে বাড়ছে প্রতিদিন তা।
চিন্তার যে কেরামতি—দেখায় কত যুক্তি
চিন্তা থেকে কেউ কোনোদিন পায় না তো আর মুক্তি।
অসীম আকাশ, অকূল সাগর আজ মানুষের বাধ্য
চিন্তা-সাগর পাড়ি দেবার নাই-যে কারো সাধ্য।

অল্প কথার গল্প

১.

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একবার ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি চশমাটা বাড়িতে ফেলে আসায় খাবারের মেনু পড়তে পারছিলেন না। ওয়েটারকে ডেকে পড়ে দিতে বললেন। শুনে ওয়েটার সহানুভূতির সঙ্গে বলল, আমিও আপনার মতো পড়তে পারি না।

২.

একবার কৌতুক অভিনেতা জনি লিভার এক পার্টিতে দাওয়াত পেলেন। সেই পার্টিতে তিনি মজার মজার কথা বলে লোককে হাসাচ্ছিলেন। এমন সময় এক আইনজীবী দাঁড়িয়ে বলল : 'এটা কি মজার নয় যে, একজন কৌতুক অভিনেতা নতুন নতুন মজার কথা বলে লোককে হাসাচ্ছেন?' তাই শুনে জনি লিভার বললেন, 'এটা কি আরো বিস্ময়কর নয় যে, একজন আইনজীবী টাকা না নিলেও লোক হাসাচ্ছেন?' শুনে পার্টির লোকজন আবারও হেসে উঠল।

কোন কোন প্রাণী মানুষের মতো দেখতে?

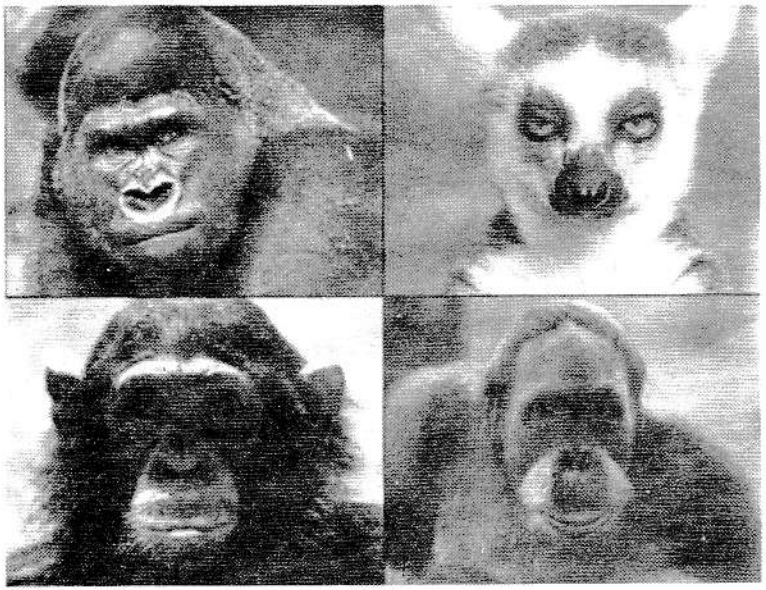

গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও ওরাং ওটাং হল এমন কয়েকটি প্রাণী যারা অনেকদিক দিয়েই মানুষের মতো দেখতে। এরা লেজবিহীন একধরনের বাঁদর। এরা বনমানুষের আওতায় পড়ে। আফ্রিকা ও এশিয়ার ঘন জঙ্গলে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

এইসব প্রাণীর মধ্যে শিম্পাঞ্জিই সবথেকে বেশি মানুষের মতো দেখতে, অর্থাৎ মানুষের সাথে এর নিকট-সাদৃশ্য বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে, এইসব প্রাণীর হাড়ের গঠনের সাথে মানুষের হাড়ের গঠনের অনেক মিল আছে। এদের দাঁতের সংখ্যা ও গঠন আমাদেরই মতো। মানুষের মতো এদেরও কপালে ভাঁজ বা বলিরেখা আছে। এদের মাথার খুলিও আমাদের মতো। এমনকি এদের রক্তও আমাদের রক্তের মতো। তবে আমাদের মতো এরা কথা বলতে পারে না।

গরিলারা সাধারণত মানুষের মতোই লম্বা হয়। তবে এরা মানুষের থেকে ভারী ও শক্তিশালী। গরিলারা ২০ থেকে ৩০ জনের এক-একটা দলে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। বাচ্চারা যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত না-হয় ততদিন তারা তাদের বাবা-মায়ের সাথে-সাথেই থাকে। বাচ্চা-গরিলারা গাছের উপর আর বয়স্করা মাটিতেই ঘুমোয়। গরিলারা সাধারণত শান্তিপ্রিয় প্রাণী। তবে কোথাও কেটে গেলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে এরা এদের বুকে বারবার আঘাত করতে থাকে। মুখ দিয়ে এরা ঢাকের আওয়াজের মতো শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। এদের গায়ের চামড়া কালো। গরিলার সংখ্যা যেহেতু ধীরে-ধীরে কমে যাচ্ছে সেইহেতু ওদের বিলুপ্তিকে রোধ করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এইসব প্রাণীর মধ্যে শিম্পাঞ্জি সব থেকে বেশি চালাক। মানুষের অনেক অভ্যাসকে এরা অনুকরণ করতে পারে। কালো-কালো লোমে এদের শরীর আবৃত থাকে। এদের ধরা যায়। চিড়িয়াখানায় তোমরা এদের দেখতে পারো। এরা এক অদ্ভুত শব্দ করে।

আলোকিত মানুষ চাই
বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার

গ্রামীণফোন

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

984180302X406